কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায়
পার্থসুধীর গুহ
গ্রন্থাগার সংরক্ষণ

গ্রন্থাগার সংরক্ষণ

গ্রন্থাগার সংরক্ষণ

কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায়
সহ-গ্রন্থাগারিক, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ

পার্থসুবীর গুহ
উপ-গ্রন্থাগারিক, বি. সি. রায় মেমোরিয়াল লাইব্রেরী,
ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেণ্ট, কলিকাতা

পরিবেশক
রায়'স পাবলিশিং হাউস
১৭এ, যদু মিত্র লেন, কলিকাতা ৭০০০০৪

Granthagar Sangrakshan
by Kalyan Kumar Mukhopadhyay (1940)
Partha Subir Guha (1942)

অগাস্ট ১৯৫৫

প্রকাশক ঃ
পার্থ সুবীর গুহ ইনফরমেশন রিসার্চ
১৫ বেডফোর্ড লেন
কলিকাতা-৭০০০১৬

প্রচ্ছদ ঃ
শ্রীনীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রক ঃ
শুভেন্দু রায়
উষা প্রেস
৩২/এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

বাঁধাই ঃ
এস. আর. এ্যান্ড কোং
১৩০ বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

সাধারণ গ্রন্থাগারকে "জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয়" রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশী, সেইসব নিঃস্বার্থ গ্রন্থাগার প্রেমীদের পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

ভূমিকা

সুপ্রাচীন কাল থেকেই গ্রন্থ মানবজাতির শিক্ষা সংস্কৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ধারক ও বাহক। তবু কিছুকাল আগে পর্যন্তও গ্রন্থের ব্যবহার ছিল নিতান্তই সীমিত। অতীত দিনে অধ্যয়ণ অধ্যাপনা গবেষণা, যজন-যাজন-শাস্ত্রচর্চা অথবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক কর্মে নিযুক্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরাই প্রধানতঃ গ্রন্থের ব্যবহারে আগ্রহী হতেন। গ্রন্থাগারের কোন সক্রিয় ভূমিকা স্বীকৃত ছিল না। পাঠককেই গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হতে হতো ও নিজ উদ্যামে জ্ঞান আহরণ সম্পন্ন করতে হতো। ঐ পরিবেশে গ্রন্থাগারের পক্ষে গ্রন্থরক্ষার স্থূল দায়িত্বে ভারাক্রান্ত, পাঠক অভি-মুখিনতার নৈতিক দায় বিহীন একটি স্থানু প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার প্রবনতাই স্বাভাবিক ছিল। অবশ্য বিরল ব্যতিক্রম হিসাবে দু-একটি গ্রন্থাগার থাকতো সেখানে গ্রন্থনিচয়-নিহিত তত্ত্ব ও তথ্য আত্মসাৎ কবে নিজ অধিকারে অধীতব্য নির্বাচনে, পাঠোদ্ধারে বা অনুপপত্তির ক্ষেত্রে পাঠককে সাহায্য কবতে পারতেন।

বিগতদিনের গ্রন্থাগারের সাথে আজকের দিনেব গ্রন্থাগারের সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য হচ্ছে এই যে গ্রন্থাগাব এখন একটি সক্রিয় পাঠকাভিমুখী সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রতিষ্ঠান। দৃষ্টিভঙ্গির এই পবিবর্তনের মূলে আছে গত দুই শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধেব উন্মেষ ও বিকাশ। যদিও আজ জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই গ্রন্থাগার পরিসেবার মূলধারা প্রবাহিত তবু এও অবিসম্বাদীভাবে সত্য যে আজ সমাজ জীবনের বোধহয় এমন কোন স্তর নাই যেখানে গ্রন্থাগার পরিসেবার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। শিশুর সুকুমাব মতির বিকাশে, স্কুল-কলেজের পাঠ বঞ্চিত বয়স্কের শিক্ষায়, প্রত্যন্তবাসী চাষী-শ্রমিকের বৃহত্তর জগতের সাথে সংযোগ স্থাপনে, সমাজ থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হাসপাতাল / কারাগারে অবস্থানকারীর বিনোদনে, মূক-বধির-দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনে, ও সদাপরিবর্তনশীল রাষ্ট্র / সমাজে সর্বস্তরের মানুষের জন্য

আজীবন স্বশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে, গ্রন্থাগারের অগ্রণী ভূমিকা আজ অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে ইউনেস্কোর (UNESCO) কর্মসূচীতে স্থান পাওয়ার ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। নিদারুণ দারিদ্র ও জনশিক্ষার অতি নিম্নমান সত্ত্বেও এই ঢেউ আমাদের দেশে এসে লেগেছে এবং আমাদের সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে আমরাও নানাভাবে এই আন্দোলনের সামিল হতে চেষ্টা করছি।

কার্ডিন্যাল নিউম্যান উপযুক্ত গ্রন্থ-সংগ্রহকেই প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বলতে দ্বিধা করেননি; পরবর্তীকালে অধ্যাপক অ্যালভিন জনসন সাধারণ গ্রন্থাগারকেই জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বলে অভিহিত করেন; তারপরের পর্যায়ে বিশ্ববরেণ্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী এস. আর. রঙ্গনাথন গ্রন্থাগারকে সদাসেবী অভিধায় বিভূষিত করেন; অর্থাৎ গ্রন্থাগার পরিসেবার নামান্তর মাত্র। যেখানে পাঠক বা সম্ভাব্য পাঠক সেখানেই গ্রন্থাগারের আনাগোনা তথা পরিসেবা। পাঠক গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত হন স্বেচ্ছায়; যদি না আসতে পারেন তাহলে গ্রন্থাগারেই তাঁর কাছে যাবে। এ সেই পুরানো সদযুক্তির নূতন রূপ—পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে ইত্যাদি। আবার এ ভাবেও যদি পরিসেবা সম্পন্ন না হয়, তাহলে ডাকযোগে বা অন্য কোন যানযোগে গ্রন্থের সাময়িকভাবে স্থানান্তরী হতেও বাধা নেই।

আবার এই বহুমুখী তথা বহির্মুখী কর্মধারাই আধুনিক গ্রন্থাগারের শেষ পরিচয় নয়। একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে যে চিরাচরিত মননসিদ্ধ, আয়াসসাধ্য, মসৃণ নিটোল গ্রন্থ এখন আর জ্ঞানের একমাত্র আধার নয় এবং সেই হেতু গ্রন্থাশ্রয়ী পরিসেবা আজকের দিনে গ্রন্থাগারের একমাত্র উপজীব্যও নয়। অনেকদিন থেকেই সব গ্রন্থাগারে, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কেন্দ্রিক গ্রন্থাগারে, বেশ কিছুটা স্থান ছেড়ে দিতে হচ্ছে, বহুবিধ পত্রপত্রিকাকে, যা দৈনিক-সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক-ত্রৈমাসিক-ষাণ্মাসিক-বার্ষিকের আঙ্গিকে অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়ান্তরের অধীনতা না মেনে, অজস্রভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। জ্ঞানের দুর্গম সাগর-বেলায় যে দুঃসাধ্যসাধন আহরণ তথা নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ঘটে চলেছে তারই অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় এই পত্র-পত্রিকাগুলি থেকে। এদের ক্ষুদ্র একাংশ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত; কিন্তু বৃহত্তর অংশ

সংশ্লিষ্ট বিধৎ সমাজ / প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এবং মুনাফা অর্জনের দায়মুক্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এই পত্র-পত্রিকাগুলি যে আকরিক উপাদান সমূহের ধারক ও বাহক তা অনেক সময়ই অস্বচ্ছ, অসম্পূর্ণ ও অপরিশুদ্ধ। এদের সম্পূর্ণ সূচী প্রণয়ণ, সূক্ষ্মতম বর্গীকরণ, সংক্ষিপ্তসার সংকলন, ভাষান্তর সাধন, বর্তমান ব্যবহার অন্তে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে যথাযোগ্যভাবে সংস্থাপন ও উদ্ধারণ ইত্যাদি বহুতর দুরূহ কাজ ও দায়িত্ব গ্রন্থাগারের উপরও কিছুটা বর্তেছে। এই দুরূহ কর্তব্য সম্প্রদানে/দায়িত্ব পালনে নানা তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ও নানা যান্ত্রিক / ফটোগ্রাফিক পদ্ধতি ও কম্পিউটার এর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

জ্ঞান বিজ্ঞান তথা গ্রন্থ (ও গ্রন্থসম পত্র-পত্রিকা) জগতের এই জটিল পরিস্থিতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সংরক্ষণের সমস্যা। প্রাচীন পুঁথির অন্ধকার জগৎ থেকে শুরু করে গুটেনবার্গ / ক্যাক্সটন এর ধূসর জগৎকে পিছনে ফেলে কাগজ কালি ও মুদ্রণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে আজকের দিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাগত বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে। এবং এই উন্নতির ফলে গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশন একদিকে যেমন সুলভ সহজসাধ্য ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে, অপরদিকে প্রায় বিস্ফোরণের লক্ষণাক্রান্ত হতে চলেছে। এই বিস্ফোরণের ফলে সংরক্ষণের সমস্যা পরিমাণগত ভাবে বৃদ্ধি পাবেই এবং তা ঠেকাতে হলে, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন গ্রন্থগৃধ্নুতা, তার থেকে দূরে থাকতে হবে। স্থান সংকুলান সমস্যার সমাধানে স্বেচ্ছায় গ্রন্থসংগ্রহ সীমিত করণ, কাগজ ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে গ্রন্থবস্তুকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনে অর্থাৎ মাইক্রোফিল্ম / মাইক্রোফিস ইত্যাদিতে বিধৃত করে রাখা আজকের দিনে খুবই সহজ। এছাড়া গ্রন্থের যথেচ্ছ ব্যবহার সীমিত করতে পারলে সেও আর এক উপায়। পুঁথি, প্রাচীন গ্রন্থ, অথবা ভঙ্গুর বা দুর্বল দশাগ্রস্ত গ্রন্থ, নিজগ্রন্থগৃহে অথবা আন্ত-গ্রন্থগার ঋণের আওতা থেকে তুলে নিতে পারা উচিৎ। সর্বোপরি শীততাপনিয়ন্ত্রিত গ্রন্থ (ও পত্র-পত্রিকা) সংগ্রহগৃহ একটি বড়ো এবং কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা। কিন্তু যেখানে আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে উপরোক্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না সেই সব গ্রন্থাগারের পক্ষে সংগৃহীত সংগ্রহ নিজস্ব ভৌত / রাসায়নিক ধর্ম, বাহিরের জলবায়ু, আলো অন্ধকার, পরিবেশজনিত দূষণ, কীটপতঙ্গ জীবাণু ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়া এবং উপযুক্ত

ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়, অন্যথায় গ্রন্থাগারের গ্রন্থের বিকৃতি বিবর্ণতা, বা আরো গুরুতর ক্ষতি।

এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুবর্তী হয়ে দুই তরুণ গ্রন্থাগারিক শ্রীকল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপার্থ সুবীর গুহ তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক কলাকৌশলের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ভিত্তিতে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যা বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। গ্রন্থ সংরক্ষণের মত একটি আপাতঃ নীরস বিষয়ের উপর যে আগাগোড়া যুক্তি নির্ভর আলোচনার অবতারনা করা হয়েছে তাই এ গ্রন্থের সবচেয়ে বড়ো গুণ। গ্রন্থগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা এই গ্রন্থ পাঠে নিঃসন্দেহে প্রচুর উপকৃত হবেন। সাধারণভাবে সকল গ্রন্থাগারিক এই গ্রন্থ থেকে নিজ নিজ প্রয়োজনমত বিশেষ বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও সমাধানের ঈঙ্গিত পাবেন। আর গ্রন্থপ্রেমী সাধারণ পাঠক যাঁদেব মধ্যে অনেকেই নিজ সামর্থ্য মত স্বগৃহে পুস্তক সংগ্রহে অভিলাষী হন ও অসীম মমতায় তাকে লালন করেন, তাঁদের কাছেও এই বইটি তার মনোজ্ঞ উপস্থাপনার গুণে আদৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে গ্রন্থকারদ্বয়েব পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জন্য আবাব সাধুবাদ জানাই।

কলিকাতা

দীনেশ চন্দ্র সরকার

মুখবন্ধ

শিক্ষা, জ্ঞান, আনন্দ ও তথ্যের আধার গ্রন্থ সর্বকালের মানুষ ও দেশ নির্বিশেষে সেতুবন্ধের কাজ করে। গ্রন্থই গ্রন্থাগারের মুখ্য উপাদান, কিন্তু এই উপদান নানা কারণে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। সুতরাং গ্রন্থ-সংগ্রহের সংরক্ষণের বিষয়ে আরো বেশী করে জানা, বোঝা এবং যথাসময়ে উপযুক্ত বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা, সকল গ্রন্থাগারেরই অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য।

গ্রন্থ সংরক্ষণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রাথমিক অঙ্গ ও অবশ্য পঠনীয় বিষয়। দুঃখের বিষয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের কোন স্তরেই বিষয়টি যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে পড়ানো হয় না। হাতে কলমে শেখানোর ব্যবস্থা প্রায় অনুপস্থিত। তবুও সেখানে যতটা পড়ানো হয়, তার উপযোগী বই বিশেষ করে বাংলায় নেই বললেই চলে। ছাত্র-ছাত্রী, কর্মী ও ব্যক্তিগত সংগ্রাহকেরা আজকাল বাংলায় বই খোঁজেন। সেটা স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

গ্রন্থ সংরক্ষণ সম্পর্কে কিছু তথ্যবহুল ও সুলিখিত প্রবন্ধ "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় প্রকাশিত। পূর্ণাঙ্গ একমাত্র বই হ'ল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কতৃক প্রকাশিত ও বর্তমানে নিঃশেষিত মীনেন্দ্র নাথ বসু ও কান্তি ভূষণ পাকড়াশী লিখিত "লাইব্রেরী সংরক্ষণ" (১৯৪৯)। এ ছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন কোন বইতে সংরক্ষণ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, (ক) ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ এ্যাণ্ড ইনফরমেশন সেন্টারস, কলিকাতা পরিচালিত প্রতিলিপি সম্পর্কে ১৯৪৯ সালে "Management Course in Reprography" এবং (খ) গ্রন্থ সংরক্ষণ সম্পর্কে ১৯৪৯ সালে "Management Course in Conservation of Documents" ; (গ) ১৯৪৯ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় এবং খ্যাতনামা সংরক্ষণ বিশারদ ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর সংরক্ষণ বিভাগের প্রধান এফ. জে. মার্শ পরিচালিত স্বল্পকালীন শিক্ষা এবং (ঘ) ১৯৪৯ সালে জাতীয় গ্রন্থাগার পরিচালিত "Training Course in conservation

of Library Materials" ; প্রভৃতি শিক্ষাক্রমগুলি। পূর্বভারতে ইদানিং-কালে এই কটি শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী কোন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু নেই। সংরক্ষণের দীর্ঘকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু আছে দিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানায় (National Archives of India)।

যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও প্রকাশনায় কিছু ভুল ত্রুটি থাকা সম্ভব। সহৃদয় পাঠকবৃন্দের কাছ থেকে সংশোধনের উপদেশ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সর্বগ্রাহ্য পরিভাষার অভাবে কিছু কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার প্রয়োজনে প্রচলিত ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠকগণের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

পূর্বসুরীগণের যে সকল মূল্যবান গ্রন্থ / রচনা থেকে সাহায্য নিয়েছি গ্রন্থপঞ্জীর মাধ্যমে তা কৃতজ্ঞতার সাথে সম্পূর্ণ স্বীকার করেছি। অনেক মূল্যবান টীকা থেকেও সাহায্য পেয়েছি যা গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তার জন্যও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যাঁরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক শ্রদ্ধেয় শ্রীদীনেশ চন্দ্র সরকার এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের সানুগ্রহ উৎসাহ ছাড়া এ বই প্রকাশ হতো কিনা সন্দেহ। এঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

৺শ্যামসুন্দর আঢ্য মহাশয় যিনি প্রথমে জাতীয় মহাফেজখানায় এবং পরে এশিয়াটিক সোসাইটির সংরক্ষণ বিভাগের কর্ণধার হিসাবে সংরক্ষণ সম্পর্কিত সমস্ত কাজ শিখিয়েছেন, তাঁর ঋণ কোনদিনই শোধ করা যাবে না।

স্নেহাস্পদ শ্রীধ্রুবকুমার বসু এবং শ্রীমান শুভব্রত মুখোপাধ্যায় যে কঠিন পরিশ্রম করে আমাদের কাজ অনেক হাল্কা করেছে তা সপ্রশংস উল্লেখের দাবী রাখে।

সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীনীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমিতাভ বসু, শ্রীতপন রায়, শ্রীশীতল দাস, শ্রীসি. কে. রাধাকৃষ্ণান, শ্রীমৃণাল সরকার ও শ্রীসুশীল বিশ্বাস। ঊষা প্রেসের কর্ণধার শ্রীশুভেন্দু রায়, শ্রীঅশোক রায় এবং কর্মীবন্ধুগণ নানা অসুবিধা সত্ত্বেও অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন করেছেন তার জন্য তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এঁদের আন্তরিকতা মনে রাখার মত।

শ্রীমতী স্বপ্না গুহ ও শ্রীমান পল্লব গুহ এবং শ্রীমতী ইলা মুখোপাধ্যায় ও কুমারী সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় এদের সবার সহযোগিতাও উল্লেখ না করে পারছিনা।

গ্রন্থকারদ্বয়ের বিনীত আশা যে এই প্রকাশনা—

* প্রতিটি গ্রন্থাগারকে সংরক্ষণ সম্পর্কে অবহিত করবে ;
* সংরক্ষণ বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে ;
* বিশেষভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আদৃত হবে।

সেই আশা সফল হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

পরিশেষে, প্রয়োজনে গ্রন্থাগার সংরক্ষণ বিষয়ে যে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে গ্রন্থকারদ্বয় সবসময় প্রস্তুত।

রাখী পূর্ণিমা

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়
পার্থ সুবীর গুহ

সূচীপত্র

প্রাচীনকালের লেখার উপকরণ

গ্রন্থ বলতে 'বই' বোঝায়। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ তাই বইয়ের সংগ্রহ। কিন্তু ব্যাপক অর্থে আজ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ শুধুমাত্র বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বই মানুষের প্রগতির ইতিহাস, তার জ্ঞান, তার অভিজ্ঞতাকে এক যুগ থেকে আরেক যুগে পেঁাছে দিয়েছে। আজকের যুগে গ্রামাফোন রেকর্ড, অডিও টেপ্, ফটো, মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস্, ভিডিও টেপ্ ইত্যাদি সেকাজই করে চলেছে। সাধারণ অর্থে এরা যদিও 'বই' নয় তবু আধুনিক গ্রন্থাগারে আজ এদের অবাধ উপস্থিতি। সেজন্য আজ আর গ্রন্থাগার সংগ্রহ বললে শুধুমাত্র বইয়ের সংগ্রহ বোঝায় না—বোঝায় আরো ব্যাপক সংগ্রহ যার মধ্যে এদের সবারই নিজস্ব স্থান রয়েছে।

আজকের দিনে 'বই' বলতে আমরা কাগজে ছাপা বই বুঝি কিন্তু চিরকাল এরকম অবস্থা ছিল না। মানুষের অভিজ্ঞতার লিপিবদ্ধকরণের ইতিহাসের তুলনায় কাগজের আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক।

প্রথম যুগের মানুষের ভাষা ছিল না—ভাবের আদান-প্রদান চলত আকারে ইঙ্গিতে। তারপর আস্তে আস্তে এল ভাষা—আরো অনেক পরে এল লিপি। লিপি আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত যা ছিল তার সংরক্ষণের কোন উপায় ছিল না। ঐ যুগে মুখে মুখেই চলত নানা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান—আর সেটা থাকত স্মৃতিতে—গ্রন্থাগারে নয়। এইভাবে স্মৃতিতে নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ধরে রাখার ব্যবস্থাটা কিন্তু একধরণের অস্থায়ী ব্যবস্থা। মানুষ সব সময়ই চেয়েছে তার অবর্তমানে তার চিন্তা, অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতার অমূল্য ফসল, তার অনুশাসন উত্তরসূরীদের হাতে তুলে দিতে আর সেই প্রয়োজনের তাগিদে এল লিপি যার মাধ্যমে সে তার সব চিন্তা ভাবনা লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারবে।

লিপি উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নটি এসেছিল, সেটা ছিল—কোথায় লিখব? সবচেয়ে প্রথমে লেখার জন্য বোধহয় ব্যবহৃত হয়েছিল পাথর যা সেযুগের মানুষের বাসস্থানের চারিদিকেই ছিল, কারণ তখন মানুষ ছিল গুহাবাসী। অবশ্য লিপির আবির্ভাবের আগেও মানুষ পাথরের ওপর ছবি এঁকেছে যার বিষয়বস্তু ছিল তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশে দেখা নানা পশু, পাখি এমনকি মানুষ। কিন্তু যখন সে লক্ষ্য করল আঁকা ছবি বা লেখা

সহজেই (রোদ, জল, ঝড়ে) মুছে যায়, তখন শুরু হ'ল পাথরের গায়ে খোদাইয়ের চেষ্টা। এইভাবে পাথরের গায়ে খোদাই করে লেখা বা আঁকার সুরু যদিও প্রস্তরযুগে, তবু এর স্থায়িত্বের কথা বিচার করে অনেকদিন পর্যন্ত মানুষ এর ব্যবহার করে চলেছে। আমাদের দেশে সম্রাট অশোকের শিলালিপি এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাথরের গায়ে স্থায়ী লেখা মানেই খোদাই করা কিন্তু কাজটা সহজ তো নয়ই—শ্রমসাপেক্ষও বটে। সেজন্য খুঁজতে হল অপেক্ষাকৃত উপযোগী মাধ্যমের, যার উপরে লেখা যাবে কম পরিশ্রমে এবং সহজে।

মাটির তাল

আশেপাশের জিনিষপত্রের মধ্যে নজর পড়ল মাটির দিকে—বিশেষ করে পলিমাটি বা এঁটেল মাটির নরম তালের উপর সরু গাছের ডাল বা কাঠি দিয়ে সহজে লেখা সম্ভব—তারপব রোদে বা বাতাসে শুকিয়ে নিলেই সেটা শক্ত হয়ে যায়। আরো পরে এল সেটা পুড়িয়ে নিয়ে আরো বেশী শক্ত করে তোলার ব্যবস্থা—এর ফলে ঘটল এক যুগান্তর। সম্ভব হল লিখিত কিছু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে নিয়ে যাবার। রোপিত হল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বীজ। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উপযোগী লেখার উপাদানের সন্ধান তখনও সমানে চলল। হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো থেকে আবিষ্কৃত নানা পোড়ামাটির শিলমোহরের মধ্যে সিন্ধুলিপির দেখা পাওয়া যায়।

প্যাপিরাস

মিশরের নীলনদের অববাহিকাতে নলখাগড়া জাতীয় এক ধরণের গাছ 'প্যাপিরাস' থেকে তৈরী হল নতুন লেখার মাধ্যম—'প্যাপিরাস'। নীলনদের ব-দ্বীপ অঞ্চলে মোটামুটি ফুট তিনেক গভীর জলাতে (যেখানে খুব আস্তে জল বয়ে যায়) এই গাছগুলো জন্মায়। গাছগুলো লম্বায় দশ থেকে পনেরো ফুট—গোড়ার দিকটা তিন-চার ইঞ্চি চওড়া। এই গাছের মধ্যের অংশ (Pith) সরু সরু করে কেটে সেগুলো আড়াআড়িভাবে রেখে জল দিয়ে ভিজিয়ে চাপ দিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। শুকোবার পর জুড়ে যাওয়া প্যাপিরাসকে মসৃণ করে নিয়ে তার উপর গাছের আঁশের তুলি (Brush) বা কলম দিয়ে লেখা হ'ত। লেখার জন্য কার্বন কালি অথবা লৌহঘটিত

কালির ব্যবহার করা হ'ত। এই দুই ধরণের কালিই সহজে প্যাপিরাসের আঁশের মধ্যে ঢুকে দীর্ঘস্থায়ী লেখায় রূপান্তরিত হ'ত। ছোট ছোট প্যাপিরাসের খণ্ডগুলো একটার পর আরেকটা জুড়ে লম্বা করে গুটিয়ে রাখা হ'ত। একেকটা এই ধরণের গোটানো (Roll) প্যাপিরাস একশ' ফুট বা তার চেয়েও বেশী লম্বা হ'ত। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্যাপিরাসের মধ্যে সবচেয়ে লম্বাটির দৈর্ঘ্য ১৩০ ফুট—এটিতে সম্রাট দ্বিতীয় রামেসিসের রাজত্ব-কালের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে।

গাছের ছাল

পৃথিবীর সব প্রান্তেই কোন না কোন সময় মানুষ কয়েক ধরণের গাছের ছাল লেখার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছে। মধ্য এশিয়া, চীন, ভারত এবং সংলগ্ন এলাকায় এর ব্যবহার হয়েছে বহুদিন—প্রায় গত শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত। প্রাচীন ভারতে এক সময়ে প্রধান লেখার মাধ্যম হিসাবে বার্চ জাতীয় গাছের ছাল (ভূর্জপত্র) এবং তাল পাতার ব্যবহার যথেষ্ট চালু ছিল।

বার্চগাছ (Betula papyrifera) ভারতে হিমালয় অঞ্চলে প্রচুর জন্মায়। ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা আলাস্কা ইত্যাদি অঞ্চলেও নানা ধরণের বার্চগাছ দেখতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে আমাদের দেশে কাশ্মীর অঞ্চলে এর ছালের বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ-ভারতের মালাবার অঞ্চলেও লেখার জন্য এক ধরণের গাছের ছালের ব্যবহার চালু ছিল দীর্ঘদিন। প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণাদি থেকে জানা যায় ভারতে একসময় লেখার প্রধান উপকরণগুলির মধ্যে ভূর্জপত্র অন্যতম ছিল। এইটি বার্চ জাতীয় একধরণের গাছের ছাল থেকে তৈরী হ'ত। বার্চগাছ ৪০ থেকে ১৩০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এর ছাল প্রথমে বাদামী রং-এর থাকে, আস্তে আস্তে পরে সাদাটে হয়ে যায় এবং ভেতরের দিক থেকে কাগজের মত পাতলা আস্তরণ আলাদা হয়ে আসে, এই ভেতরের দিকের ছালই লেখার সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। এটি খুবই পাতলা স্তরের সাধারণত ৩ ফুট × ৪ ফুট (৯০ সেমি × ১২০ সেমি) আকারে পাওয়া যায়—এবং কতকটা কাগজের মতই নমণীয়। প্রয়োজন অনুসারে নানা আকারে এটির ব্যবহার চালু ছিল। এর উপর খুব নরম সরু তুলির (ব্রাশ) সাহায্যে কার্বনঘটিত কালিতে লেখা হ'ত। লেখার উপযোগী করে তোলার জন্য আস্তে আস্তে শুকিয়ে নিয়ে

এর উপর তেল লাগিয়ে পালিশ করে নেওয়া হ'ত। কয়েকটা পাতলা স্তর একটার উপর আরেকটা রেখে চাপের মাধ্যমে জুড়ে নেওয়া হ'ত (চাপের মধ্যে রাখলে এর নিজস্ব আঠা এবং আঁশের মাধ্যমে এগুলো জুড়ে যায়)। বার্চগাছের ছালে স্বাভাবিক ভাবেই কয়েক ধরণের সংরক্ষণ সহায়ক রাসায়নিক পদার্থ থাকে যেমন স্যালিসেলিক অ্যাসিড ঘটিত লবণ (Salt of salicylic acid)। এগুলির উপস্থিতি বার্চ ছালকে কীট-পতঙ্গের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু অন্যান্য ছালের মতই এর সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে যে এটি সহজেই আর্দ্রতা শুষে নিয়ে ভিজে যায় এবং একটার সাথে আরেকটা পৃষ্ঠা জুড়ে যায়। কখনও বা শুকনো আবহাওয়ায় শুকিয়ে বেঁকে এবং ভঙ্গুর হয়ে যায়। একবার বেশী ভিজে যাবার পর শুকিয়ে গেলে এর পৃষ্ঠাগুলো ফেটে ফেটে যায় ফলে ব্যবহার করতে গেলেই গুঁড়িয়ে যায়।

তাল পাতা

গাছের ছালেব ব্যবহারের প্রায় পাশাপাশিই তাল জাতীয় গাছের পাতা লেখাব সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ভারতে এবং তার আশেপাশের দেশে। এক সময়ে মিশরেও এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এদের বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার এবং দক্ষিণ ভারতে—যেখানে তাল জাতীয় গাছ প্রচুর জন্মায়।

ভারতে লেখার জন্য যেসব তাল জাতীয় গাছের পাতা ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো মোটামুটি তিন রকমের (ক) তাল (খ শ্রীতাল (গ) পামতাল।

তালের পাতা মোটা আর খস্‌খসে। এটি কালি শুষে নেয় না, সেজন্য সরু ধাতব শালাকা দিয়ে এর উপরে লেখা হ'ত—ফলে পাতার উপরকার ত্বক চিরে যেত। পড়বার সুবিধার জন্য পাতার উপর তেল আর ভুষোকালি লাগিয়ে নেওয়া হ'ত।

শ্রীতালের পাতা পাতলা—কতকটা কাগজের মত নমনীয়। সহজে একে কীট-পতঙ্গ আক্রমণ করে না। ঐ পাতা কালি শুষে নেওয়ায় কার্বন ঘটিত কালিতে এর উপর লেখা হ'ত।

পামতালের পাতা মাঝারি অর্থাৎ তাল পাতা থেকে পাতলা কিন্তু শ্রীতালের তুলনায় মোটা এবং অপেক্ষাকৃত গাঢ় বাদামী রঙের। তাল পাতার মতই এর ওপর ধাতব শলাকার সাহায্যে লেখা হ'ত কারণ এটিও কালি শুষে নেয় না।

যথাযথভাবে সংরক্ষিত না হলে সব ধরণের তালপাতা কীট-পতঙ্গ এবং বিশেষতঃ ঘুনপোকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। খুব পুরানো তালপাতা তার নিজস্ব তেল হারিয়ে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

কাঠ

প্রাচীন চীনদেশে কাগজ আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত—কাঠই দ্বিতীয় সবচেয়ে ব্যবহৃত লেখার উপকরণ ছিল। চেরা কাঠ সমান করে কেটে তার ওপর মোম লাগিয়ে ছুরি বা নরুণ দিয়ে খোদাই করে লেখা হত। একটা কাঠের পাতের সঙ্গে আরেকটা কাঠের পাত সরু কব্জা দিয়ে জুড়ে যে বই তৈরী করা হ'ত ল্যাটিন ভাষায় সেই ধরণের বইকে কোডেক্স (codex) বলে। সেযুগের বহু ধর্মগ্রন্থ, আইনের বই ইত্যাদি এই কোডেক্স রূপেই পাওয়া যায়। নানা ধরণের কীট-পতঙ্গের বিশেষতঃ উইপোকার আক্রমণে এই ধরণের কাঠের পুঁথির ক্ষতি হ'ত সবচেয়ে বেশী।

বিভিন্ন সময়ে আরো যেসব জিনিষ লেখার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে হাতির দাঁত, নানা ধরণের পশুর হাড় ইত্যাদি আছে।

হাতির দাঁত

অত্যন্ত মসৃন তলের জন্য হাতির দাঁত লেখার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। এর ওপর অত্যন্ত সুক্ষভাবে খোদাই করে লেখা সম্ভব এবং সেই লেখা খুবই টেকসই এবং স্থায়ী। কিন্তু এর দুর্লভতা এবং দাম এটিকে কখনই বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমে রূপান্তরিত হতে দেয় নি। যদিও এর উপর কালি দিয়ে লেখা যায় কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় না, সহজেই মুছে যায়; কারণ কালি দাঁতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে না।

পশুর হাড়

প্রাচীনকালে কয়েক ধরণের পশুর হাড়ের উপর খোদাই করে লেখা হ'ত। এগুলোর উপর সহজেই খোদাই করা, পালিশ করা এবং রং করা যায় এবং সেটি অত্যন্ত স্থায়ী। কিন্তু এটিও কখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়নি।

ধাতব পাত—তামা, সীসা

লেখার মাধ্যম হিসাবে নানাধরণের ধাতুর ব্যবহার—ঐসব ধাতুর আবিষ্কারের সময় থেকেই চলে আসছে, অর্থাৎ প্রস্তরযুগের পর থেকেই। ব্রোঞ্জ, তামা দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়েছে। গত শতাব্দী পর্যন্ত নানা সময় বিভিন্ন নবাব-বাদশাদের ফরমান, দানপত্র ইত্যাদি ধাতবপাতেই লেখা হয়েছে। প্রাচীন জাতক থেকে আমরা জানতে পারি যে সেযুগের ধনী ব্যবসায়ীদের পাবিবারিক তথ্য, ধর্মীয় উপদেশাবলী ইত্যাদি অনেক সময় সোনার পাতেব উপর লিপিবন্ধ কবে রাখা হ'ত। বাইবেল অনুলিপিকরণের মাধ্যম হিসাবে সীসার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে করা হয় খৃীঃ পূঃ ৭৭৬ অব্দে গ্রীকপণ্ডিত হেসিওডের (Hesiod) রচনাবলী সীসার পাতের উপরই লিপিবন্ধ ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকে ধাতব পাতের উপর ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবন্ধ করার প্রচলন হয়। সীসা সাধারণভাবে নরম ধাতু এবং বাতাসে খোলা অবস্থায় থাকলে সহজে রং নষ্ট হয়ে যায়—অথচ অন্যান্য ধাতুব তুলনায় পরিবেশের দ্বারা কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। লেখার মাধ্যম হিসাবে সবধরণের ধাতুর মধ্যে তামাই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে কারণ এটি মোটামুটি শক্ত অথচ সহজেই পিটিয়ে পাতে পরিণত কবা সম্ভব। অতিরিক্ত অম্লতা এব প্রধান শত্রু।

চামড়া

প্রাগৈতিহাসিক যুগে, যখন থেকে মানুষ শিকাব করতে শিখেছে প্রায় সে সময় থেকেই চামড়াব ব্যবহার করেছে নানাভাবে। অতএব লেখার সামগ্রী হিসাবে যে এর ব্যবহাব প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীর নানা উল্লেখ থেকে আমাদের দেশেও এর ব্যবহারের কথা জানতে পারি। একদম গোড়ার দিকে অবশ্য মানুষ জানত না, কাঁচা চামড়া কিভাবে তৈরী চামড়ায় রূপান্তরিত করতে হয়। মিশরীয় সভ্যতার সময় লেখার সামগ্রী হিসাবে এর ব্যাপক ব্যবহারের প্রমান পাওয়া গেছে।

পার্চমেণ্ট, ভেলাম

যদিও প্রায়ই পার্চমেণ্ট এবং ভেলাম এই দুটি শব্দ সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয় আসলে কিন্তু চামড়া থেকে তৈরী হলেও এই দুটি সম্পূর্ণ

আলাদা ধরণের সামগ্রী। ভেলাম তৈরী হয় অজাত বাছুরের অথবা কচি বাছুর যার বয়স দেড় মাসের (৬ সপ্তাহ) বেশী নয় তার চামড়া থেকে। ঐ চামড়া থেকে মাংস, লোম ইত্যাদি পরিষ্কার করার পর সেটাকে চুনের জলে ভিজিয়ে ভেলাম তৈরী করা হয়।

সাধারণতঃ পার্চমেণ্ট তৈরী হত ভেড়ার চামড়া থেকে। অবশ্য অন্য প্রাণীর চামড়াও ব্যবহার করা হয়েছে পার্চমেণ্ট তৈরী করতে। তুলনামূলকভাবে ভেলাম অনেক বেশী মজবুত এবং দামী—এর ব্যবহার হ'ত অপেক্ষাকৃত সৌখিন ও দামী পুঁথির ক্ষেত্রে। পার্চমেণ্ট কম দামী হওয়ায় এটির ব্যবহার ছিল সার্ব-জনীন এবং ব্যাপক।

কাপড়

কাগজ আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত চীন দেশে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত লেখার মাধ্যম ছিল কাপড় —বিশেষতঃ রেশমী কাপড়। সেকালে শক্ত পাতলা কাপড়ের ওপর তুলির সাহায্যে লেখা হ'ত। তারপর সাধারণতঃ কাপড়ের টুকরোগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে সেটাকে গোল কাঠের গায়ে গুটিয়ে রাখা হ'ত যেটা সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ভাবে শক্ত মোড়কের মধ্যে ভরে মাটির অথবা কাঠের আধারের মধ্যে রাখার প্রচলন ছিল। এখনও চীন, তিব্বত, ভারতের হিমালয় অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ গুম্ফায় এই ধরণের পাণ্ডুলিপির দেখা পাওয়া যাবে। খৃঃ পূঃ ৩২৫ অব্দে ভারতেও যে লেখার মাধ্যম হিসাবে কাপড়ের ব্যবহার চালু ছিল সেটার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

গ্রন্থাগার সংগ্রহের সংরক্ষণ কি

সংরক্ষণের কথা একমাত্র তখনই উঠতে পারে যদি কোন জিনিষ বা জিনিষগুলি কোন এক বা একাধিক কারণে তার স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলতে সুরু করে অর্থাৎ তার অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটে। এদিক থেকে বলা যায় সংরক্ষণ একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি নয়—এটি একাধিক, অন্ততঃ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সচেতন পদ্ধতির সমষ্টিমাত্র। এই পদ্ধতিগুলির প্রথমটিকে আমরা বলতে পারি ক্রমাবনতির প্রতিকার Preservation), অন্যটি পুনরুদ্ধারকরণ (Restoration)।
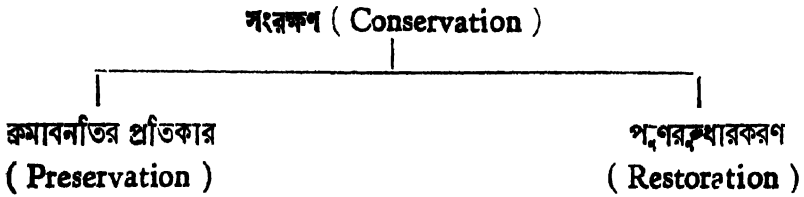
কোন বস্তুকে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং তার ক্রমাবনতিকে বাধা দেবার জন্য সচেতনভাবে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয় তাকে 'ক্রমাবনতির প্রতিকার' বলে।

কোন বস্তু যদি ক্রমাবনতির ফলে বা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ বা বিকৃত হয়ে পড়ে তবে তার সেই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত সারান বা মেরামত করার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাকে 'পুণরুদ্ধারকরণ' বলে।

কোন বস্তুর নিজস্ব গুণাগুণ বা সত্তা রক্ষা করা, তাকে ক্রমাবনতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ক্রমাবনতির প্রতিকার এবং পুণরুদ্ধারকরণ সমেত যেসব ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ করা হয় তাকে এক কথায় 'সংরক্ষণ' (Conservation) বলে।

গ্রন্থাগার সংগ্রহের ক্রমাবনতিরোধের ঐতিহাসিক বিবর্তন

প্রাচীনকাল থেকে বইয়ের রূপ ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েই চলেছে। বইয়ে ব্যবহৃত উপকরণ আর তার বাইরের রূপ দুইই পরিবর্তনশীল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাচিত্র বা গুহার গায়ে পাথরে খোদাই করা নানা নক্সা থেকে সুরু করে হাতের অস্ত্রের বা ধাতুর গায়ে আঁকা, চামড়া, ভূর্জপত্র, তাম্রলিপি, শিলালিপি, তালপাতার পুঁথি সবই কিন্তু এক যুগ থেকে আরেক যুগে মানুষের প্রগতির, চিন্তাভাবনার ইতিহাস পেঁাছে দিয়েছে। আধুনিক যুগে গ্রামাফোন রেকর্ড, অডিও টেপ, ফটো, মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস, ভিডিও টেপ ইত্যাদি সে কাজই করে চলেছে। এগুলি বই না হলেও আধুনিক গ্রন্থাগারে এদের অবাধ অনুপ্রবেশ এবং এদের জায়গাও পাকা। গ্রন্থাগার সংগ্রহের সংরক্ষণের ব্যাপারে এদের প্রত্যেকেরই যথাযোগ্য সংরক্ষণব্যবস্থা সম্বন্ধেই সচেতন হতে হবে। যদিও প্রধানতঃ প্রাচীনতম উপকরণগুলির কথা—মাটির তাল (Clay tablet), প্যাপিরাস, রেশমী কাপড়, পার্চমেণ্ট, চামড়া, তালপাতা, ভূর্জপত্র, বিবিধ গাছের ছাল ইত্যাদির ওপরে একটু বেশী নজর দিতে হবে, কারণ এগুলো দীর্ঘদিনের ক্রমাবনতির মাধ্যমে খুবই ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় এসে পেঁাছেছে। অবশ্য খুব কম আধুনিক গ্রন্থাগারে এদের দেখা পাওয়া যাবে।

গ্রন্থাগার সংগ্রহের উপকরণ যাই হোক না কেন—তার সংরক্ষণের সমস্যা অনেক। উপকরণের বিভিন্নতার সাথে সাথে সংরক্ষণের সমস্যাও নানা রকমের হয়। যখন প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় তখন থেকেই এইসব সমস্যা রয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীন গ্রন্থাগারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় চীন, মিশর এবং অ্যাসিরিয়ায় প্রায় একই সময় গ্রন্থাগারের সুরু। আর এইসব গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল ধর্মস্থান এবং রাজপ্রাসাদকে ঘিরে। গ্রন্থাগারের এই ধর্মীয় এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা চীন, মিশর থেকে সুরু করে গ্রীক এবং রোমান সাম্রাজ্যের সময়ও অব্যাহত ছিল। খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারের সময়ও প্রচারকরা গ্রন্থাগারের প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করতেন। রাজাদের গ্রন্থাগার প্রীতির

কারণ বোধহয় তাঁরা বুঝেছিলেন যে এইসব গ্রন্থাগার সংগ্রহ তাদের অস্ত্র-সম্ভারের সংগ্রহের চেয়েও বেশী শক্তিশালী। এখানে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। খৃঃ পূঃ ২৬৭ অব্দে গথ আক্রমণ-কারীরা যখন অ্যাগিয়ান (Aegean) দখল করে এথেন্স লুট করে, জানা যায় সে সময় এরা গ্রন্থাগার ধ্বংস করায় অথবা তাতে অগ্নি সংযোগে বিরত ছিল। বলা হয় আক্রমণকারীদের বিশ্বাস ছিল গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী বিদ্বানেরা কখনই ভাল সৈনিক হতে পারে না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের হাতের কাছে গ্রন্থাগার থাকবে ততক্ষণ তাদের মনোযোগ অন্য কোন দিকেই সহজে আকৃষ্ট হবে না। এই ঘটনার কারণ অবশ্যই অন্যকিছু হতে পারে—যেমন হয়ত গ্রন্থাগার তাদের অগ্রসরমান বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে অথবা গ্রন্থাগারের ব্যাপারে তাদের স্বল্পজ্ঞান কোন ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলেছিল ইত্যাদি। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন জ্ঞানপিপাসা মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে নম্র করে দেয়। সে যাই হোক, এটা ঠিক যে প্রথম যুগের গ্রন্থাগার সংগ্রহের একটা বড় অংশ (প্রায় সম্পূর্ণটা) জুড়ে থাকত মাটির তালের পুঁথি (Clay tablet)। গ্রন্থাগার সংগ্রহের সবচেয়ে পুরানো সমস্যা ছিল নরম মাটির তালের মধ্যে পোকার সরু সরু সুড়ঙ্গ খোঁড়া—যেটা সাধারণতঃ ঐগুলোকে রোদে শুকানোর আগেই হত। রোদে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাবার পর নতুন যে সমস্যা দেখা দিত সেটা শুকনো মাটির ভঙ্গুর অবস্থার জন্য—যার ফলে এর উপরের তলটা সহজে ক্ষয় হয়ে লেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে অথবা সম্পূর্ণ মুছে যেত। এর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে এবং শক্ত বা খসখসে জিনিষের সাথে যাতে ঘসা না লাগে সেদিকে নজর রাখতে হ'ত। এদের সংরক্ষণ করা হ'ত সযত্নে বড় বড় আধারের মধ্যে রেখে। কাল্‌দিয়ায় সেমিটিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সার্গন একটা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন যেটি নিনেভের পতনের সময় শেষপর্যন্ত এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়েছিল। এই গ্রন্থাগারে প্রচুর মাটির তালের পুঁথি সংরক্ষিত ছিল। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রাচীন তেল্লো শহরের গ্রন্থাগারে প্রায় তিরিশ হাজার এই ধরণের পুঁথি ছিল। সে যুগের অন্যসব গ্রন্থাগারের মধ্যে অন্যতম বাগদাদের আক্কাদ গ্রন্থাগারের সংগ্রহেও এধরণের পুঁথির সংখ্যাই ছিল বেশী। সুমেরীয় সভ্যতার ধারক ব্যাবিলোনিয়ানরাও এই ধরণের মাটির তালের ওপর লিখিত। বরসিপ্পার বিখ্যাত গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল এরকমের

মাটির তালের পুঁথি নিয়েই যার অনুলিপি সংগ্রহ করে অ্যাসিরিয় রাজা অসুরবানিপাল তার গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন।

নীল অববাহিকার মাটি, মাটির তাল বানানোর পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত ছিল না। অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক নতুনতর লেখার মাধ্যমের যে অনুসন্ধান প্রাচীনতমকাল থেকে চলে আসছে তারই ফল স্বরূপ স্থানীয় নলখাগড়া জাতীয় গাছ প্যাপিরাস থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে কাগজের মত জিনিষ তৈরী করা সুরু হয়, যেটা লেখার পক্ষে বেশী উপযোগী হলেও মাটির তালের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজেই নষ্ট হয়ে যেত। এগুলোকে সংরক্ষণের জন্য একটার নীচে আরেকটা জুড়ে গোল কাঠের দণ্ডের ওপর গুটিয়ে নিয়ে সেটাকে কাপড়ের বা চামড়ার খাপের মধ্যে রেখে দেওয়া হ'ত। এদিক থেকে বলা চলে সচেতনভাবে গ্রন্থাগারের সংরক্ষণের প্রচেষ্টা সুরু হয় আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে যার একটি ধারার দেখা পাওয়া যায় প্যাপিরাসের যুগে—মিশরে। মিশর থেকে ঠিক কিভাবে বা কবে প্যাপিরাসের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ প্রণালী গ্রীসে পেঁৗছেছিল সেটা জানতে না পারলেও ধরে নেওয়া যায় যে বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে প্যাপিরাসের প্রচলন হয় গ্রীসে। ওদেশে প্যাপিরাস যে যথেষ্ট জনপ্রিয় লেখার মাধ্যম ছিল সেই তথ্য জানা যায় হেরোডোটাসের (Herodotus) লেখা থেকে। খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে গ্রীসে লেখার মাধ্যম হিসাবে প্যাপিরাসই ছিল প্রধান।

খৃঃ পূঃ ১২০০ অব্দে সম্রাট দ্বিতীয় রামেসিস এর গ্রন্থাগারদ্বয়ের (একটি থিবেসে এবং অন্যটি মেমফিস শহরে) সংগ্রহের মধ্যে মাটির তাল, প্যাপিরাস, তালপাতা, কাঠের ফলক, চামড়া, পাথর ইত্যাদি সবই ছিল। একমাত্র পাথর ছাড়া অন্য সবই সহজেই নষ্ট হয়ে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেত। মাটির তালের ক্ষেত্রে পোকা; তালপাতা, কাঠ, গাছের ছাল, প্যাপিরাসের ক্ষেত্রে অত্যাধিক শুষ্কতা অথবা আর্দ্রতা, কীটপতঙ্গ, বিশেষত উইপোকা; রেশমী কাপড়, চামড়ার পক্ষে আরশোলা, উই, সিলভার ফিস এবং অন্যান্য পোকামাকড় বেশী ক্ষতিকারক। এছাড়াও চরম আবহাওয়া, আর্দ্রতা, ধুলোবালি ইত্যাদি তো আছেই। আবহাওয়ার ঐসব বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে মিশর, গ্রীস এবং রোমে কাঠের অথবা হাতির দাঁতের নলাকার (cylindrical) পাত্রে পাণ্ডুলিপি ভরে ভালভাবে মুখ আঁটা অবস্থায় সংরক্ষণ করা হ'ত।

কাগজের আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত চীন দেশে রেশমী কাপড় আর কাঠের

ব্যবহার বেশী প্রচলিত ছিল। সরু কাঠের পাতে অথবা বাঁশের টুকরোর ওপর বিভিন্ন দরকারী তথ্য লিপিবন্ধ করা হত। নানা ধরণের ভেষজ ব্যবহার করে এদের কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা ছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে কাগজের আবিষ্কারের আগে থেকেই অর্থাৎ দ্বিতীয় শতাব্দীর আগেই চীন দেশে ভেষজের সাহায্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

পরবর্তীকালে রোম, গ্রীস এবং আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের সমস্যাটা আগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়ে গিয়েছিল লেখার সামগ্রী হিসাবে প্যাপিরাসের বদলে পার্চমেণ্ট এবং ভেলামের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে। চামড়া থেকে ঐসব উপকরণ তৈরীর সময় চুন এবং অন্যান্য কয়েক ধরণের ভেষজ ব্যবহারের ফলে কীটপতঙ্গ সহজে এগুলিকে আক্রমণ করতো না।

জ্ঞান প্রসারের ফলে পুঁথিপত্রের সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সংরক্ষণের সমস্যাও বাড়তে সুরু করে। অনুকূল আবহাওয়াতেও পাকানো পাণ্ডুলিপিগুলি নাড়াচাড়া করা অথবা ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখা খুব একটা সহজ নয়। শুকনো গরম আবহাওয়ার শক্ত করে গুটিয়ে রাখা পার্চমেণ্ট খুলবার সময় ভেঙ্গে যায়। আবার আর্দ্র আবহাওয়ায় পার্চমেণ্ট ফুলে ওঠে এবং এর উপরের লেখাও অস্পষ্ট হয়ে কখনও কখনও সম্পূর্ণ পড়ার অযোগ্য হয়ে যায়। এইসব কারণে সেসময় থেকেই বেশী টেকসই উপকরণের খোঁজ করা হচ্ছিল, যার উপর লেখা যায়—ফলে নতুন নতুন উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে নানা যুগে।

খৃষ্টধর্ম প্রচারের ঠিক আগে আয়তাকার চামড়ার পৃষ্ঠায় ব্যবহার চালু ছিল, যেটা লেখার পর একত্রে সাজিয়ে ব্যবহারের সুবিধার জন্য একদিকে সেলাই করে বইয়ের মত করে নেওয়া হ'ত।

মধ্যযুগে মানুষের এবং নানা বাণিজ্যিক পণ্যের দেশদেশান্তর যাত্রার সাথে সাথেই গ্রন্থাগারের শত্রুরাও (বিশেষতঃ কীটপতঙ্গ) ছড়িয়ে পড়ে নানা দেশে। ভূমধ্যসাগরের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যে ধরণের বুকওয়ার্ম আর ছত্রাক দেখা যেত আস্তে আস্তে সেগুলো শীতপ্রধান উত্তর ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। চীন, মধ্য এশিয়া, এশিয়া মাইনরের নানা পোকামাকড় ইউরোপে হাজির হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু প্রতিকুল আবহাওয়ায় লোপ পেয়েছে, অন্যেরা নতুন পরিবেশের সাথে খাপখাইয়ে নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। নানা গ্রন্থাগারে সমস্যা যখনই বাড়ে সচেতনতা তখনই জেগে ওঠে। শত্রুর আক্রমণ ব্যাপক হওয়ায় গ্রন্থগারিকরা ক্রমশ এইসব শত্রুদের সম্বন্ধে আরো সচেতন হয়ে উঠতে শুরু

করেন—লেখা হয় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে পুস্তিকা। এগুলো গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এমনি একটা বহুল প্রচলিত পুস্তিকা হচ্ছে রেমেডিয়াম কনট্রা ভারমেস লাইব্রেরাম (Remedium Contra Vermes Librarum) যেটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা। নানা পুরানো নথি পত্রে থেকে জানা যায় যে ৯৯৩ খৃীঃ বাগদাদের সাবুর-ইবন-আর্দাশীর (Sabur-Ibn-Ardashir) গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা উইপোকার হাত থেকে সংগ্রহকে রক্ষা করার জন্য এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার করতেন।

প্রাচীন চীনদেশে কর্কজাতীয় গাছের বীজ থেকে একধরণের ভেষজ তৈরী করা হত যার নাম ছিল "হুয়াংনেই" (Huangneih)। গ্রন্থাগারে কীট-পতঙ্গের উৎপাতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল। চীনে সেকালে আইন করে ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে সব কাগজ তৈরী করার সময় ঐ ভেষজ মেশানো হবে পোকার আক্রমণ থেকে কাগজকে বাঁচাবার জন্য।

১২২১ খৃীঃ দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক রোমান সম্রাট হবার পর লক্ষ্য করেন যে আদ্রর্তা এবং কীট পতঙ্গের আক্রমণে কাগজ অপেক্ষাকৃত সহজে নষ্ট হয়ে যায়। সেকারণে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে "এখন থেকে সব আইন পার্চমেণ্টের উপর লেখা হবে—এবং যেগুলো কাগজে লেখা আছে সেগুলোও আগামী দু'বছরের মধ্যে পার্চমেণ্টে লিখতে হবে।" সেসময়ে ইউরোপে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য বইগুলোকে সীডার উড্ (Ceder wood) তেলে মুছে মুখ বন্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করা হ'ত। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে সংরক্ষণের যে সব ব্যবস্থার প্রচলন ছিল তার মধ্যে ছিল ফটকিরি, কর্পুর, গোলমরিচ, লবঙ্গ, কস্তুরী, নিমপাতা, তামাকপাতা, কালোজিরে, ভেষজ তেল ইত্যাদি বইয়ে অথবা বইয়ের আশেপাশে প্রয়োগ করে সেগুলোকে কাঠের সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা। এই সব ভেষজ ব্যবহারের মাধ্যমে কীটপতঙ্গের আক্রমণ কিছুটা কমানো সম্ভব হলেও সম্পূর্ণ প্রতিরোধ সম্ভব হ'ত না।

সে যুগের যেসব খবরাখবর আমরা সংগ্রহ করতে পারি তা থেকে জানা যায় যে তখনকার গ্রন্থাগারিকেরা শুধুমাত্র সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতনই ছিলেন না যথেষ্ট সচেষ্টও ছিলেন। খৃীঃ চতুর্থ অব্দে সেণ্ট প্যাকোমিয়াস যখন প্রথম খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন তখনই সেখানে গ্রন্থসংরক্ষণের দিকে বিশেষ নজর দেবার ব্যবস্থা করেন।

মধ্যযুগের এবং তার পরবর্তী রেঁনেসার সময় যখন সংবাদ / তথ্য আদানপ্রদান খুবই শ্লথ গতিতে চলত—শিক্ষা-গবেষণার কেন্দ্রগুলো একটা আরেকটা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল—স্বাভাবিকভাবেই সে সময় বইয়ের উপকরণের উৎকর্ষতার এবং বই তৈরীর অগ্রগতি খুবই ধীর গতিতেই চলত। মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে সেলাই করা পার্চমেণ্টের পৃষ্ঠাযুক্ত বইয়ের প্রচলন হয়, যেগুলো শক্ত কাঠের ফলকের রক্ষাকারী মলাটের বা আংশিক চামড়া অথবা ভেলামের আবরণের মলাটে ঢাকা। তখনই মোটামুটি স্থায়ীভাবে পার্চমেণ্টের বই তার জায়গা করে নিয়েছিল গ্রন্থাগারে। বইয়ের মলাটে কাঠের বদলে বোর্ডের ব্যবহার সুরু হয় ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। তার পরবর্তী শতকে (সপ্তদশ শতাব্দী) এই বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে পুরো চামড়ার বদলে আংশিক চামড়ার ব্যবহারের প্রচলন হয়। এখন আমরা যাকে কাগজের বাঁধাই বা পেপার বাইণ্ডিং বলে জানি সেটার সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতকেই। এর কিছুকাল আগে থেকেই ছোট ছোট পাতলা বইয়ের মলাটে কাগজ ব্যবহারের সূত্রপাত হয়। এই শতকের শেষভাগে বইয়ের দাম কমিয়ে সাধারণের কাছে সেগুলো পেঁছে দেবার জন্য সস্তা কাগজের ব্যবহার, সস্তায় বাঁধাইয়ের প্রবণতা সুরু হয়। অবশ্য তার আগেই ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে ছাপাখানার প্রভূত উন্নতি, সস্তায় আধুনিক ছাপা বই প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল। সে সময় থেকেই সামান্য কয়েকজনের বদলে বই সার্বজনীন রূপ ধারণ করে। এসবের ফলে সংরক্ষণের সমস্যাগুলোর নানা রূপান্তর ঘটে। শেকলে বাঁধা বইয়ের যুগ (যখন গ্রন্থাগার ছিল সমাজের অল্প কয়েকজনের জন্য এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত) থেকে তার পরবর্তী যুগে যখন পুঁথির অনুলেখন সুরু হয় তখন অপেক্ষাকৃত বেশী নির্বাচিত পাঠকের জন্য গ্রন্থাগারের দরজা খুলে যায়। কিন্তু মধ্যযুগের পরে—মোটামুটি গত শতাব্দী থেকে ক্রমশ গ্রন্থাগারের সার্বজনীন রূপ ফুটে ওঠে।

হাতে লেখা পুঁথির প্রবর্তনের পর থেকে বই এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাবার এবং সংরক্ষণের সুবিধা হয়। সে সময় থেকে সংরক্ষণে পদ্ধতিও অনেক উন্নত হয়ে উঠতে থাকে। মধ্যযুগে পার্চমেণ্টে লেখা পৃষ্ঠাগুলো ভেলামে সেলাই করে দুদিকে চামড়া অথবা ভেলামে মোড়া কাঠের পাত দিয়ে বাঁধানো বইগুলো সাধারণ আবহাওয়া, কীট-পতঙ্গের আক্রমণে সহজে ক্ষতিগ্রস্থ হ'ত না। অবশ্য পার্চমেণ্ট এবং ভেলাম আর্দ্র আবহাওয়ায় ছত্রাক দ্বারা

আক্রান্ত হতে পারে, কিন্তু কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করলে এই সমস্যার সমাধান করা খুব একটা শক্ত নয়। ভেষজ এবং ফট্‌কিরি ব্যবহার করে শোধিত চামড়ার একশ' বছরেও কোন রকম ক্ষতি হয় না। আমাদের দেশে তালপাতার পুঁথি রক্ষার জন্য দু'দিকে কাঠের ফলক বেধে পৃষ্ঠাগুলোকে রক্ষা করা হ'ত। পুঁথিগুলো সাধারণতঃ এক বিশেষ ধরণের লাল কাপড়ে মুড়ে রাখা হ'ত।

বইয়ের দাম কমাবার জন্য সস্তা কাগজে লেখা অথবা ছাপার ব্যাপক ব্যবহার সুরু হতেই বই বাঁধাইয়ের ব্যাপারেও সস্তা পদ্ধতি অবলম্বনের সূত্রপাত ঘটে। তারই সঙ্গে এইসব বইয়ের সংরক্ষণের সমস্যাও বেড়ে যায়। কারণ নতুন সস্তা এই উপকরণগুলো বিরূপ আবহাওয়াতে সহজেই ছত্রাক এবং কীট-পতঙ্গের আক্রমণের শিকার হয়। যেসব ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত মজবুত উপাদান সহযোগে বাঁধাই করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে ভেলাম এবং চামড়ার বাঁধাই প্রায় অক্ষত রয়েছে অথচ ভেতরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলো ছত্রাক এবং কীট-পতঙ্গের আক্রমণে নষ্ট হয়ে গেছে।

সংরক্ষণের সমস্যা বাড়ার সাথে সাথেই গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা অনেকগুণ বেড়ে যায়: তাঁরা আগের তুলনায় এ ব্যাপারে অনেক সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে সুরু করেন। প্রধানতঃ নিয়মিত ঝাড়পোছ করা, প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার ভেতরে রোদের অনুপ্রবেশ সীমিত করা, কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। অষ্টাদশ শতকে কীটপতঙ্গের হাত থেকে বইপত্তর বাঁচানোর পথ ব্যাপকভাবে খোঁজা সুরু হয়—সে সময় অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করে। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই একমাত্র কাগজ এবং চামড়ার অম্লতাজনিত ক্ষতি ছাড়া অন্য সব ক্ষয়ক্ষতির কারণ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়েছিল—যদিও সব ব্যাপারে সঠিক প্রতিরোধের পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই শতকের প্রগতির সাথে সাথে যথেষ্ট কার্যকরী ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে যাতে ক্রমাবনতির প্রতিকার এবং পুনরুদ্ধারের কাজে অনেক অগ্রগতি হয়েছে।

কাগজকে ধবধবে সাদা করার জন্য কাগজ শিল্পে ক্লোরিনের ব্যবহার সুরু হয়। কিন্তু অতিরিক্ত ক্লোরিন মণ্ড থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত না করায় তৈরী

কাগজে তার যে রেশ থেকে যায় ভবিষ্যতে তারই সঙ্গে বাতাসের আর্দ্রতার বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় ক্ষতিকারক অম্লতার।

কাগজের চাহিদা বাড়ার ফলস্বরূপ কাগজ তৈরীর উপকরণ হিসাবে শুধুমাত্র কাপড়, পাট, বাঁশ, তুলো ইত্যাদির উপর নির্ভর করা আর সম্ভব হ'ল না—সস্তা কাগজের জন্য নানা ধরণের কাঠ উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হতে সুরু হল। এই ধরণের কাঠের আঁশ ছোট আকারের। যদিও এটার সূত্রপাত হয় প্রয়োজনের খাতিরেই, তবু গ্রন্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এটা নিয়ে আসে এক বিরাট সমস্যা—কারণ কাঠের গুঁড়ো থেকে তৈরী কাগজে প্রচুর পরিমানে লিগনিন নামক উপক্ষার (Alkaloid) থাকে। এটি থেকে সৃষ্ট অম্লতা কিছুদিনের মধ্যেই কাগজের উপর এক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া শুরু করে যার ফলে কাগজের সাদা রং নষ্ট হয়ে যায় এবং সহজেই ভঙ্গুর হয়ে যায়। এইসব অসুবিধা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশকেরা বইয়ের দাম সাধারণের নাগালের মধ্যে রাখার জন্য ঐ সস্তা কাগজে বই ছেপেই চলেছেন—ফলে প্রত্যেক গ্রন্থাগারকেই সম্মুখীন হতে হচ্ছে সংরক্ষণের সমস্যার।

গ্রন্থাগার সংরক্ষণের সমস্যার অন্যতম কারণগুলির মধ্যে রয়েছে কাগজ তৈরীর সময় নানা ত্রুটি যা পরে সমস্যার সৃষ্টি করে, ছাপা অথবা লেখার সময় উপযুক্ত কাগজ নির্বাচন না করা ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক সময় গ্রন্থাগার সংগ্রহ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারিকের সরাসরি হাত থাকে না। যদি সেটা থাকতো তবে উপযুক্ত মাধ্যম অথবা প্রক্রিয়া নির্বাচনের মধ্য দিয়ে হয়ত গ্রন্থাগার সংগ্রহের ভাবীকালের ক্রমবনতির সমস্যার একটা বড় অংশের সমাধান করে নেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু বাস্তবে যেটা সম্ভব নয় তার কথা ভেবে লাভ নেই—হয়ত ভবিষ্যতে কোনদিন সমাজের সকলেই সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠবে এবং এমন উপাদান (কাগজ, কালি, চামড়া, ছাপা ইত্যাদি) নির্বাচন করবে যাতে সংরক্ষণের সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় সবটাই কমে যাবে।

এ ব্যাপারে কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই শতকের সুরুতে আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন এক নতুন আন্দোলন শুরু করেন যার মাধ্যমে অপেক্ষকৃত টেকসই এবং উপযুক্তভাবে লেখা বা ছাপানো সংগ্রহকেই শুধুমাত্র গ্রন্থাগারে স্থান দেবার প্রয়াস চালান হয়। ১৯১৩ সালে আন্দোলনকারীরা খবরের কাগজ, যা সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলেন। ১৯২৫ সালে কয়েকটি বড়

গ্রন্থাগার খবরের কাগজের প্রকাশকদের জানিয়ে দেন যে অত্যন্ত নীচুমানের কাগজে ছাপা হওয়ায় খবরের কাগজ সংরক্ষণের যথেষ্ট সমস্যা সৃষ্টি করছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারে এদের আর রাখা সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে কিছু সচেতন প্রকাশকদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ১৯২৭ সাল থেকে নিউ ইয়র্ক টাইমস (**New York Times**) বিভিন্ন গ্রন্থাগারের জন্য ভাল টেকসই রোগা কাগজে কিছু কপি (copy) ছাপাতে শুরু করে। এরপর ক্রমশঃ অন্যান্য প্রধান খবরের কাগজ এই ধরণের ব্যবস্থা নেয়। শুধুমাত্র কাগজই নয়, কালির ব্যাপারেও একই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে যদি যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে সংরক্ষণের সমস্যার কথা প্রচার করা যায়, তবে সমাজের নানা স্তরের মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন গ্রন্থাগারিকদের দিকে। আধুনিক যুগে ক্রমশ এই সচেতনতা বাড়ছে, এর যথাযথ ব্যবহার করে সবটুকু সুফল আমাদের গ্রহণ করতেই হবে।

এক কথায় বলা চলে যে উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বইয়ের সংখ্যা সীমিত হলেও উপকরণ গুলো অনেক মজবুত হওয়ায় বইগুলো অনেক টেকসই হ'ত ফলে সংরক্ষণেরও সুবিধা ছিল।

একটা বইয়ে কাগজ ছাড়াও অন্য যে সব উপকরণ ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে চামড়া একটা। সে যুগে কাঁচা চামড়া ভেষজ প্রক্রিয়ায় ব্যবহারোপযোগী করতে কয়েক মাস সময় লাগত। পদ্ধতিটি বেশ কষ্ট সাধ্য ছিল ; কিন্তু ঐভাবে তৈরী চামড়া আধুনিক চামড়ার তুলনা ছিল খুবই টেকসই এবং সুন্দর।

বৃটিশ লেদার ম্যানুফাকচারারস' অ্যাসোসিয়েশন (**British Leather Manufacturer's Association**) ১৯৩০ সালে চামড়া সংরক্ষণের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে। এই সব গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা জানতে পেরেছি ভেষজের ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরী চামড়ার অম্লতাজনিত কারণে নষ্ট হবার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। বৃটিশ মিউজিয়াম (**British Museum**) তাদের গবেষণার মাধ্যমে পটাশিয়াম ল্যাকটেট্ (**Potassium Lactate**) ব্যবহারের মাধ্যমে চামড়ার অম্লতা এবং বই বাঁধাইয়ের চামড়ার ওপর সালফিউরিক অ্যাসিডের (**Sulphuric Acid**) প্রভাবজনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষায় সক্ষম হয়।

রয়েল সোসাইটি অব আর্টস্ (Royal Soci‹ ty of Arts) ১৯০১ সালে তাদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে বইয়ের মলাটের চামড়া সহজে নষ্ট হবার প্রধান কারণগুলি হচ্ছে বই বাঁধাইয়ের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করা, যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে কাজ না করা, কাজে আপাত সুবিধার জন্য বেশী পাতলা চামড়া ব্যবহার করা (যা সহজে অল্প ব্যবহারেই প্রান্তগুলি এবং ভাঁজগুলি নরম হয়ে ছিঁড়ে যায়)। ব্যবহৃত আঠা ইত্যাদি সঠিকভাবে তৈরী না করার জন্য বাঁধাইয়ের চামড়ার সংরক্ষণের সমস্যাগুলিকে বাড়িয়ে তোলে।

গ্রন্থাগার সংগ্রহের প্রধান কয়েকটি উপাদান

সংরক্ষণের ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে একটা বইয়ে প্রধানতঃ কি কি উপকরণ থাকে। একটা বই হাতে নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এতে আছে—কাগজ, কালি (লিখতে অথবা ছাপার কাজে ব্যবহৃত), চামড়া, সুতো, আঠা (বাঁধাইয়ে ব্যবহৃত), বাঁধাইয়ের উপর লেখার জন্য বিবিধ পদার্থ ইত্যাদি। আমরা যদি প্রধান উপকরণগুলি সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে জানতে পারি, তবে সংরক্ষণের সমস্যা আর তার সমাধান সম্বন্ধে বুঝতে সুবিধা হবে।

কাগজ

আমরা সবাই জানি কাগজ কাকে বলে। সাধারণভাবে টুকরো কাপড়, খড়, পাতা, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি থেকে কাগজ তৈরী করা হয়।

হাতে তৈরী কাগজের প্রস্তুত প্রণালী প্রায় অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে সেই প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত (যান্ত্রিক মণ্ড মিশ্রণ পদ্ধতি বা কাটার যন্ত্রের ছোটখাট প্রযুক্তির উন্নয়নের কথা বাদ দিলে)। প্রক্রিয়াটি খুবই সাধাসিধে—প্রথম ন্যাকড়া, তুলো, পাট ইত্যাদি লম্বা আঁশযুক্ত উপাদান জোগাড় করে তার চরিত্র, রং ইত্যাদি অনুসারে আলাদা করা হয়। পরে বড় পাত্রে ক্ষার মেশান জলে সেদ্ধ করা হয়। প্রয়োজনমত উপাদানের রং নষ্ট করার জন্য বিরঞ্জনকারক (bleacher) ব্যবহার করা হয়। সেদ্ধ হবার পর সমস্ত মণ্ডটি অনেক জলের সঙ্গে মিশিয়ে থিতিয়ে যেতে দেওয়া হয়, ফলে আঁশগুলো, যেটা থেকে কাগজ তৈরী হবে সেটা ভেসে উঠে এবং বাড়তি ক্ষার অথবা অন্য রাসায়নিক পদার্থ নীচে থিতিয়ে পড়ে। তারপর ঐ ভেসে থাকা আঁশগুলো তুলে নিয়ে মুগুরের সাহায্যে থেতলে বড় বড় আঁশগুলোকে ছোট ছোট টুকরোতে পরিণত করা হয়। এই অবস্থায় এর সাথে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়, কাগজকে লেখার অথবা ছাপার উপযোগী করে তোলার জন্য। এবারে কারিগরেরা জালের বড় ছাঁকনিতে (deckle) মিশ্রণ নিয়ে দক্ষতার সাথে নাড়তে থাকেন, যার ফলে মিশ্রণের মধ্যেকার আঁশ সমানভাবে সর্বদিকেই ছড়িয়ে

যায়। আঁশগুলো এমনভাবে ছড়াতে হয় যাতে কোথাও মোটা আবার কোথাও পাতলা না হয়ে সবজায়গাতেই একই ঘনত্বে থাকে। পাত্রের ধারের কাঠের কাঠামো তরল মিশ্রণকে পাত্র থেকে গড়িয়ে পড়তে দেয় না। নাড়াচাড়া করে সমানভাবে আঁশগুলো ছড়াবার এবং অতিরিক্ত জল ঝরে যাবার পর পাত্রের কাঠের কাঠামো সরিয়ে সাবধানে ভেজা কাগজকে আলতোভাবে শোলার পাতের বা ফেল্টের (felt) উপর রাখা হয় ; তার উপরে আরেকখণ্ড শোলার পাত চাপা দেওয়া হয়। এইভাবে একটার পর একটা কাগজ রেখে শুকোতে দেওয়া হয়। শুকোবার সাথে সাথে কাগজ ক্রমশ মসৃণ হয়ে উঠে। সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবার পর নির্দিষ্ট আকারে সেগুলোকে কেটে নেওয়া হয়। কাগজের উপর পাতলা ভেষজ আঠা জাতীয় রসায়নের প্রলেপ দেওয়া হয়, যাতে লেখার সময় কালি সহজে ছড়িয়ে না যায়। ঊনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত সব কাগজই এইভাবে হাতে প্রস্তুত করা হতো তুলো, ন্যাকড়া ইত্যাদি উপকরণ থেকে। প্রধান উপাদান হিসাবে তুলো ব্যবহার করে যে কাগজ তৈরী হ'ত, সেটা আমাদের দেশে 'তুলট' কাগজ নামে পরিচিত।

ঐতিহাসিক দিক থেকে বলা যায়, ১০৫ খৃঃ নাগাদ গাছের ছাল, ন্যাকড়া ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রথম একধরণের কাগজ তৈরী সুরু হয় চীন দেশে। ঐ কাগজ একটু নরম প্রকৃতির ছিল এবং সহজেই জল শুষে নিত, এজন্য এর উপর তুলি দিয়ে লেখা হ'ত। এই ধরণের কাগজ ছাপার কাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। এর নমুনা চীন দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বৃটিশ মিউজিয়াম সহ কয়েকটি সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। ব্লক থেকে ছাপার উপযুক্ত কাগজ তৈরী হতে সুরু হয় আরো অনেক পরে। নবম শতাব্দী নাগাদ ব্লকে ছাপা বই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। কাগজ তৈরীর প্রযুক্তি চীন থেকে কোরিয়া হয়ে জাপানে পেঁছোয়। নবম শতাব্দীর সুরু নাগাদ কাগজ শিল্প বেশ ভালভাবেই বেড়ে উঠে জাপানে। পশ্চিম থেকে আগত ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে কাগজের ব্যবহার এবং তৈরীর প্রযুক্তি ক্রমশ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। সেই কারণে দেখা যায়, ব্যবসায়ীদের যাত্রাপথ ধরে কাগজ ৭৫১ খ্রীঃ সমরখন্দে, ৭৯৩ খ্রীঃ বাগদাদে, তারপর দামাস্কাস হয়ে ৮৫০ খ্রীঃ মিশরে এবং ১১00 খ্রীঃ মরক্কোতে পেঁছে যায়। ৯৫0 খ্রীঃ নাগাদ কাগজ লেখার সামগ্রী হিসাবে মিশরে প্যাপিরাসের আসনটি সম্পূর্ণভাবে দখল করে নেয়।

ইউরোপে প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে কাগজ তৈরীর কারখানা গড়ে

ওঠে প্রথমে ১১৫০ খৃঃ নাগাদ স্পেনে, তারপর ক্রমশ আরো অনেক জায়গায়। শুধুমাত্র কারখানার সংখ্যাই নয় সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিও আরো উন্নত হয়। কাগজে জলছাপের (water mark) প্রথম প্রবর্তন হয় ইটালিতে। সুরুতে সীমিত মাত্রায় কাগজ পাওয়া যাবার ফলে এর ব্যবহারও ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু মোটামুটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুরুতে এর ব্যবহার সার্বজনীন হয়ে দাড়ায় ফ্রান্সে এবং জার্মানীতে। পরবর্তী শতকে ইংলণ্ডে এবং হল্যাণ্ডেও সাধারণের হাতে কাগজ পেঁছে যায়।

কাগজের চাহিদার সাথে সাথে এটি উৎপাদনের জন্য কাঁচামালের চাহিদাও বাড়তে থাকে। ১৭১৯ খৃঃ জার্মানীতে রেঁনো রেমু্য (R. Reaumur) কাগজ প্রস্তুতের কাজে কাঠের ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বলেন। ইংল্যাণ্ডে কোপস (Koops) এবং ফ্রান্সে ডিডোঁ (Didot) নতুন নতুন উপাদান নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যাভেরিয়ান বৈজ্ঞানিক জ্যাকব শ্যেফার (Jacob Schaeffer) গাছের ছাল, খড়, তুষ, শ্যাওলা, তরকারীর খোসা, নরম কাঠ ইত্যাদি ব্যবহার করে কাগজ তৈরী করেন। ১৮০১ সালে ইংল্যাণ্ডে ম্যাথিয়াস কোপস (Mathias Koops) ব্যবসায়িক ভিত্তিতে খড় এবং ঐ জাতীয় উপাদান থেকে কাগজ উৎপাদন সুরু করেন।

দক্ষ কারিগরের অভাব, প্রস্তুত কাগজের মান নির্দিষ্ট রাখা, ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো, ভাল কাঁচামালের অভাব ইত্যাদিই হাতে তৈরী কাগজের বদলে যন্ত্রে তৈরী কাগজের দিকে আমাদের নিয়ে যায়। ১৭৯৭ খৃঃ কাগজ তৈরীর কারিগর নিকোলাস লুইস রবার্ট (Nicholas Louis Robert) প্রথম ধারাবাহিকভাবে কাগজ তৈরীর জন্য একটি যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। পরে বৃটিশ প্রযুক্তিবিদ জন গ্যামবুল (John Gamble) এবং ব্রায়ান ডনকিন (Bryan Donkin) এই যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন। ১৮১২ খৃঃ হেনরী এবং সেলী ফোরড্রিনিয়ার (Henry and Sealy Fourdrinier) ভ্রাতৃদ্বয় ইংল্যাণ্ডে এবং প্রায় একই সময় ফ্রান্সে নিকোলাস লুইস রবার্ট যান্ত্রিক উপায়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাগজ তৈরী সুরু করায় এঁদের এই ব্যাপারে পুরোধা হিসাবে গণ্য করা চলে। ১৮০৯ খৃঃ জন ডিকিন্সন (John Dickinson) উন্নততর সিলিণ্ডার যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। হাতে তৈরী কাগজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত জালের পাত্র বা ডেকেলের পরিবর্তে যন্ত্রের ক্ষেত্রে চলমান সূক্ষ্ম জালের ব্যবহার করা হয়। এই জাল প্রয়োজন অনুসারে ৩০ থেকে ৩২০ ইঞ্চি (৭৫ থেকে ৮০০

সেমি) পর্যন্ত হয় এবং এর গতি কাগজের প্রকারভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে (১০০ থেকে ১০০০ ফুট অর্থাৎ ৬০ থেকে ৬০০ মিটার প্রতি মিনিটে)। জালের শেষদিকে যেখানে কাগজ অপেক্ষাকৃত শুকনো হয়ে এসেছে, সেখানে ফাঁপা জালের রোলার ব্যবহার করে কাগজের মধ্যেকার অতিরিক্ত জলীয় অংশ বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এরপর আরো কয়েকটি রোলারের (যেগুলি ড্রায়িং (drying) এবং ক্যালেণ্ডারিং (calendering) রোলার নামে পরিচিত) মধ্য দিয়ে পার হয়ে তৈরী কাগজ বার হয়ে আসে। প্রাথমিক পর্যায়ের যন্ত্রে তৈরী কাগজ খুব উঁচুমানের ছিল, কারণ তখন কাঁচামাল হিসাবে মূলতঃ তুলো, ন্যাকড়া ইত্যাদির ব্যবহার হ'ত।

যদিও শ্যেফার কাগজ তৈরীর জন্য অল্প পরিমানে নরম কাঠের ব্যবহার করেছিলেন এবং ব্যাপকভাবে কাঠের ব্যবহারের কথা বলেছিলেন, তবুও এই ব্যাপারে ১৮৪০ খৃঃ এর আগে তেমন কোন অনুসন্ধান অথবা চেষ্টা হয়নি। ঐ সময় ফ্রেডারিক কেলার (Frederick Keller) কাঠের গুড়ো থেকে কাগজ (Mechanical wood) তৈরীর ব্যাপারে সাফল্য লাভ করেন। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই ধবণের কাগজের উৎপাদন, যাতে কিছুটা লম্বা আঁশযুক্ত মণ্ডও মেশানো হ'ত, ১৮৪৯ খৃঃ ইউরোপে এবং ১৮৬০ খৃঃ আমেরিকায় সুরু হয়। এভাবে তৈরী কাগজে কাঠের নানা ধরণের আঠা, লিগনিন এবং অন্যান্য পদার্থের উপস্থিতি এর স্থায়িত্বকে ব্যাহত করে। প্রায় একই সময় আরেকটি পদ্ধতি চালু হয়, যেটিতে কাগজ তৈরীর মণ্ডকে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐসব ক্ষতিকারক পদার্থ থেকে মুক্ত করে অপেক্ষাকৃত টেকসই কাগজ তৈরী করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতি কাঠের রাসায়নিক (Chemical wood) পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিটি দুই ধরণের—একটি সালফাইট (Sulphite), অন্যটি সালফেট (Sulphate) পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই দুটি পদ্ধতি যথাক্রমে ১৮৫৭ এবং ১৮৮৮ খৃঃ উদ্ভাবিত হয়।

সালফাইট পদ্ধতি—সাধারণত ফার জাতীয় কাঠের মণ্ডকে রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে তৈরী করার জন্য ক্ষারধর্মী বাইসালফাইট এবং অল্প পরিমানে সালফিউরাস অ্যাসিড সহযোগে গরম করা হয় যাতে সেলুলোজের আঁশের কোন ক্ষতি না করেই লিগনিন এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে মণ্ড থেকে অপসারিত হতে পারে। এই মন্ড অপেক্ষাকৃত হাল্কা রং-এর এবং এটি

সহজেই বিরঞ্জন (bleach) করা সম্ভব। এই পদ্ধতির ব্যবহার ক্রমশ কমে আসছে।

সালফেট পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে সব ধরণের কাঠের মণ্ডের সঙ্গে শক্তিশালী ক্ষারধর্মী সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (Sodium Hydroxide) এবং সোডিয়াম সালফেট (Sodium Sulphate) ব্যবহার করা হয়। এইভাবে তৈরী মণ্ড অপেক্ষাকৃত গাঢ় রংএর এবং এটি বিরঞ্জন করাও অপেক্ষাকৃত শ্রমসাধ্য। এই পদ্ধতি এখন বহুল ব্যবহৃত।

শিল্পবিপ্লব অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, কাগজের চাহিদার ক্ষেত্রেও তেমনি জোয়ার নিয়ে আসে। ফলে সস্তায় এবং আরও অনেক বেশী পরিমাণ কাগজ তৈরী করার দরকার দেখা দেয়। ১৭৭৪ খৃঃ ক্লোরিনের আবিষ্কারের পর থেকে এর ব্যবহার সুরু হয়, কাগজকে আরো ধবধবে সাদা করার জন্য। কিন্তু অতিরিক্ত ক্লোরিন মণ্ড থেকে ধুয়ে বার করে না দেবার ফলে তৈরী কাগজে যে সামান্য ক্লোরিন থেকে যায়, বাতাসের আদ্রর্তার সংস্পর্শে এসে পরবর্তীকালে সেটা থেকে অম্লতা সৃষ্টি হয়।

নতুন দ্রুততর প্রযুক্তিতে যন্ত্রের ব্যবহারে কাগজের আঁশের দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে যাওয়ায়, ক্লোরিন ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের ফলে, এভাবে তৈরী কাগজ কম টেকসই হয়ে পড়ে। উপাদান হিসাবে কাঠের ব্যবহারও কাগজকে দুর্বল করে দেয়।

কাগজে কালি যাতে শুষে না যায় সেজন্য আগে জিলেটিন অথবা ঐ জাতীয় পদার্থের ব্যবহার চালু ছিল। এর পরিবর্তে ফটকিরি জাতীয় রাসায়নিকের (যার মধ্যে অল্প পরিমাণে সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়) ব্যবহার সুরু হওয়াতে কাগজ সংরক্ষণের আরেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সংরক্ষণে সমস্যা যতই থাকুক এই শতকে কিন্তু সস্তা কাগজের চাহিদা এবং তার সরবরাহ অনেকগুণ বেড়ে গেছে।

১৮০৭ সালে কুকওয়ার্দি (Cookworthy) কাগজের মণ্ডে চীনামাটি অথবা ঐ জাতীয় পদার্থ মিশিয়ে কাগজের স্বচ্ছতা হ্রাস এবং ভারী করার চেষ্টা করেন। এই পদ্ধতি লোডিং (loading) নামে পরিচিত।

কাগজ হাতে না মেসিনে তৈরী, সেটার ওপর কাগজের স্থায়িত্ব ততটা নির্ভর করে না। কাঁচামাল অর্থাৎ উপাদান এবং তৈরীর সময় যেসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর পরিমাণ এবং তার বিশুদ্ধতার উপরই নির্ভর করে

যন্ত্রে কাগজ তৈরীর বিভিন্ন স্তরজ্ঞাপক নক্সা
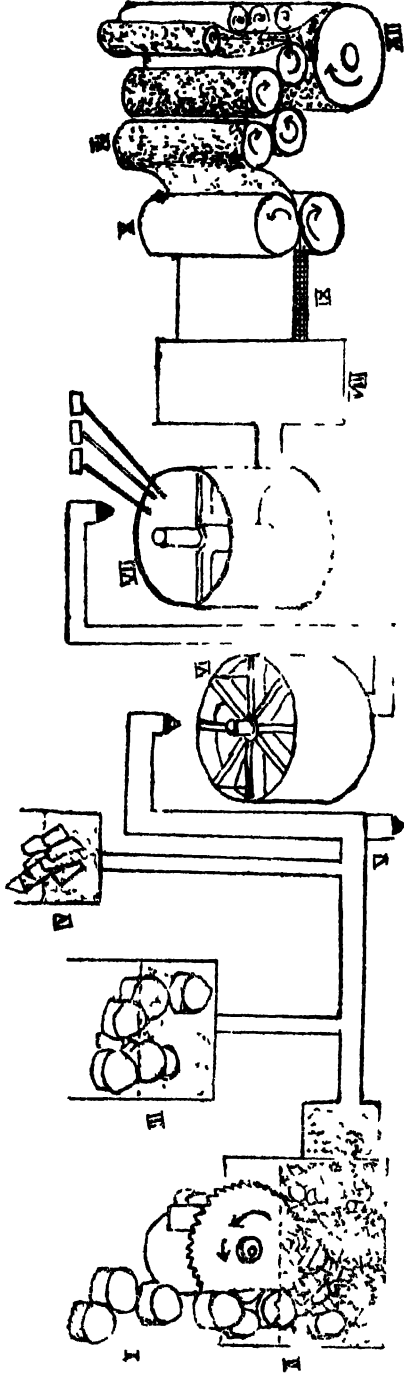
i. কাঠের টুকরো। ii. কাঠ গুঁড়ো করবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা। (কক্ষে জল থাকে)। iii. কাঠের মণ্ড তৈরীর রাসায়নিক ব্যবস্থা। (কক্ষে রাসায়নিক পদার্থ থাকে)। iv. ছেঁড়া কাগজ, ন্যাকড়া ইত্যাদি (কক্ষে জল থাকে)। v. ত্যাজ্য বস্তু নিষ্কাশন পথ। vi. মণ্ড প্রস্তুতের ব্যবস্থা। vii. চীনামাটি ও অন্যান্য রাসায়নিক এবং প্রয়োজনে রং মণ্ডের সাথে মেশানো হয় এই মিশ্রণ যন্ত্রে (* লোডিং সাইজিং রঞ্জন এই তিনটি কাজ এখানে করা হয়)। viii. তৈরী মিশ্রণ জমা রাখার ব্যবস্থা। ix. বায়ুশূন্য আধারের জালের উপর দিয়ে মণ্ড চালিত হয়। x. জল নিষ্কাশন রোলার। xi. শুকোবার কাজে ব্যবহৃত রোলার। xii. গোটানো অবস্থায় তৈরী কাগজ।

কাগজের স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যতে সেটার সংরক্ষণের সমস্যা এবং সমাধান। আগেকারদিনের হাতে তৈরী কাগজ অপেক্ষাকৃত মজবুত ছিল মূলতঃ এতে ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট উপাদান এবং তৈরীর কয়েকটি পদ্ধতির (যেমন এতে আঁশগুলো সবদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকত) জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে উৎকৃষ্ট উপাদানের অভাবে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট উপাদানের (ব্যবহৃত পুরানো কাপড়, কাঠ, অন্য ছোট আঁশযুক্ত জিনিষ) ব্যবহার সুরু হয় এবং প্রস্তুত পদ্ধতিতেও কিছু রদবদলের (মণ্ড তৈরীর সময় অপেক্ষাকৃত বেশী সময় ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটানো) ফলে কাগজ অপেক্ষাকৃত কম মজবুত হয়ে পড়ে। আজকাল কাগজ তৈরীতে কাঠের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। যান্ত্রিক বা রাসায়নিক যেভাবেই কাগজের মণ্ড তৈরী করা হোক না কেন, তার মধ্যে লিগনিন এবং অন্যান্য কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ থেকে যায়, যেটা জলে ধুয়ে বার করে দেওয়া দরকার। কিন্তু কাঠের বিভিন্ন আঁশের মধ্যে বন্ধনকারী লিগনিন সম্পূর্ণ ধুয়ে ফেলা খুবই শক্ত। কাগজের মধ্যে সামান্য পরিমাণেও লিগনিন এবং অন্য ক্ষতিকারক উপাদান, যেমন রজন (resin ইত্যাদি থাকলে পরিবেশের তাপ এবং বাতাসে উপস্থিত নানারকমের রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে বাদামী রংএর দাগ সৃষ্টি করে। যান্ত্রিক উপায়ে কাঠের গুঁড়ো থেকে তৈরী কাগজে (Mechanical wood paper) লিগনিন পুরোটাই প্রায় থেকে যায়, ফলে এর স্থায়িত্ব খুবই সীমিত—যেমন খবরের কাগজের জন্য ব্যবহৃত কাগজ (newsprint)। রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরী কাগজের (Chemical wood paper লিগনিন এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থ প্রায় সবটাই শোধন করার ফলে তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত টেকসই কাগজ তৈরী করা সম্ভব।

আধুনিক যুগে কম টেকসই কাগজ তৈরীর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, অল্প সময়ের মধ্যে বেশী পরিমাণ কাগজের চাহিদা মেটানোর তাগিদ। এখানে উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে মাত্র ১৯৬৩ সালে সম্পূর্ণ অম্লতামুক্ত স্থায়ী কাগজ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরী করার প্রযুক্তির উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। এখন মোটামুটিভাবে কাগজের স্থায়ীত্বের অভাবের কারণগুলিও সব নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। কাগজের দাম এবং এর উৎপাদন অব্যাহত রেখে কাগজের ত্রুটিগুলো অপসারণের আরো সক্রিয় চেষ্টা করা দরকার।

এবার দেখা যাক, কি কি কারণে কাগজ সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ দুর্বল হয়ে

এর ক্রমাবনতি সুরু হয়। যখন থেকে কাগজ উৎপাদনে কাঠের ব্যবহার শুরু হয়েছে তার আগে পর্যন্ত যেহেতু লম্বা আঁশযুক্ত উপাদান কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত তখন কাগজ ছিল অনেক বেশী টেকসই এবং স্থায়ী। ১৯৩০/১৯৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত বিশ্বাস করা হত সব 'র‍্যাগ' কাগজই (লম্বা আঁশযুক্ত উপাদান থেকে তৈরী) বেশী টেকসই হয় কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেটা প্রমাণিত হয়নি।

উইলিয়াম জেমস ব্যারো (William James Barrow) ১৯৫৯ সালে তাঁর দীর্ঘ গবেষণার ফল প্রকাশ করেন, যার মধ্যে তিনি নির্দিষ্টভাবে কাগজের ক্রমাবনতির কারণ এবং সেগুলোর সম্পূর্ণ প্রতিকারের উপায় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে কাগজের ক্রমাবনতির প্রধানতম কারণ অম্লতা। কাগজ প্রস্তুত প্রণালীতে ব্যবহৃত ক্লোরিন, অপরিশোধিত কাঠের মণ্ড, রজন এবং ফটকিরি ইত্যাদিও ক্রমাবনতির সহায়ক। ভাল পরিশোধন ব্যবস্থার মাধ্যমে কাঠের মণ্ড থেকেও ব্যবসায়িকভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে উৎকৃষ্ট কাগজ উৎপাদন সম্ভব বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। রজন অপসারণের জন্য ফটকিরির (Aluminium Sulphate অথবা Potassium-aluminium Sulphate) বদলে সস্তা ক্ষার-- যেমন ম্যাগনেসিয়াম বাইসালফেট (Magnesium Bisulphate), ক্যালসিয়াম বাইসালফেট (Calcium Bisulphate), সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (Sodium Hydroxide), সোডিয়াম কার্বোনেট (Sodium Carbonate), সোডিয়াম সালফেট (Sodium Sulphate) ব্যবহারের মাধ্যমেই ক্ষারজাতীয় স্থায়ী কাগজ প্রস্তুত করা সম্ভব। ১৯৫৯ সালে আমেরিকাতে প্রথম এই ধরণের কাগজ বাজারে ছাড়া হয়। ১৯৬০ সাল থেকে ক্রমশ অম্লতার সম্ভাবনা মুক্ত ছাপার কাগজ বাজারে আত্মপ্রকাশ করতে সুরু করে। ১৯৮০ সাল নাগাদ আমেরিকার বাজারের শতকরা ২৫ ভাগ ছাপার কাগজই ছিল এধরণের অম্লতার সম্ভাবনামুক্ত।

কাগজের ক্রমাবনতি প্রাথমিক ভাবে নির্ভর করে ব্যবহৃত কাঁচামাল, যে পদ্ধতির মাধ্যমে এবং যেসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে এই কাগজ তৈরী হয়েছে, তার উপর। এছাড়া আর যে সব বিষয়ের কথা এসে পড়ে, সেগুলো হচ্ছে—যে অবস্থায় সেটি আছে, সেখানে এর উপর আবহাওয়া, কীটপতঙ্গ, ছত্রাক ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা কতটা আছে। এছাড়াও সব জিনিষের উপরই যেহেতু কালের নিজস্ব প্রভাব থাকবেই সেহেতু কাগজের বয়সটাও এই ব্যাপারে একটি লক্ষণীয় বিষয়।

কাগজ সম্বন্ধে ডবল্যু জে ব্যারোর গবেষণালব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত কাগজের স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ন্যূনতম মান নির্ধারণ করা হয়েছে। লেখার বা বই ছাপানোর জন্য কাগজ যদি এইসব মান সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নির্বাচন করা হয়, তবে সংরক্ষণের অনেক সমস্যার সৃষ্টি হবে না। মোট ছাপা বইয়ের খুব ছোট ভগ্নাংশই গ্রন্থাগারে এসে পেঁছোয়—সেকারণে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রকাশিত বইয়ের প্রকাশকরা কাগজ নির্বাচন সম্বন্ধে ততটা সচেতনতা অবলম্বন করেন না। আর আমাদের মত দেশের ক্ষেত্রে এই ধরণের কাগজ নির্বাচনের প্রশ্ন প্রায় উঠেই না কারণ বাজারে কাগজের অভাবের জন্য কোন রকমে যে কোন মানের কাগজ জোগাড় করতে পারাটাই বড় কথা।

ডবল্যু জে ব্যারো বই ছাপার জন্য প্রলেপহীন (non-coated) রাসায়নিক পদ্ধতিতে কাঠের ব্যবহারে তৈরী কাগজের জন্য যে ন্যূনতম মানের কথা বলেছেন সেটা কতটা এরকম—

২৫″ × ৩৮″ (৬২·৫ × ৯৫ সেমি) আয়তনের কাগজ যার প্রতি রিমের (ream) ওজন ৬০ পাউণ্ড অথবা ২৬·২৩ কেজি।

(১) কাগজে অপরিশোধিত কাঠের গুঁড়ো বা অশোধিত (unbleached) আঁশ থাকা চলবে না।

(২) কমপক্ষে ১৫টি পরীক্ষার জন্য লম্বাটে টুকরার (strips) উপর নির্ভর করে (এই কাগজের টুকরাগুলো একই রিমের ১৫টি আলাদা কাগজ থেকে নিতে হবে যেগুলো এলোমেলোভাবে (randomly selected) রিম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। দেখতে হবে যে ½ কেজি টানের (tension) মধ্যে গড়ে অন্তত ৩০০টি ভাঁজ (কাগজের দুর্বলতর দিকে) সহ্য করার ক্ষমতা কাগজের থাকে।

(৩) কমপক্ষে ১২টি পরীক্ষার জন্য লম্বাটে টুকরার উপর নির্ভর করে (উপরে ২ নম্বরের মত নির্বাচিত) দেখতে হবে যে কাগজের দুর্বলতর দিকে চারটি কাগজ একত্রে পাঁচবার ছিড়তে গড়ে ৬০ গ্রাম বা তার চেয়ে বেশী চাপের প্রয়োজন (এলমেনড্রফ (Elmendrof) যন্ত্রের মাধ্যমে এই পরীক্ষাটি করতে হবে)।

(৪) কৃত্রিম উপায়ে কাগজের বয়স বাড়াবার জন্য গড়ে ১০০° সেঃ (±২° সেঃ) এ রাখার পরে কাগজের টুকরোগুলো (উপরের ২ নম্বরের মত

নির্বাচিত) যেন নীচের সারণীতে দেখানো ভাঁজ এবং ছেঁড়ার ন্যূনতম মানের চেয়ে নিকৃষ্ট না হয়।

মোট কতদিন বিশেষ পরিবেশে রাখা হয়েছে	মোট ভাঁজ সহ্য করার ক্ষমতা	ছেঁড়ার জন্য প্রয়োজনীয় চাপের পরিমাণ
১২	২০০	৫৩ গ্রাম
২৪	১৪০	৪৮ গ্রাম
৩৬	১০০	৪৩ গ্রাম

(৫) নতুন অবস্থায় কাগজের pH ৬'৫ এর নীচে হওয়া উচিত নয়। বয়স বাড়াবার জন্য তাপে রাখার ৩ দিন পরে pH মাত্রা যেন হঠাৎ নেমে না যায়।

(৬) কাগজের অস্বচ্ছতা (opacity) যেন কোন অবস্থায় ৯০ নীচে না হয়।

(৭) উপরের সব পরীক্ষাগুলিই টেক্‌নিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব দি পাল্‌প এন্ড পেপার ইন্ডাষ্ট্রি (**Technical Association of the Pulp and Paper Industry**) দ্বারা নির্দ্ধারিত মানে এবং পদ্ধতিতে করা হয়।"*

কাগজ তৈরীর উপাদানে বিশুদ্ধ সেলুলোজের পরিমাণ যত বেশী থাকে কাগজ ততই বেশী ভাল মানের হবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এটাকে অ্যালফা সেলুলোজ কনটেন্ট (**alpha-cellulcse centent**) বলা হয়।

১৮৯৮ খৃঃ লন্ডনের রয়েল সোসাইটি অব আর্টস (**Royal Society of Arts**) একটি মান নির্দেশ করেন, ন্যূনতম যেগুলো থাকলে কোন কাগজ ভালমানের হিসাবে গণ্য হতে পারে। সেটা হচ্ছে—বিশুদ্ধ সেলুলোজ আঁশের পরিমাণ ন্যূনতম ৭০%, সাইজিং এর জন্য ব্যবহৃত সাধারণ অম্লতাযুক্ত ফটকিরির সঙ্গে ১'৫% বা তারচেয়ে কম রজনের ব্যবহার, লোডিং-এর ১০% অথবা তার কম খনিজ পদার্থ ব্যবহার, তৈরী কাগজের অম্লতা pH সূচীতে ৬ অথবা তার উপরে।

আধুনিক কালে যে কাগজে বিশুদ্ধ সেলুলোজের (**Alpha Cellulose**)

* **Barrow, William James. Tentative specifications for durable non-coated chemical wood book paper. 1960.**

পরিমাণ ৯৫%, তামার উপস্থিতি ১'০ অথবা তার কাছাকাছি, অম্লতা pH সূচীতে ৬-এর উপরে, তাকেই ভাল অথবা স্থায়ী কাগজ হিসাবে গণ্য করা হয়।

সাধারণভাবে মণ্ড পরিশোধনের সময় ব্যবহৃত ক্লোরিনের সেলুলোজের উপর তেমন কোন প্রতিক্রিয়া নেই। মণ্ডকে যথেষ্ট পরিশোধন না করলে তার মধ্যে লিগনিন এবং অন্যান্য পদার্থ সেলুলোজের সাথে থেকে যায়—ঐ অবস্থার অশুদ্ধ সেলুলোজকে বিটা এবং গামা সেলুলোজ বলে। কাগজে বিটা এবং গামা সেলুলোজের উপস্থিতি কাগজের অবস্থার দ্রুত অবনতির কারণ হয়ে ওঠে—যেমন খবরের কাগজ ছাপার জন্য ব্যবহৃত কাগজ (**newsprint paper**)। কাগজের মণ্ডে সেলুলোজের আঁশগুলো যত লম্বা হবে কাগজ ততই টেকসই হয়। এই আঁশগুলো যদি সবদিকে সমানভাবে ছড়ানো থাকে (যেটা আমরা হাতে তৈরী কাগজের ক্ষেত্রে দেখতে পাই) তবে সেটা যত শক্ত হয়—একদিকে সাজানো বা ছড়ানো আঁশযুক্ত কাগজ (যেটা মেসিনে তৈরী কাগজের ক্ষেত্রে দেখা যায়) ততটা হয় না। কাগজের উপরে নানা ধরণের রাসায়নিক জিনিষ মাখানো হয়। এটাকে দুভাগে ভাগ করা হয়—একটা সাইজিং (**sizing**), অন্যটা লোডিং (**loading**)। কাগজের তল (**surface**) লেখার বা ছাপার উপযুক্ত (এমনভাবে তৈরী করা যাতে কালি ছড়িয়ে না পড়ে) করে তোলার জন্য কাগজের মধ্যে মাড় (**starch**), প্রাণীজ আঠা, রজন (এটা টারপেনটাইন মুখ্যতঃ অ্যাবেটিক অ্যাসিড পাতন করে (**distillation**) তৈরী হয়), ফটকিরি, জিলেটিন, ফরম্যালডিহাইড এবং অন্যান্য কৃত্রিম আঠা মাখানো হয় সাইজিং করার জন্য। হাতে তৈরী কাগজের ক্ষেত্রে এইসব রাসায়নিকের মিশ্রণে কাগজ ডুবিয়ে তুলে নেওয়া হয়। মেসিনে তৈরী কাগজের ক্ষেত্রে ফিনিশিং রোলারে পৌছানোর আগে এই রাসায়নিক মিশ্রণের মধ্য দিয়ে কাগজ যায়।

কাগজকে ছাপার কাজের পক্ষে উপযুক্ত করে তোলার জন্য কাগজের উপর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট (**Calcium Carbonate**), চীনামাটি, খড়ি, টিটানিয়াম যোগের মিশ্রণের প্রলেপ লাগানোকে ক্যালেণ্ডারিং (**calendering**) বলে।

হাফটোন অথবা নানা রংএর ছবি বা সূক্ষ্ম ছাপার কাজের পক্ষে কাগজের উপরে অতিরিক্ত চীনামাটি অথবা ঐ ধরণের পদার্থের প্রলেপ লাগানো (**coating**) অপরিহার্য। এটি ক্যালেণ্ডারিং হিসাবে পরিচিত।

এতক্ষণ পর্যন্ত কাগজের প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল।

এবার কাগজের ক্রমাবনতির ক্ষেত্রে আবহাওয়ার প্রভাবের ব্যাপারটার দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। আবহাওয়া কথাটা খুবই ব্যাপক। এর মধ্যে বাতাসের আর্দ্রতা / শুষ্কতা, অত্যাধিক তাপ, রোদের প্রভাব, নানা ধরণের দূষণ যথা অম্ল গ্যাসের উপস্থিতি, ধুলোবালি, ধোঁয়া ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত।

আর্দ্রতা—বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশী হ'লে কাগজ সেটা শুষে নিয়ে ফুলে উঠতে পারে। কাগজের মধ্যকার রাসায়নিক পদার্থ ঐ জলের সংস্পর্শে অম্লতার সৃষ্টি করে, কাগজের ওপর ছত্রাকের বিস্তারের উপযোগী সেঁতসেঁতে পরিবেশ গড়ে ওঠে,—খয়েরী বা কালচে ছোপ ধরে (এই দাগ ছত্রাকের উপস্থিতির পরিচায়ক)। আর্ট কাগজ, ক্যালেণ্ডার কাগজ ইত্যাদি বাতাসের অতিরিক্ত আর্দ্রতা শুষে নেওয়ার ফলে এর উপরকার প্রলেপ নরম হয়ে পাশের পৃষ্ঠার সাথে জুড়ে যায়।

আর্দ্রতার পরিমাণ খুব কম হলে কাগজ তার নিজস্ব আর্দ্রতা হারিয়ে ক্রমশ ভঙ্গুর হয়ে যায়।

অত্যাধিক তাপ এবং রৌদ্র—কাগজ অথবা বই সরাসরি রৌদ্রে রাখা উচিৎ নয় কারণ এর তাপে কাগজ অল্পদিনের মধ্যে হলদে হয়ে যায় এবং তার স্বাভাবিক নমনীয়তা হারিয়ে ক্রমশ ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। রৌদ্র সেলুলোজেরও ক্ষতি করে—এই ধরণের ক্ষতি অত্যাধিক তাপে অথবা কৃত্রিম আলোতেও হয়ে থাকে।

যেসব অঞ্চলে গ্রীষ্ম এবং শীত উভয়েরই প্রকোপ বেশী সেখানে কাগজের স্বাস্থ্যহানি ঘটে সহজেই—কাগজ ক্রমশ ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

বায়ুবাহিত নানা গ্যাস এবং দূষণ জনিত পদার্থ—১৮৯৮ খৃঃ রয়েল সোসাইটি ফর আর্টসের (Royal Society for Arts) এক বিশেষ কমিটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে বাতাসে উপস্থিত নানাধরণের গ্যাস সবরকমের কাগজের ক্রমাবনতির মুখ্য কারণ। গ্রন্থাগারের মধ্যে উপস্থিত এই ধরণের ক্ষতিকারক গ্যাস কাগজ এবং বইয়ের অন্যান্য উপাদানের ক্ষতি করতে পারে।

শহরের বাতাসে প্রচুর পরিমাণে যে সালফার-ডাই অক্সাইড থাকে সেটা বাতাসের আর্দ্রতা এবং অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং অনুরূপভাবে নাইট্রোজেন অক্সাইড নাইট্রিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়, যেগুলো কাগজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। কারণ এগুলোর সঙ্গে বিক্রিয়ায় কাগজের সেলুলোজ নষ্ট হয়ে যায়—কাগজ ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। এভাবে

আবহাওয়ার মধ্যে উপস্থিত অন্য নানাবিধ গ্যাসও কাগজে অম্লতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

অনুকুল অবস্থায় কাগজ বাতাসের অক্সিজেন টেনে নিয়ে সেলুলোজের সঙ্গে যোগ সৃষ্টি করে—এর সঙ্গে অম্লতার প্রতিক্রিয়ায় সেলুলোজের আঁশ ভেঙ্গে ছোট হয়ে যায়, ফলে কাগজ নমনীয়তা হারিয়ে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। আধুনিক কালের মেকানিক্যাল উড এবং কেমিক্যাল উড কাগজের ক্ষেত্রে এই ধরণের বিক্রিয়া বেশী ঘটে থাকে।

দুষিত বাতাসের সবচেয়ে ক্ষতিকারী ফল অম্লতা। তৈরীর সময় যে অম্লতার বীজ কাগজে অনুপ্রবিষ্ট থাকতে পারে, পরিবেশ থেকে তার তুলনায় অনেকবেশী অম্লতা আহরণ করতে পারে। এটি সহজতর হয় যখন তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা উপরের দিকে থাকে। যে কাগজ অম্লতায় আক্রান্ত হয়েছে সেটির ব্যাপারে কি কি করা দরকার এবং কিভাবে সেটা করা যায়, সে বিষয়ে বিশদভাবে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

ধুলোবালি, ময়লা—নানা ধরণের কঠিন পদার্থের কনা বাতাসের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—সাধারণভাবে একেই আমরা ধুলোবালি বলি। সরাসরিভাবে কাগজের খুব সামান্য ক্ষতি এরা করতে পারে। কিন্তু এদের উপস্থিতি অন্য কয়েক ধরণের ক্রমাবনতি ত্বরান্বিত করে, যেমন ছত্রাকের আক্রমণ, অম্লতা বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ রচনার মাধ্যমে। গ্রন্থাগারে ধুলোবালির উপস্থিতির ফলে কীটপতঙ্গের উপদ্রবের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কাগজে নোংরা ছোপ ধরে। এর মধ্যে উপস্থিত ছোট ছোট সিলিকা কণায় ঘর্ষণে কাগজের মসৃনতা নষ্ট হতে পারে।

ব্যাকটেরিয়া / ভাইরাস ইত্যাদি—বাতাসবাহিত কয়েক ধরণের ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া কাগজের মধ্যেকার লৌহজ যৌগকে আক্রমণ করে, যার ফলে কাগজের উপর একধরণের বাদামী ছোপ ধরে, যাকে ফক্সিং (foxing) বলা হয়। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে কাগজের ঐসব অংশে অম্লতা বেড়ে গেছে।

ছত্রাক—বাতাসে সব সময় ছত্রাকের বীজ (spores) ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনুকুল অবস্থায় সেগুলি অংকুরিত হয়ে কাগজকে আক্রমণ করে। ছত্রাক কাগজের সেলুলোজের ক্ষতি করে নিজেদের বৃদ্ধির উপাদান সংগ্রহ করে। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার পরিবেশ এদের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আলোর অভাব

অথবা স্বল্পতা, সেঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এদের আক্রমণ প্রবলতর হয়। এইরূপ আক্রমণের ফলে কাগজ দূর্বল হয়ে পড়ে এবং তার ওপর ছাই অথবা কালচে রং-এর ছোপ ধরে।

বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি আমাদের চারিদিকের পরিবেশে ছড়ানো আছে প্রচুর পরিমান অম্লতা সৃষ্টির উপকরণ যা গ্রন্থাগার সংগ্রহের বিশেষতঃ বই, কাগজের ক্রমাবনতি তথা ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। কাগজ সবসময়ই বাতাস থেকে কিছুটা আর্দ্রতা শুষে নেয়। এ ছাড়াও লেখার অথবা ছাপার কালি থেকে অম্লতা কাগজে সংক্রামিত হতে পারে। অপরিষ্কার হাতে ব্যবহার করলেও কাগজে অম্লতার অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। বইয়ের ক্ষেত্রে বাঁধাইয়ে ব্যবহৃত ভালভাবে তৈরী না করা চামড়া এবং অন্যান্য বাঁধাইয়ের সামগ্রীও অম্লতার উৎস হয়ে পড়ে।

কাগজের ক্রমাবনতি রোধে অম্লতা নিবারণ একটি প্রধান অস্ত্র।

কাগজের ক্রমাবনতি প্রতিরোধে গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাদি

সবচেয়ে প্রথম এবং সবচেয়ে জরুরী যে ব্যবস্থা নিতে হবে তা হচ্ছে গ্রন্থাগারের ভিতরের আবহাওয়ার সুনিয়ন্ত্রন।

বাতাসে উপস্থিত অম্লতা উৎপাদক পদার্থ এবং গ্যাস বাতাস ধৌতিকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে দূর করা দরকার। শীতাতপনিয়ন্ত্রনের আধুনিক এবং উন্নত পদ্ধতির মাধ্যমে তাপ এবং আর্দ্রতার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে ধৌতিকরণ প্রক্রিয়াও সহজে এবং উপযুক্তভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। সাধারণ শীতাতপ-নিয়ন্ত্রন যন্ত্রে ধৌতিকরণের ব্যবস্থা থাকেনা। সেজন্য যে বিশেষ ব্যবস্থার দরকার সেটা হচ্ছে আর্দ্রতা ও তাপ নিয়ন্ত্রিত বাতাসকে প্রথমে তারের জালের ভিতর দিয়ে (যেখানে বাতাসের মধ্যেকার ধুলো, বালি এবং অন্যান্য ভাসমান ক্ষুদ্র পদার্থ আটকে যাবে) এবং তারপরে ক্ষারধর্মী জলের মধ্য দিয়ে চালিত করতে হয়। বাতাসের অম্লতা ঐ ধরণের জলের ক্ষারত্ব ক্রমশ কমিয়ে দেয়, ফলে প্রয়োজন অনুসারে, ঐ জল পাল্টে দিতে হয়। বিকল্প হিসাবে কিছুক্ষণ পর পর ঐ জলে ক্ষার জাতীয় পদার্থ মেশাতে হয়, যাতে জলের pH মাত্রা ৮ থেকে ৯এর মধ্যেই থাকে। গ্রন্থাগারের ভিতরের তাপমাত্রা ২২°—২৫° সেণ্টিগ্রেড এবং আনুপাতিক আর্দ্রতা ৪৫% রাখতে চেষ্টা করতে হবে, কারণ এই আবহাওয়ায় বাতাসের অম্লতাকারক উপকরণের ক্ষমতা সীমিত থাকে।

যদি সম্ভব হয় তবে সংগ্রহের কাগজের একটি নির্দিষ্ট মান নির্দেশ করে করে দিতে হবে, যার চেয়ে নীচুমানের কাগজ গ্রন্থাগারে না রাখার চেষ্টা করতে হবে।

বিঅম্লীকরণ : ক্রমাবনতির ব্যাপারে সংশোধনী ব্যবস্থা

আমরা জানি যে তৈরীর সময়ের ত্রুটির ফলে অথবা রক্ষণাবেক্ষণের নানা ত্রুটির জন্য কাগজে অম্লতার সৃষ্টি হতে পারে (অর্থাৎ pH সূচিতে ৬এর নীচে নেমে যায়) যার ফলে কাগজের দ্রুত ক্রমাবনতি ঘটে। এ ব্যাপারে অল্প ক্ষারধর্মী তরল মিশ্রণ (pH সূচিতে ৯.২) সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট সহায়ক হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই কাগজের অতিরিক্ত অম্লতাকে নষ্ট করাই সংক্ষণেব প্রধান কাজ। কাগজে অতিরিক্ত অম্লতা নষ্ট করার ব্যাপারে ক্যাল-সিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট (Calcium Hydroxide and Calcium Bi carbonate) অত্যন্ত উপযোগী। এই দুই রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করার ফলে কাগজের মধ্যে যে অল্পপরিমান ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে যায়, সেটা ভবিষ্যতের অম্লতার আক্রমণকে খানিকটা ঠেকিয়ে রাখে এবং বিলম্বিত করে। এটি নানাধরণের পরীক্ষার মাধ্যমে (যেমন কৃত্রিম বয়সজনিত ক্রমাবনতির পরীক্ষা) প্রমাণ করা সম্ভব। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কয়েকটি অসুবিধা আছে—কারণ এটি প্রয়োগের সময় কাগজকে ঐ রাসায়নিকেব তরল মিশ্রণে দীর্ঘসময় ডুবিয়ে রাখতে হয় ফলে কাগজের ক্ষতি হতে পারে (বিবর্ণতা দেখা দিতে বা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে)। এই পদ্ধতি যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষও বটে। শুধুমাত্র ক্যালসিয়াম বাইক্রোমেট ব্যবহার করাও সম্ভব নয় কারণ এটি জলে ভাল দ্রবণীয় নয়।

বিঅম্লীকরণে (deacidification) ব্যবহারের উপযোগী ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেটের জলীয় মিশ্রণ প্রস্তুত প্রণালীটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড মিশ্রণ—প্রথমে ভালমানের আধ কিলোগ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে খুব ভালভাবে গুঁড়ো করে নিতে হবে। এবার কাচের অথবা এনামেলের বড় পাত্রে (৭—৮ লিটার পরিমাপের) ঐ গুঁড়ো নিয়ে তার সঙ্গে অল্প অল্প করে জল মিশিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে হবে, যাতে জলে মিশে সাদা লেই তৈরী হয়। এই বিক্রিয়ার সময় যথেষ্ট তাপ সৃষ্টি হয়—

সেজন্য কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সব গুঁড়োটা ভালভাবে মিশে যায়। এইভাবে লেইয়ের মত মিশ্রণ তৈরী করতে প্রায় ৩ লিটার জল দরকার হয়। এরপর এই মিশ্রণকে আরো বড় পাত্রে (৩০ লিটার পরিমাপের) সরিয়ে নিয়ে তার মধ্যে আস্তে আস্তে জল ঢালতে হবে এবং ক্রমাগত নাড়তে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত মিশ্রণটির পরিমাণ ২৫ লিটারে না পেঁছোয়। এবার মিশ্রণটি রেখে দেওয়া হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না নীচে তলানি পড়ে উপরে পরিষ্কার জল দেখা যাবে। তারপর খুব সাবধানে উপরের ঐ জল ফেলে দিতে হবে যার সঙ্গে সব ময়লা বা দূষিত পদার্থ (যদি কিছু থেকে থাকে) চলে যাবে। যে তলানিটুকু থাকবে তার সঙ্গে আবার ২৫ লিটার জল মেশাতে হবে এবং আগের মত নাড়তে হবে। এরপর আবার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখতে হবে নীচে আবার তলানি পড়ে কিনা। উপর থেকে আস্তে আস্তে পরিষ্কার জলটা ঢেলে নিতে হবে এবং বিঅম্লীকরণের কাজে ব্যবহার করা হবে। যে তলানি পড়ে রইল তার সঙ্গে আবার ২৫ লিটার জল মিশাতে হবে আগের মত করে এবং তেমনিভাবে আস্তে আস্তে ঢেলে নিতে হবে ওপরের জলটা। এইভাবে একই ক্যালসিয়াম হাইড্রেক্সাইড থেকে কয়েকবার আমরা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড মিশ্রণ পেতে পারি। যখন দেখা যাবে উপরের পরিস্কার জল নিয়ে নেবার পর নীচে প্রায় আর কোন তলানি থাকছে না তখন আবার নতুন ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিয়ে কাজ সুরু করতে হবে।

ক্যালসিয়াম বাইক্রোমেট মিশ্রণ—আধকিলো ভালকরে গুঁড়ো করা

কীপস্ অ্যাপারেটাস
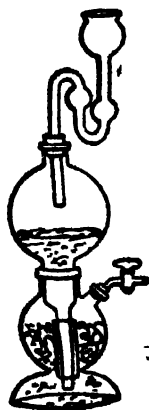
ক্যালসিয়াম কার্বোণেট একটা ২৫-৩০ লিটার আয়তনের পোর্সেলিন অথবা

এনামেলের পাত্রে নিয়ে জলে মিশ্রণ তৈরী করতে হবে এবং তার মধ্যে দিয়ে কীপস্ অ্যাপারেটাসে (Kipps Aparatus) তৈরী কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস চালিত করতে হবে ১৫—২০ মিনিট ধরে। যখন গ্যাস ঐ মিশ্রণের মধ্য দিয়ে চালিত করা হয়, তখন মিশ্রণটি ভাল করে নাড়তে হবে। এইভাবে প্রয়োজনীয় শক্তি সম্বলিত ক্যালসিয়াম বাইক্রোমেট মিশ্রণ তৈরী হয়ে যায়।

মিঃ ডব্লু জে ব্যারো অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত একটি বিঅম্লীকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তিনি ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের বদলে ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট (যেটি জলে অপেক্ষাকৃত বেশী দ্রবণীয়) ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম বাই কার্বোনেট একসাথে মিশিয়ে সেই মিশ্রণের ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভাল এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ফল পাওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতিতে সারা রাত (মোটামুটি ২০ ঘণ্টা) কাগজকে এই মিশ্রণে ভিজিয়ে রাখলে যে অতিরিক্ত বাইকার্বোনেট কাগজে থেকে যায়, সেটা শুকোবার সাথে সাথেই কার্বোনেটে পরিবর্তিত হয়। এভাবে তরল মিশ্রণে ডুবিয়ে কাগজের অম্লতা দূর করা এবং অন্যান্য অনেক ক্ষতিরোধ করা যায় বটে, কিন্তু যেসব কাগজ ভেজাবার পক্ষে উপযুক্ত নয় (যেমন খুবই ভঙ্গুর কাগজ অথবা যেক্ষেত্রে লেখার জন্য অস্থায়ী কালি ব্যবহৃত হয়), সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ চলে না। এছাড়াও কয়েকধরণের কাগজ তার নিজের ওজনের দ্বিগুন জল শুষে নেবার ফলে তার আকার পরিবর্তিত হয়ে যায় (অর্থাৎ বেড়ে যায়) এবং গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপর অসুবিধা হচ্ছে যে ভেজা অবস্থায় কাগজ অত্যন্ত নরম হয়ে যায় এবং সামান্যতম অসাবধানতায় ছিঁড়ে/ফেটে যেতে পারে। পরিশেষে উল্লেখ্য এই পদ্ধতিতে বিঅম্লীকরণ সম্ভব যদি আমাদের হাতে অল্পসংখ্যক কাগজ থাকে—বিরাট সংগ্রহের বিঅম্লীকরণের ক্ষেত্রে এটি উপযুক্ত নয়—সময় এবং ব্যয় দুদিক থেকেই। এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে যে প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা আলাদা আলাদাভাবে মিশ্রণে ডোবাতে হয়। সেজন্য বইয়ের ক্ষেত্রে বইয়ের বাঁধাই খুলে বিঅম্লীকরণ করে, আবার নতুন করে বাঁধাই করতে হয়—কার্যক্ষেত্রে এটি খুবই সময় এবং ব্যয় সাপেক্ষ—তাই সুরু হয় নতুন করে অনুসন্ধান কোন দ্রুততর অথচ সস্তা বিঅম্লীকরণ পদ্ধতির। এইসব অনুসন্ধান এবং গবেষণার ফলে আমরা পেয়েছি তিনটি পদ্ধতি—

(১) স্মিথ পদ্ধতি (পেটেণ্ট ১৯৭০) (উদ্ভাবক—রিচার্ড ডি স্মিথ (Richard D. Smith)

(২) ব্যারো পদ্ধতি (পেটেন্ট ১৯৭২) (উদ্ভাবক—উইলিয়াম জে ব্যারো) (William J. Barrow)

(৩) উইলিয়াম এবং কেলী পদ্ধতি (পেটেন্ট ১৯৭৬) (উদ্ভাবক—জন সি উইলিয়াম এবং জর্জ বি. কেলী, জুনিয়র) (John C. William and George B Kelly Jr.)

এই তিনটি পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটি ব্যাপারে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে—সেটি হচ্ছে এই তিনটিই জলরহিত অথবা নির্জলা বিঅম্লীকরণ পদ্ধতি। এইগুলি উদ্ভাবনের পরও নানা গবেষণা এবং অনুসন্ধান এখনও চলেছে আরো উপযুক্ত এবং সহজতর কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন সম্ভব কিনা দেখার জন্য।

ব্যারো পদ্ধতিতে মরফোলিন গ্যাসের ব্যবহার করা হয়। যদিও এই পদ্ধতিতে যথেষ্ট ভালভাবে বিঅম্লীকরণ করা সম্ভব, তবু এভাবে শোধন করার পরে কাগজে ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট অম্লতা প্রতিরোধক ক্ষমতার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু অন্য দুটি পদ্ধতি যাতে ডাই-ইথাইল জিঙ্ক বাষ্প (Di-ethyl Zinc vapour) অথবা ম্যাগনেসিয়াম অ্যালকোক্সাইড (Magnesium alkoxide) বাষ্প ব্যবহার করা হয় তাতে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া যায়।

স্মিথ পদ্ধতিতে বিঅম্লীকরণের এবং ভবিষ্যতের অম্লতা প্রতিরোধক ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য ম্যাগনেসিয়াম অ্যালকোক্সাইড এর ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার কানাডার জাতীয় সংগ্রহালয়ে এবং কানাডার জাতীয় গ্রন্থাগারে শুরু হয় ১৯৮১ সালে ডিসেম্বর মাসে। ওখানে যে ব্যবস্থা চালু আছে তাতে প্রতি সাত দিনে—দিন-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা কাজ করে ৫000 বই বিঅম্লীকরণ করা যায়।

এই পদ্ধতিতে প্রথমে যে সব বই বিঅম্লীকরণ করতে হবে সেগুলোকে বায়ুশূন্য অবস্থায় শুকিয়ে নিয়ে বিঅম্লীকরণ যন্ত্রের নির্দিষ্ট কক্ষের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সেটিকে বায়ুশূন্য করে নিতে হবে। এবারে বিঅম্লীকারক মিশ্রণ (ম্যাগনেসিয়াম অ্যালকোক্সাইড, এটি ৮% ম্যাগনেসিয়াম মেথোক্সাইড মিথানোল মিশ্রণে প্রস্তুত—এর pH সূচক ১০'৫ থেকে ১১'৫ এর মধ্যে) উচ্চচাপে যন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। উচ্চচাপের ঐ মিশ্রণ বইয়ের সব অংশে ঢুকে যাবার পর অতিরিক্ত মিশ্রণ পাম্প করে বার করে ফেলা হয়। পরে বায়ুশূন্য অবস্থায় বইগুলোকে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নেওয়ার পর বইগুলোকে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক আবহাওয়ায় রেখে দেওয়া হয়, যাতে এটি ক্রমে আর্দ্রতা

শুষে নিয়ে আবার ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। ম্যাগনেসিয়াম মেথোক্সাইড আর্দ্রতার সঙ্গে বিক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইডে বা মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়ায় রূপান্তরিত হয় এবং ভবিষ্যতের প্রতিরোধকের কাজও করে। উচ্চচাপে মিশ্রণ বইয়ের সব অংশে ঢুকে যাবার মাধ্যমে অল্প কিছু মিশ্রণ বইয়ের সব অংশে থেকে যায় যা ভবিষ্যত অম্লতার সমস্যাকে ঠেকিয়ে রাখে।

ডাই-ইথাইল জিঙ্ক পদ্ধতি অর্থাৎ উইলিয়াম এবং কেলী পদ্ধতিতে প্রথমে যে-সব বই বিঅম্লীকরণ করা হবে সেগুলোকে যন্ত্রের বিশেষ কক্ষে রেখে সেটির তাপমাত্রা ৪৫° সে তুলে দিতে হবে, যাতে সেগুলো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। আস্তে আস্তে কক্ষ বায়ুশূন্য করে, তার মধ্যে তরল ডাই-ইথাইল জিঙ্ক (বইয়ের ওজনের ৩% পরিমাণ) ঢুকিয়ে দেওয়া হয়—সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিকটি বাষ্পে পরিণত হয় এবং কাজ সুরু করে। পুরো বিঅম্লীকরণের কাজ শেষ হতে তিন-চারদিন সময় লাগে। এরপর অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থ কক্ষ থেকে বার করে নেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে আর্দ্র কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস কক্ষে প্রবিষ্ট করানো হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এটি কাগজের ওপর ২% জিঙ্ক কার্বাইডের সূক্ষ্ম আবরণ সৃষ্টি করে—যেটি ভবিষ্যৎ অম্লতার আক্রমণ প্রতিরোধ করে। সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি শেষ হতে আটদিন সময় লাগে। এই পদ্ধতিটির অসুবিধা হল, ডাই ইথাইল জিঙ্ক একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক পদার্থ যেটি বাতাস এবং জলের সংস্পর্শে বিস্ফোরণ ঘটায়। এইজন্য একমাত্র অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা উচিত।

এই দুই পদ্ধতির অসুবিধা হচ্ছে এই যে, একমাত্র খুব বড় গ্রন্থাগার কিংবা অনেকগুলো মাঝারি অথবা ছোট গ্রন্থাগার সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে এর ব্যবহার করতে পারে কারণ এটি অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ—বিশেষতঃ এটিতে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সাধারণ মাঝারি অথবা ছোট গ্রন্থাগারের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে।

এই পদ্ধতিগুলিতে ভালভাবে বিঅম্লীকরণ করা সম্ভব হলেও—অতি দুর্বল এবং ভঙ্গুর কাগজের অবস্থার পুনরুদ্ধার এর দ্বারা সম্ভব নয়। হিসাব করে দেখা গেছে, এই ধরণের পদ্ধতির মাধ্যমে বিঅম্লীকরণের জন্য বই পিছু খরচ প্রায় ৬০ টাকার মত।

জলরহিত বিঅম্লীকরণ পদ্ধতিগুলিতে দুটো জিনিষের দরকার হয়—একটি বিঅম্লীকারক পদার্থ এবং অন্যটি রাসায়নিক দ্রাবক। নানাধরণের দ্রাবক এর জন্য ব্যবহার করা চলে তবে তাদের প্রত্যেকেরই বাষ্পীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা জলের তুলনায় কম হওয়া দরকার। এদের মধ্যে কিছু দ্রাবক আছে যারা অত্যন্ত দাহ্য, কিছু বিষাক্ত, আবার কিছু মানবদেহের (বিশেষতঃ ত্বকের) পক্ষে ক্ষতিকারক। আবার কয়েকটি দ্রাবকে কালি দ্রবণীয়। এসব কারণে আমাদের এমন দ্রাবক এবং বিঅম্লীকারক নির্বাচন করতে হবে যা ক্ষতিকারক নয় অথচ যার ব্যবহারে স্থায়ী উপকার পাওয়া যায়।

এতক্ষণ যেসব বিঅম্লীকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে একক পৃষ্ঠা বিঅম্লীকরণ করা সম্ভব। পৃষ্ঠাটি চলমান বেল্টের উপর রাখা হয়, যেটি জলরহিত বিঅম্লীকরণ কক্ষের মধ্য দিয়ে পার হয়ে সম্পূর্ণ শুকোবার পরে পরবর্তী প্রকোষ্ঠে যায়, যেখানে বিঅম্লীকারক প্রয়োগ করা হয় রোলার অথবা স্প্রেয়ারের মাধ্যমে কিংবা পাত্রের মিশ্রণে নিমজ্জনের মাধ্যমে। এসব ক্ষেত্রে বিঅম্লীকারক নির্বাচন নির্ভর করে কোন জিনিষ বিঅম্লীকরণ করতে হবে তার উপর। তবে সাধারণভাবে বলা চলে মিথিলিন ক্লোরাইড মিথানলে দ্রবীভূত করে অথবা ট্রাই-ক্লোরো-ট্রাই-ফ্লোরো-ইথেইন (Tri-Chloro-tri-Fluro-ethyne) ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী।

মিথাইল ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট অধিকতর উপযোগী বিঅম্লীকারক হিসাবে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। এটি অল্প ক্ষারধর্মী (pH সূচীতে ৮ থেকে ৮·৫ এর মধ্যে)। ম্যাগনেসিয়াম মেথাক্সাইডের তুলনায় জলে অথবা আর্দ্রতায় এর বিক্রিয়া কম—ফলে স্প্রেয়ারের নলের মধ্যে জমে যাওয়া বা থিতিয়ে পড়া বা কোন আস্তরণজনিত সমস্যার সৃষ্টি করে না। এটি শক্ত করে আঁটা ভর্তি বোতলে দীর্ঘ সময়ের জন্য অপরিবর্তিত অবস্থায় মজুত করে রাখা সম্ভব। শুকনো গুঁড়ো অবস্থায় এটি মজুত করা যায় সহজেই, যেটি দরকার মত মিথানলে শতকরা ২০ভাগ পর্যন্ত দ্রবণে রূপান্তরিত করা যায়। এটি ব্যবহারে কিন্তু একটি অসুবিধা আছে—সেটি হচ্ছে এই রাসায়নিক পদার্থ ত্বকের এবং চোখের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক। এটি ব্যবহার করার সময় সেজন্য হাতে দস্তানা, চোখে রঙ্গীনকাচের চশমা এবং এপ্রন ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

কালি

আজ আমরা নানা ধরণের কালি দেখতে পাই তাদের ব্যবহারও বিভিন্ন—কোনোটা লেখার, কোনোটা ছাপার আবার কোনটা বা চিহ্ন দেবার অথবা অন্য কোন কাজের জন্য। আধুনিক রং-প্রযুক্তিবিদ্যার প্রগতির সুবাদে আজ নানা রং-এর কালি—হাল্কা থেকে গাঢ়, রামধনুর সব রং—বেগুনী থেকে লাল পর্যন্ত অতি সহজে আমাদের করায়ত্ত। এইসব কালি তৈরীর জন্য অবশ্যই নানা ধরণের উপাদান ব্যবহৃত হয়।

যদিও নিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব, মানুষ কবে প্রথম লেখা বা আঁকার জন্য কালি ব্যবহার করেছিল বা কোথায় সেই ঘটনাটি ঘটেছিল কিংবা সেই প্রথম ব্যবহৃত কালির রং কেমন ছিল। তবুও যতদূর জানতে পারা গেছে তা থেকে বলা চলে যে, মোটামুটি খৃষ্টপূর্ব ৫0 অব্দে চীনদেশে লেখা বা ছাপার জন্য কালির ব্যবহার জানা ছিল। এরও অনেক আগে মিশরে প্যাপিরাসের আমলে কালির ব্যবহার চালু ছিল। খৃষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দে 'উয় ওয়ার'-এর রাজত্ব-কালে রচিত এক বিবরণী থেকে একপ্রকার খোদাই চিত্রের ব্যবহারের কথা জানতে পারা যায়, কিন্তু এটা নিশ্চিত করে জানা যায় না এগুলি সরাসরি পাথরের উপরে খোদাই করা কাজ কিংবা অন্য কোন উপকরণের উপরে খোদাই করা, যেটা থেকে ছাপ তোলা হ'ত উপযুক্ত মাধ্যমের উপরে। একাদশ শতাব্দীতে চীনামাটির চৌকো খণ্ডের উপর খোদাই করা ব্লকের সাহায্যে যে ছাপার কাজ করা হ'ত তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। এথেকে আরো অনেক আগের আঁকা গুহাচিত্রে আমরা নানাধরণের রং-এর ব্যবহার দেখতে পাই। এ থেকে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নানাধরণের রং (যার বেশীর ভাগের প্রধান উপাদান ছিল জৈব বা ভেষজ) প্রস্তুত করতে পারত এবং তা ব্যবহার করতে জানত। গুহাচিত্রের প্রথম যুগে অবশ্য তরল কালি ব্যবহৃত হয়নি—রঙ্গীন মাটি, খড়ি ইত্যাদি শুকনো রং-ই ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাচীনকালে কালি তৈরীর জন্য যত ধরণের উপাদান ব্যবহার করা হ'ত তার মধ্যে সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশী পরিমানে যার ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে কার্বন বা অঙ্গারক। এই কার্বন কালিই বোধহয় মানুষের ব্যবহৃত সবচেয়ে প্রথম তরল রং বা কালি। এই ধরণের কালিই চাইনিজ বা ইণ্ডিয়ান কালি নামে পরিচিত। সাধারণভাবে একে কার্বন কালি বলা হয়। রোমানরা

বলত অ্যাট্রামেনটাম স্ক্রিপ্টোরাম (atramentum scriptorum) বা শুধুই অ্যাট্রামেনটাম।

এটি তৈরীর প্রধান উপাদান ছিল ভুষোকালি, কয়েক ধরণের কাঠ কয়লা, যার সঙ্গে আঠা (সাধারণত গাম অ্যারাবিক (Gum arabic) জল দিয়ে মিশিয়ে নেওয়া হ'ত। কখনও কখনও জলের বদলে মদ বা ভিনিগারের ব্যবহার করা হ'ত। ভুষোকালি বা কয়লা থেকে কালির কালো রংটা পাওয়া যেত। আঠার ব্যবহার করা হ'ত যাতে কার্বন কণাগুলো তরল অবস্থার মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে, থিতিয়ে না পড়ে এবং কাগজের আঁশের মধ্যে শক্ত করে আটকাতে পারে। আর জল বা মদ ব্যবহৃত হ'ত, তরল মিশ্রণ তৈরী করার জন্য। যতদূর জানা যায়, এই কালি শুকনো গুঁড়ো হিসাবেই রাখা হ'ত। দরকার মত গুলে নিয়ে লেখার কাজ করা হ'ত। প্রাচীনতম কালি হলেও উৎকর্ষের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হবে যে এই কালিই ছিল সবচেয়ে সেরা এবং অনুকূল অবস্থায় স্থায়ী। সবচেয়ে বড় কথা এই কালি বয়সের সাথে সাথে বা আলোতে অথবা রোদে কখনও ফিকে হয়ে আসে না এবং এই কালির উপাদানের কোন জিনিষই কাগজের উপর কোন ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। কিন্তু এই কালির কয়েকটি অসুবিধাও আছে, যেকারণে এর ব্যবহার সীমিতভাবে চালু ছিল। অত্যন্ত সেঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এটি সহজেই ধেবড়ে ঝাপসা/অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং জল পড়লে লেখা ধুয়ে নষ্ট হয়ে বা পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়। এব্যাপারটা নজরে আসার ফলেই হয়ত গ্রীক বৈজ্ঞানিক পেডানিয়াস ডাইওস্কোরিডেস (Pedanius Dioscorides) অথবা তাঁর কোন পূর্বগামী ঐ কালিতে অল্প পরিমানে ফেরাস সালফেট (Ferrous Sulphate) মিশিয়ে নিতেন, যেটা অল্পদিনের মধ্যে ফেরিক সালফেটে (Ferric Sulphate) ও লোহার অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। এটি ব্যবহারের ফলে যে লোহার যৌগ তৈরী হ'ত তার উপস্থিতি এই কালিকে সহজে ধুয়ে ফেলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফেরাস সালফেট সহজে দ্রবণীয় হওয়ায় চট্‌করে কাগজ বা অন্য লেখার সামগ্রীর আঁশের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে ফলে যদি কখনও জলে ধুয়ে ফেলাও হ'ত তবে ফিকে বাদামী রং এ লেখার রেশ থেকেই যেত, যেটা জলে কখনও উঠতো না।

প্রাচীনকালে বিবিধ মাধ্যমের উপর লেখার রেওয়াজ ছিল যেমন পাথর, মাটির তাল (অবশ্য এই দুটির উপর কালির ব্যবহারের দরকার হ'ত না),

প্রাণীর চামড়া, কয়েক ধরণের গাছের পাতা (যেমন তাল পাতা), কয়েক ধরণের গাছের ছাল, রেশমী কাপড়, প্যাপিরাস, কাগজ ইত্যাদি। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত লেখার সামগ্রী হিসাবে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে কাগজ। কাগজের আবিষ্কারের পর থেকে আস্তে আস্তে মুখ্য লেখার সামগ্রী হিসাবে কাগজ তার আসন করে নিয়েছে প্রায় স্থায়ী ভাবে। কাগজের বহুল ব্যবহারের আগের যুগে পার্চমেণ্ট ছিল প্রধান লেখার সামগ্রী এবং তারও আগের যুগে প্যাপিরাসই বেশী ব্যবহৃত হ'ত। এই প্যাপিরাস ও পার্চমেণ্টই আমাদের পূর্বসূরীদের জ্ঞান বিজ্ঞান, ইতিহাস, ললিতকলা, সাহিত্য, এক কথায় আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক। এদের উপরে লিখবার বা আঁকবার জন্য যে কালি ব্যবহৃত হয়েছে সেযুগে, সেটা প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে—উপাদানের দিক থেকে। এই উপাদানগুলির মধ্যে কয়লা বা কয়লাজাতীয় পদার্থ, লোহার যৌগ প্রভৃতি রয়েছে যেগুলো অন্য কয়েকটি উপাদানের সঙ্গে (আঠা জাতীয়) মিশিয়ে তৈরী হ'ত লেখার কালি। অবশ্য এই আঠা জাতীয় জিনিষ সম্বন্ধে কিছুটা খোঁজ করে দেখা দরকার। আমরা প্রাচীন কালি তৈরীর উপাদানের মধ্যে গাম অ্যারাবিকের নাম পেয়েছি। সাধারণ বাবলা জাতীয় (acacia) এক ধরণের গাছের আঠাই গাম অ্যারাবিক নামে পরিচিত। এই ধরণের গাছ অপেক্ষাকৃত গরম আবহাওয়ায় বাড়ে। এর জন্য জলেরও খুব বেশী দরকার না হওয়ায় শুকনো অঞ্চলের এর প্রসার দেখা যায়। রোমান, গ্রীক এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরা কালি বানানোর জন্য মিশর অথবা অন্যান্য আরবীয় দেশ থেকে গাম অ্যারাবিক আমদানী করতেন। গাছের গায়ে ছোট কোন ক্ষত সৃষ্ট করলে সেখান থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে যে আঠা বের হয়, বাতাসের সংস্পর্শে এসে সেটা শুকিয়ে ছোট গোলাকৃতি হরিদ্রাভ সাদা রং এর দানায় পরিণত হয়। কালিতে গাম অ্যারাবিকের উপস্থিতি কালির প্রবাহকে স্বচ্ছন্দ করে, কালিকে লেখার সামগ্রীর উপর ছাড়িয়ে পড়া থেকে বিরত করে, এর মধ্যের ভূষোকালির দানাকে ধরে রাখে এবং কালিকে পচন বা গেঁজিয়ে ওঠার হাত থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও লেখার সামগ্রীর উপর কালিকে আটকে রাখায় সাহায্য করে। পালক বা বেতের তৈরী কলমের পক্ষে কালিতে এর উপস্থিতি খুবই দরকারী ছিল স্বচ্ছন্দ প্রবাহের জন্য। কিন্তু আধুনিক লোহার নিবের পক্ষে এটি উপযোগী নয়।

দ্রাবক হিসাবে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হ'ত জল। বৃষ্টির জলই বেশী ব্যবহার করা হ'ত কারণ এটিই ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ। নদীর বা ঝর্ণার জলও

ব্যবহৃত হ'ত, তবে এর ফলে কালিতে তলানি পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেত। বিকল্প হিসাবে কিছু কিছু মদের ব্যবহার হ'ত, কারণ এতে তৈরী কালির রং কিছুটা উজ্জ্বল হ'ত। ভিনিগারও কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু সেটা ব্যাপক ভাবে নয়।

যাই হোক কাগজের উপর লেখার জন্য কার্বন কালি বাদে বেশী প্রচলিত আর ব্যবহৃত কালি মুখ্যতঃ লৌহ যৌগের সঙ্গে ট্যানিক অ্যাসিড এবং গ্যালিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে তৈরী হ'ত—এখনও তৈরী হয়। এই ধরণের কালি প্রথম কবে ব্যবহৃত হয় সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যেতে হবে। প্রথমদিকে এটি গ্যাল কালি (Gall ink) নামে বেশী পরিচিত ছিল। বোলতা জাতীয় এক ধরণের পোকা (Gall wasp) ওক গাছের ছাল ফুটো করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে লার্ভা গাছের গায়ে ছোট ছোট ফোড়ার মত গুটি তৈরী করে, যেগুলো তাদের থাকা খাবার জন্য দরকারী। গাছে আপনা থেকেই এই গুটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ট্যানিক এবং গ্যালিক অ্যাসিড সঞ্চিত হয়। লার্ভা গুটি কেটে বের হয়ে যাবার ঠিক আগে সবচেয়ে বেশী অ্যাসিড সঞ্চিত থাকে। যদি এর আগে কোন কারণে লার্ভা মরে যায় বা গুটি ছেড়ে চলে যায়, তবে এই অ্যাসিড জমা হওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। এই গুটি শুকিয়ে গুঁড়িয়ে নিয়ে ফেরাস সালফেট-এর (Ferrcus Sulphate) সঙ্গে জলে গুলে তৈরী হ'ত কালি। এখন আমরা যাকে ফেরাস সালফেট বলি, সেকালে এটি গ্রীণ ভিট্রিয়ল. সাল মারটিস (Green vitriol, Sal martis), কোপেরাস (Copperas) ইত্যাদি অনেক নামে পরিচিত ছিল। কখনও কখনও শুধুমাত্র ভিট্রিয়ল নামেই পরিচিত হ'ত। কার্বন কালি থেকে এটি ব্যবহারের পক্ষে অনেক উপযোগী। কার্বন কালিব মত এটা আঠালো হয় না। এতে লেখাও হয় স্থায়ী আর লোহার নিব লাগানো কলমে এই কালির প্রবাহও হয় স্বচ্ছন্দ। কিন্তু এ কালিরও কয়েকটি অসুবিধা আছে—যেমন কার্বন কালির তুলনায় এর রং কিছুটা হাল্কা। এই কালিতে সহজে তলানি (sedimentation) পড়ে। পরবর্তীকালে এর উপাদানের সাথে নতুন কয়েকটি উপাদান মিশিয়ে একে আরো উন্নত করা হয়, যাতে এর আগেকার অসুবিধাগুলোকে সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয়েছে। আজকে আমরা যেসব লেখার কালি দেখতে পাই তার মধ্যে কালো কালিতে কয়লাজাতীয় উপাদান এবং নীলাভ কালিতে গ্যালিক, ট্যানিক অ্যাসিডের সঙ্গে লোহার যোগ উপাদান

হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দরকার মত রংএর আভা আনার জন্য অ্যানিলিন রং উপাদানের সঙ্গে মেশানো হয়।

উপাদানের চরিত্রের উপর কালির গুণগত মান অনেকাংশে নির্ভর করে। একমাত্র সেই কালিকে আমরা ভাল কালি বলতে পারি, যখন তার মধ্যে নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকে—

(ক) লেখা স্থায়ী হতে হবে ও লেখার পর কয়েকদিনের মধ্যে সেটি আরো গাঢ় হয়ে উঠবে।

(খ) প্রবাহ স্বচ্ছন্দ এবং কাগজের আঁশের মধ্যে এটি সহজেই অনুপ্রবেশ করবে অথচ আঁশের কোন ক্ষতি হবে না।

(গ) সম্পূর্ণ তরল হতে হবে। জিলেটিনের মত গাঢ় বা কোন তলানি না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) কলম বা লেখার অন্য সরঞ্জামের উপর কোন ক্ষয়কারী প্রতিক্রিয়া থাকবে না।

(ঙ) লেখা যেন আঠালো না হয় এবং তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

সব কালির মধ্যে কার্বন কালির রং বয়সের সঙ্গে অথবা আলোতে ফিকে বা নষ্ট হয় না। কিন্তু এটি যেহেতু জলে নষ্ট হয়ে যায়, এটিকে স্থায়ী কালি বলা চলে না। যদি উপযুক্ত উপাদানের ব্যবহার করে যথাযথভাবে গ্যাল কালি তৈরী করা হয়, যাতে এর মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড না থাকে, তবে সেটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী কালি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

কালির রং কি হবে সেটা নিজ নিজ পছন্দ অনুসারে স্থির করা হয়, কিন্তু কয়েকটা জিনিষ যেমন রং-এর স্থায়িত্ব (পাকা রং) এবং স্পষ্টত্ব থাকা অত্যন্ত জরুরী। কাগজের ওপর কালির লেখার স্থায়িত্বের চেয়েও কালির যে গুণটা বেশী জরুরী, সেটা হচ্ছে কালির প্রভাবে কাগজের কোন ক্ষতি না হওয়া। আধুনিক কালে ব্যবহৃত প্রায় সব কালিরই কাগজের উপর কমবেশী ক্ষতিকারক বিক্রিয়া আছে। অনেক পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যবহৃত কালি লেখার সামগ্রীর প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করেছে—কোথাও কোথাও কালির প্রভাবে কাগজ ফুটো হয়ে গেছে। এর কারণ হচ্ছে কালিতে গাঢ় রং আর ঔজ্জ্বল্য আনার জন্য এতে সিডিক রংএর (cidic dye) উৎপাদন কিংবা মাত্রাতিরিক্ত অ্যাসিডের উপস্থিতি। অবশ্য লোহার যোগ থেকে তৈরী কালিতে কিছু পরিমাণে অ্যাসিডের উপস্থিতি একান্তই আবশ্যক—কালির মান, স্পষ্টতা ও

তরলতা স্থায়ী করতে (অর্থাৎ যাতে সেটা ক্রমশঃ জিলেটিনের মত ঘন না হয়ে পড়ে)। সেজন্য সচেতনতার সঙ্গে অ্যাসিডের মাত্রা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে হবে, যাতে কাগজে বা অন্য মাধ্যমের উপর ক্ষতিকরার মত অতিরিক্ত অ্যাসিড না থাকে। বিশ্লেষণে যদি দেখা যায় যে কালির pH মাত্রা ৪ বা তার চেয়েও নীচে রয়েছে, তবে বুঝতে হবে সেটি কাগজের পক্ষে ক্ষতিকারক।

একটা সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে কালি কাগজের পক্ষে ক্ষতিকারক কিনা সেটা নির্দ্ধারিণ করা সম্ভব। একটুকরো কাগজ কালিতে ১ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে, তারপর সেটাকে তুলে মোটামুটি ২১.৫ থেকে ২২° সেঃ তাপমাত্রায় এবং ৬৫% আর্দ্রতার মধ্যে রেখে পুরোপুরি শুকিয়ে নিতে হবে। ঠিক সমান আয়তনের একই কাগজের টুকরো এই টুকরোর সাথে 'কৃত্রিম বয়সজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপক পরীক্ষা'র (Accelerated Aging Tests for Paper) মাধ্যমে পরীক্ষা করতে হবে, অর্থাৎ কৃত্রিম চুল্লীতে ১০৫° থেকে ১০৭° সেঃ তাপমাত্রায় ৭২ ঘণ্টা (অর্থাৎ তিনদিন) রেখে দিতে হবে। এরপর কালিতে ভেজানো কাগজকে ক্রমাগত ভাঁজের মাধ্যমে যদি দেখা যায় নতুন কাগজটির তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগের চেয়ে বেশী ভাঁজ সহ্য করার ক্ষমতা কমে গেছে, তবে বুঝতে হবে এই কালি কাগজের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী নয়।

আরেকভাবেও কালির ক্ষতিকারক শক্তির পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব। একটা কাগজের ওপর লোহার নিব দিয়ে কালির কয়েকটা দাগ কাটতে হবে এমনভাবে যাতে লাইনগুলো একটা অন্যটাকে ছেদ করে। এবার কাগজটিকে ৭২ ঘন্টার জন্য ১০৫° সেঃ তাপমাত্রায় রেখে দিতে হবে। তারপর একটা সূঁচ দিয়ে আলতোভাবে কালির রেখাগুলি পরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষা থেকে বোঝা সম্ভব কাগজ কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে যেখানে কালির রেখাগুলো একে অপরকে ছেদ করেছে। যেসব ক্ষেত্রে বেশী ক্ষতি হয়েছে সেখানে আলতোভাবে সূঁচ চালাবার সময় কাগজ ছিড়ে যাবে।

যেসব পাণ্ডুলিপিতে কালির অম্লতাজনিত ক্ষতি সুরু হতে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের বিঅম্লীকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব যাতে লেখার কোন ক্ষতি না হয়। এ ব্যাপারে কয়েক ধরণের বিঅম্লীকরণ পদ্ধতি চালু আছে—তবে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিটি—ব্যারো পদ্ধতি—যার উদ্ভাবক ডবলু জে ব্যারো। এই পদ্ধতিতে দুটি মিশ্রণের ব্যবহার করা

হয়— 0·১৫% ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড মিশ্রণ ও 0·১৫% ক্যালসিয়াম বাই-কারবোনেট মিশ্রণ। পাণ্ডুলিপিটি এই দুই মিশ্রণের প্রতিটিতে ২০ মিনিট ধরে ডুবিয়ে রাখা হয়, তারপর তুলে শুকিয়ে নিতে হয়।

ক্যালসিয়াম বাইকারবোনেট আর ম্যাগনেসিয়াম বাইকারবোনেটের মিশ্রণও এই কাজে ব্যবহার করা হয়। ১·৫ থেকে ২ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও ১৫ থেকে ২০ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট মিশ্রণের মধ্য দিয়ে দু'ঘণ্টা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস চালিত করে এই মিশ্রণ তৈরী করা হয়। মিশ্রণ তৈরী হলে তার মধ্যে পাণ্ডুলিপিকে ২০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখা হয়।

৪২ গ্রাম ডাই-সোডিয়াম-পাইরো ফস্‌ফেট্, ৫ গ্রাম পটাসিয়াম ফেরোসাই-নাইড, ১৪ গ্রাম সোডা, ৪·৫ লিটার জলে মিশিয়ে সেই মিশ্রণ বিঅম্লীকরণের কাজে ব্যবহার করা হয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে কয়েকটি বিঅম্লীকরণ পদ্ধতির কথা বলা হ'ল সবগুলোতেই কোন না কোন জলভিত্তিক মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছে, সেহেতু এই সবগুলোকে জলভিত্তিক বা সিক্ত বিঅম্লীকরণ পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা চলে। এইগুলি একমাত্র সেই পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলে যাতে এমন কালি ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা জলে দ্রবীভূত হয় না অর্থাৎ পাকা কালি এবং জল নিরোধকও বটে (water reaistant)। যে সব কালি জলে ধুয়ে যায় অর্থাৎ কাঁচা কালিতে লেখা পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে ১·৮৬ গ্রাম বেরিয়াম হাই-ড্রোক্সইড ১00 মিলিলিটার মিথানলে মিশিয়ে সেই মিশ্রণ অথবা ৫% ম্যাগনে-সিয়াম মেথোক্সাইডের মিথানলে মিশ্রণ দিয়ে বিঅম্লীকরণ পদ্ধতি জলরহিত বিঅম্লীকরণ পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত।

এছাড়াও নানা ধরণের গ্যাস যেমন সাইক্লোক্সিল্যামাইন (Cyclohexy-lamine) কার্বোনেট অথবা অ্যামোনিয়া এই কাজে ব্যবহার করা চলে। এই সব ধরণের বিভিন্ন বিঅম্লীকরণ পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপির পক্ষে উপযোগী এবং এদের প্রত্যেকটিই যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করার পর সাবধানতার সাথে প্রযোজ্য।

কাগজের উপর কালির নিজস্ব বিক্রিয়া এবং কাগজের বয়সজনিত দুর্বলতার ব্যাপারে সম্যক অনুধাবন সংরক্ষণের কাজের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কাগজের উপর কালি দিয়ে লেখার পর কি বিক্রিয়া ঘটছে সেটা জানা অবশ্যই দরকার। কার্বনভিত্তিক কালি ব্যবহারের পর সেটা যাতে কাগজ বা অন্য লেখার মাধ্যমে

আটকে থাকে সেজন্য এর উপাদানের মধ্যে আঠা জাতীয় কোন জিনিষ থাকে—কিন্তু লোহাযোগভিত্তিক কালিতে এই কাজটা সারা হয় জলে মেশানো অ্যাসিডের মাধ্যমে যেটা কালি তৈরীর উপাদানের মধ্যেই থাকে। লোহাভিত্তিক এই কালিতে সদ্য লেখা অক্ষরগুলো একটু নীলচে রং-এর হয়, অবশ্য যদি না এর উপাদানে কালো রং মেশানো হয়। কিন্তু লেখার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় লেখা আরো গাঢ় এবং কালচে দেখায় ("writes blue, dries black")। এর পিছনে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া আছে সেটা হচ্ছে কালির লোহাভিত্তিক যৌগ (Iron salt) ফেরাস থেকে ফেরিক (Ferrous to Ferric) অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। কিন্তু তারপরও বাতাসের অক্সিজেন কালির সঙ্গে বিক্রিয়া চালিয়ে যায়, যার ফলে কালির গ্যালিক এবং ট্যানিক অ্যাসিড বিক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে কালির দাগকে প্রথমে কালচে বাদামী তারপর গাঢ় বাদামী এবং শেষে মরচের রংএ রূপান্তরিত করে। কিন্তু এই সম্পূর্ণ বিক্রিয়া ঘটতে কত সময় লাগবে সেটা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ও কালির উপাদানের উপর। কালির তরলতা এবা কাগজের ভিতরে তার অনুপ্রবেশের ক্ষমতা, লেখার জন্য ব্যবহৃত নিব, লেখকের লেখার সময় হাতের চাপ (যার উপর কালির প্রবাহ নির্ভরশীল) ইত্যাদি। এখানে বলে রাখা ভাল যে যদি লেখা স্বাভাবিকভাবে বাতাসে শুকোতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি শুকোবার জন্য ব্লটিং (শুষ) কাগজের ব্যবহার করা হয় তবে কাগজে ক্ষতি দ্রুততর হয়।

লেখার কয়েক বছর পরে তার চেহারা কেমন থাকবে সেটা নির্ভর করে কি ভাবে এবং কি পরিবেশে এটি এতদিন ছিল। সেঁতসেঁতে জায়গায় / বেশী আলোর মধ্যে থাকলে ক্ষতি দ্রুততর হয়, কিন্তু শুকনো অন্ধকার জায়গায় থাকলে ঠিক উল্টো প্রতিক্রিয়া হয় অর্থাৎ ক্ষতি ধীরগতিতে ঘটে। কাগজের নিজস্ব চরিত্রও এ ব্যাপারে আরেকটি বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে, যেমন কাগজ ক্ষারধর্মী (alkaline) হলে কালির অম্লতা অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হয়ে লেখা অতি শীঘ্র কালো হয়ে যায়—যেমনটি ঘটে ক্ষারধর্মী চীনামাটির প্রলেপ দেওয়া (calendered) কাগজে।

কখনও কখনও কাগজের ওপর লেখা পরীক্ষা করে পাণ্ডুলিপির সাম্ভাব্যকাল মোটামুটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব ; কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে বয়স নির্ধারণ খুবই শক্ত। এভাবে বয়স নির্ধারণে যে কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর

করতে হয়, সেগুলো হচ্ছে—লেখার রঃ এবং কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে এর বিক্রিয়ার গতি।

লেখার রং এর যদিবা কিছু পরিবর্তন হয় তবু সেটা খালি চোখে ধরা নাও পড়তে পারে, কিন্তু এক বিশেষ ধরণের অনুবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে রং এর সামান্য তারতম্যও ধরা পড়ে।

রাসায়নিক পরীক্ষা ঃ এই ধরণের অনুসন্ধানে সাধারণত কালির দাগযুক্ত কাগজ পরীক্ষা করা হয়—দরকার হলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রেরও ব্যবহার করা হয়।

(ক) দাগের ওপর একফোঁটা জল ফেলা হয়। জলে দ্রবণীয় রং বা কালি ঐ জলে গলে যাবে অথচ লোহার যৌগ বা কার্বন অদ্রবণীয় হওয়ায় অপরবর্তিত থাকে। ভালভাধে পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে, লেখার ওপর খস্‌খসে অদ্রবণীয়, রংহীন পদার্থ এবং সূক্ষ্ম বালি রয়েছে তবে বুঝতে হবে লেখার সময় তাড়াতাড়ি শুকোবার জন্য ব্লটিং কাগজ ব্যবহার করা হয়েছিল।

(খ) একফোঁটা ৫% হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দাগের উপর ফেলা হয়। তারপর সেটাকে একটু গরম করে ঠাণ্ডা হবার পর ১০% পটাসিয়াম ফেরো-সাইনাইড (Potassium Ferro-cyanide) একফোঁটা ফেলা হয়। যদি এর পাঁচ মিনিট পর দাগ নীল রং-এ পরিবর্তিত হয় তবে বুঝতে হবে কালির উপাদান হিসাবে লোহাঘটিত যৌগ ব্যবহৃত হয়েছিল। কালির দাগছাড়া শুধু কাগজও একইভাবে পরীক্ষা করা দরকার, কাগজে লোহাঘটিত যৌগ আছে কিনা সেটা জানার জন্য। এভাবে নিশ্চিতভাবে পরিমাপ করা সম্ভব কালিতে লোহার পরিমাণ।

(গ) কালি দিয়ে লেখার উপর ১% অক্‌জালিক (Oxalic) অ্যাসিড এক ফোঁটা ফেলে, পাঁচ সেকেণ্ড পর বাড়তি অ্যাসিড মুছে দিয়ে এক ফোঁটা সদ্য বানানো ব্লিচিং পাউডারের মিশ্রণ তাতে ফেলতে হবে। এতে সাধারণ লোহাঘটিত কালির সব দাগ সম্পূর্ণ মুছে যায়—কিন্তু যদি কিছু দাগ অবশিষ্ট থাকে তবে সেটা কার্বন ঘটিত হবার সম্ভাবনাই বেশী, তাই সেভাবে পরীক্ষা করতে হবে। লোহা ঘটিত কালির ক্ষেত্রে দাগ যত প্রাচীন হবে এই পরীক্ষার সময় দাগ মুছতে তত বেশী সময় লাগবে।

(ঘ) কালিতে ক্লোরিন থাকে—হয় হাইড্রোক্লোরিক (Hydrochloric) অ্যাসিড নতুবা কোন ধাতুর ক্লোরিন যৌগ হিসাবে। বাতাসে উপস্থিত আদ্রর্তার সঙ্গে বিক্রিয়ায় এই ক্লোরিন আস্তে আস্তে কালি থেকে কাগজের আঁশে

চলে যায়। এভাবে কাগজে ছড়িয়ে পড়ার পরিমাপ থেকে পাণ্ডুলিপি বা কালির প্রাচীনত্ব নিরূপন করা সম্ভব। অবশ্য এভাবে ছড়াবার ব্যাপারটা কাগজের মান এবং বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল।

পাতলা নাইট্রিক (dilute Ni'ric) অ্যাসিড এবং সিলভাব নাইট্রেটের (Silver Nitrate) মিশ্রণ দিয়ে কালির লেখাকে ভিজিয়ে দিলে কালির সব ক্লোরাইড যৌগ সিলভার ক্লোরাইডে (Silver Chloride) রূপান্তরিত হয়, যেটা তুলনামূলকভাবে কম দ্রবণীয় হওয়ায় কাগজের উপর আরো স্থায়ী হযে থাকে। লেখার উপর পারম্যাঙ্গানেট্ (Permanganete) বা নাইট্রাইট (Nitrite) ব্যবহার করলে লেখার রং অনেক হাল্কা হয়ে যায়। বাড়তি সিলভার নাইট্রেট পাতলা নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে ধুয়ে ফেলার পরে ফরম্যাল-ডিহাইড (Formaldehyde) অথবা হাইপো (Hypo) মিশ্রণ (অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রো-সালফাইট (Sodium Hydro-sulphite) দিয়ে ধুলে সিলভার ক্লোরাইড রূপাতে পরিবর্তিত হয়। কাগজের উপর এর দাগ ধরে। যেহেতু কাগজে অনেক সময় ক্লোরিন অথবা ক্লোরাইড থাকে (যেটা কাগজ তৈরীর সময় এতে ঢুকে পড়েছে) সেহেতু এই ধবণের পরীক্ষা থেকে খুব নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা মুস্কিল।

ঝাপসা হয়ে যাওয়া লেখা আবার পাঠোপযোগী করে তোলার প্রক্রিয়া

বয়সের জন্য, অক্সিজেনের বিক্রিয়া, আলো বা জলের প্রভাবে যে কালির লেখা ঝাপসা হয়ে এসেছে, সেটাকে কাগজের মারাত্মক ক্ষতিসাধন না করে আবার আগের মত স্পষ্ট করা সম্ভব নয়। কার্বনঘটিত কালি বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঝাপসা হয় না, যেমনটি হয় লোহা ঘটিত বা অন্য রং এর উপকরণে তৈরী কালির ক্ষেত্রে। অনেক সময় দেখা যায় যে কয়েক ধরণের কালিতে লেখা আস্তে আস্তে ঝাপসা হতে হতে সম্পূর্ণ মুছে যায়, এমনকি অক্সিজেন বিক্রিয়ার কোন ছাপও খুঁজে পাওয়া যায় না। লোহাঘটিত কালিতে লেখা যখন ঝাপসা হয়ে আসে তখন লেখার দাগের মধ্যে আয়রণ অক্সাইডের (Iron Oxide) রেশ রেখে যায় এবং এর ফলে ঐ প্রায় মুছে যাওয়া লেখাকে আবার পাঠোপোযোগী করে তোলা সম্ভব কয়েকটি পদ্ধতিতে, যেমন—

(ক) অ্যামোনিয়াম সালফাইডের (Ammonium Sulphide) বাষ্প

ফেরাস অক্সাইডকে ফেরাস সালফাইডে রূপান্তরিত করে, যার মধ্যে কিছু কিছু সালফার দানাও পাওয়া যায়। পাতলা (dilute) অ্যামোনিয়াম সালফাইড মিশ্রণ দিয়ে লেখা ভিজিয়ে পরে অতিরিক্ত মিশ্রণ স্পঞ্জের সাহায্যে মুছে নিলে একই ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় ফুটিয়ে তোলা লেখা খুব স্বল্প সময় স্থায়ী হয় কারণ আয়রণ সালফাইড অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে আয়রণ সালফেটে পরিবর্তিত হয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই। এছাড়াও এই পদ্ধতিতে কাগজের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

(খ) ২% বা ৩% ট্যানিক অ্যাসিড মিশ্রণ বা সংপৃক্ত (saturated) গ্যালিক অ্যাসিড মিশ্রণ ব্যবহারে ফেরিক অক্সাইডকে কালো করে দেয় অথচ এই দুই মিশ্রণ কাগজের পক্ষে ক্ষতিকারকও নয়।

(গ) পটাসিয়য়াম ফেরোসাইনাইড (Potassium Ferrocyanide) ও অল্প হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ ব্যবহার করলে ফেরিক অক্সাইড নীলচে রং ধরে যেটা স্থায়ী। কিন্তু পরবর্তীকালে এই মিশ্রণ ব্যবহারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং কাগজের সর্বত্র নীলচে ছোপ ধরতে দেখা যায়। কাগজে উপস্থিত লোহা এই পদ্ধতির পক্ষে অনুকূল নয়।

(ঘ) যে সব কালির উপাদানে সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে সেটাতে লেখা পাণ্ডুলিপি ৫% লেড পারক্লোরাইড (Lead perchloride) এবং পারক্লোরাইড অ্যাসিডে (Perchloride acid) মিশ্রণে ধুয়ে নিলে সালফিউরিক অ্যাসিড লেড্ সালফেটে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে লেখা স্পষ্টতর এবং পাঠযোগ্য হয়ে পড়ে।

খুব ঝাপসা হয়ে যাওয়া লেখা যদি অতিবেগুনী রশ্মির (Ultra Violet Ray) মধ্যে রাখা যায় তবে লোহা যৌগের রেশ কালো রং নিয়ে ফুটে ওঠে। পড়বার জন্য অল্প সময় অতিবেগুনী রশ্মিতে রাখলে কাগজের বেশী ক্ষতি হয় না।

সমান পরিমাণ ভেসিলিন এবং খনিজ তেলের মিশ্রণ পোড়া কাগজের পিছনের দিকে লাগিয়ে যদি কাগজটি অতিবেগুনী রশ্মিতে রাখা হয়, তবে ঐ আলোতে তেল চক্‌চক্ করে, তার পটভূমিতে লেখা গাঢ়ভাবে ফুটে ওঠে।

একইভাবে অ্যালকোহলে অ্যানথ্রেসিন (Alchohol Anthrecin) মিশিয়ে ব্যবহার করা চলে। অতিবেগুনী আলোতে অ্যানথ্রেসিন দৃশ্যমান হয়ে উঠে।

অতিবেগুনী আলো খালি চোখে দেখা যায় না। অতএব ঐ আলো ব্যবহার করে আমরা যে লেখা দেখি সেটা অল্প দৃশ্যমান আলোর সাথে অনেকটা অতি বেগুনী আলো একসাথে কাগজের উপরে পড়ার ফলে যে বৃহত্তর আলোক তরঙ্গের উৎপত্তি হয় সেটার জন্য। এইভাবে ফটোও তোলা যায় তবে সেজন্য দুটো পরিস্রাবক (Filter) ব্যবহার করা দরকার—(১) একটি

খুব ঝাপসা লেখার অতি বেগুনী রশ্মির মাধ্যমে চিত্র গ্রহণ
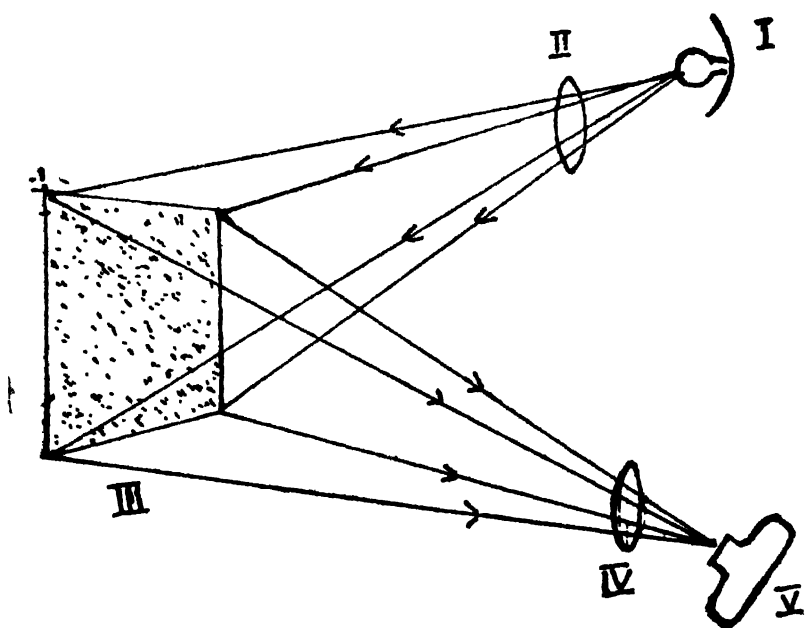
i. অতি বেগুনী রশ্মির উৎস ii. উড'স গ্লাস ফিল্টার iii. কাগজ (যার ছবি তোলা হবে) iv. সোরিয়াম-অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফিল্টার v. ক্যামেরা।

অতিবেগুনী আলোর উৎস আর কাগজের মধ্যে যেটা দৃশ্যমান আলোকে অপসারিত করে—এটি উড'স গ্লাস ফিল্টার নামে পরিচিত, (২) দ্বিতীয়টি কাগজ এবং ক্যামেরার মধ্যে রাখতে হবে যাতে প্রতিফলিত অতি বেগুনী আলো অপসারিত হয়। ১% সোরিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (Sorium Ammonium Nitrate) দ্রবণ (solution) ফিল্টার হিসাবে ব্যবহারের উপযুক্ত। সব

ছবি বিশেষ অন্ধকার ঘরে প্যানক্রোম্যাটিক (Panchromatic) প্লেটে তুলতে হবে, যেটা সবুজ আলোতে অথবা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ছবি তোলার ব্যাপারে ফোকাস করাটা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে অত্যাধিক অতিবেগুনী আলোর প্রতিসরণের জন্যে। এই কাজের জন্য ঘসা কাচে ফোকাস ঠিক করার জন্য দীর্ঘ আলোর তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সাধারণ আলোতে করা ফোকাস, অতিবেগুনী আলোর পক্ষে মোটেই ঠিক নয়। সেজন্য অতিবেগুনী রশ্মিতে ফোকাসটা প্রায় সম্পূর্ণ আন্দাজের উপরেই করতে হয়, যার ফল সঠিক নাও হতে পারে।

প্রায় মুছে যাওয়া লেখার পাঠোদ্ধারের পদ্ধতি

উপরে উল্লেখ করা পদ্ধতিগুলি ছাড়াও আরো কয়েকটি পদ্ধতিতে প্রায় মুছে যাওয়া লেখার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব।

আগুনে পুড়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপি—আগুনের প্রভাব বিভিন্ন কালির লেখার উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অ্যানেলিন (Aniline) রং এর উপাদানে তৈরী কালি আগুনের প্রভাবে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়—যার ফলে লেখার কোন চিহ্ন থাকে না। আগুনে প্রভাবিত হয়েও কার্বন বা লোহা ঘটিত কালি কাগজের উপর স্পষ্ট ছাপ রেখে যায়, যেটা পাঠের পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু এই ধরণের আগুনে প্রভাবিত পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধারের আগে কাগজকে যথোপযুক্তভাবে সুরক্ষিত করে নিতে হবে।

ভস্মীভূতীকরণ পদ্ধতি ঃ আগুনে কাগজ যদি প্রায় সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়, তবে লেখা স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। কাগজ পুড়ে কালো হয়ে যাওয়ায় এবং কালি আংশিক অক্সিডাইজড্ (Oxidised) হওয়ায় কালোর ওপর কালো দাগ এমনভাবে মিশে যায় যে পড়া সম্ভব হয় না। এই সমস্যার সমাধানে মিটচেল (Mitchel) প্রথমে ভস্মীভূতীকরণ (Incineration) পদ্ধতির ব্যবহারের কথা বলেন, যাতে ক্ষতিগ্রস্থ কাগজটি সাদাটে ছাইয়ে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে অক্সিডেশন সম্পূর্ণ হওয়ায় সাদা ছাইয়ের উপর কালির লেখা পাঠযোগ্যরূপে ফুটে উঠে। তবে এই পদ্ধতি একমাত্র যখন অন্য কোন উপায় থাকে না, তখনই ব্যবহার করা উচিত।

ফটোগ্রাফিক পদ্ধতি ঃ পোড়া কাগজ অত্যন্ত সংবেদনশীল (sensetive) ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর অন্ধকারে পনেরোদিন রেখে দেওয়া হবে। কাগজে

প্লেটের উপর বিক্রিয়া করবে, অথচ কালি কোন বিক্রিয়া করবে না, ফলে প্লেটের ওপর লেখা ফুটে উঠবে। প্লেটের বদলে যদি ফিল্ম ব্যবহার করা হয় তবে কালির দাগ ফুটবে অথচ কাগজ কোন বিক্রিয়া করবে না।

চেরিল পদ্ধতি ঃ পোড়া কাগজ ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর রেখে সেটা ফটোগ্রাফিক ট্রের মধ্যে ৫% সিলভার নাইট্রেটের জলে মিশ্রণের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে। আস্তে করে আরেকটি কাঁচের সীট দিয়ে কাগজটি চেপে দিতে হবে। তিন ঘণ্টা পরে দেখা যাবে হাল্কা পশ্চাতপটের উপর কালো রংএ লেখা ফুটে উঠেছে। এই পদ্ধতির উদ্ভাবক ডঃ চেরিল (Dr. Cherril) এর নামানুসারে এটি চেরিল পদ্ধতি নামে পরিচিত।

রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ (১) একটা প্লেটকে ১% জিলেটিন মিশ্রণে ৪০° সে তাপমাত্রায় ডুবিয়ে তোলার পর তার উপরে পোড়া কাগজকে সম্পূর্ণভাবে পেতে বসিয়ে (বাষ্পের সাহায্যে) তার উপর আরেকটা প্লেট দিয়ে চেপে রোদের আলোতে বা তীব্র আর্কের আলোতে ফটোগ্রাফ তুলতে হবে। ফেরাস অক্সেলেট (Ferrous Oxalate) এবং পটাসিয়াম ব্রোমাইডের (Potassium bromide) মিশ্রণে আস্তে আস্তে ফটোটি ফুটিয়ে তুলতে হবে। এই ছবিটি বিশেষ ধরণের হলদেটে রংএর প্রলেপযুক্ত কাগজে (যেটি রেমব্রাণ্ট কাগজ (Rembrant paper) নামে পরিচিত) ছাপাতে হবে।

(২) পোড়া কাগজের উপর অ্যামোনিয়াম সালফাইড (Ammonium Sulphide) মিশ্রণ দিয়ে মুছে দিতে হবে। যখনই লেখা ফুটে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে তার ফটো তুলে নিতে হবে। কারণ ঐ লেখার স্থায়িত্ব খুবই স্বল্প।

(৩) ক্লোরাল হাইড্রেটের (Chloral Hydrate) প্রলেপ পোড়া কাগজের উপর লাগাবার পর গ্লিসারিনের একটা প্রলেপ দিয়ে দৃশ্যমান লেখার ফটো তুলে নিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৪) পোড়া কাগজের ঔজ্জ্বল্য পোলারাইজড আবরণের সাহায্যে কমিয়ে আতস কাচের মাধ্যমে পাঠোদ্ধার সম্ভব।

জলে ক্ষতিগ্রস্থ লেখা বা প্রায় ধুয়ে ঝাপসা হয়ে গেছে এমন লেখার পাঠোদ্ধারের জন্য সাধারণ ঝাপসা হয়ে যাওয়া লেখা পাঠোদ্ধারের পদ্ধতিই ব্যবহার করতে হবে। (পৃষ্ঠা ৪৮—৫০)

পার্চমেণ্ট ও চামড়া

গ্রন্থাগার সংগ্রহের মধ্যে আমরা চামড়ার উপস্থিতি দেখি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে ব্যবহৃত অবস্থায়, একটি লেখার মাধ্যম হিসাবে, অন্যটি বই বাঁধাইয়ে অন্যতম প্রধান উপকরণ হিসাবে। শুধু ব্যবহারের দিক থেকেই নয়, চামড়া প্রস্তুত এবং চরিত্রের দিক থেকেও এরা আলাদা। সেকারণে আমাদেরও এই দুটো সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে পৃথকভাবে। প্রথমে দেখা যাক লেখার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত চামড়ার কথা—লেখার মাধ্যম হিসাবে যত রকম চামড়া ব্যবহৃত হয়েছে তারমধ্যে প্রথমে মনে আসে পার্চমেন্টের কথা, তারপর ভেলাম।

পার্চমেন্ট

আগেই আমবা বলেছি, লেখার সামগ্রী হিসাবে পার্চমেন্টের ব্যাপক ব্যবহার সুরু হয় মোটামুটি ১৯০ খৃঃ পূর্বাব্দে। কিন্তু প্রথম পার্চমেন্ট তৈরী করা হয় তার অনেক আগে খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে মিশর দেশে। একটা কথা মনে রাখা দবকার যে ঐ যুগের প্রাথমিক পার্চমেন্ট বা ভেলাম কিন্তু শোধিত চামড়া (tanned) নয়। কাঁচাচামড়া ভালভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিয়ে এটি তৈরী হ'ত। সে সময়ে কয়েক ধরণের বাদ্যযন্ত্র, ড্রাম তৈরীতে এর ব্যাপক ব্যবহার করা হ'ত। মধ্যযুগে এই পার্চমেন্টের উপর তিসির তেল (Linseed oil) ব্যবহার করে একে আধা স্বচ্ছ বা ইষদচ্ছ (translucent) পর্দা বা ঢাকা হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত।

মিশরের বহু পুরোনো এক পাণ্ডুলিপিতে লেখার সামগ্রী হিসাবে চামড়ার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা থেকে অনুমান করা যায় যে খৃষ্টের জন্মের ২৭০০ বছর আগেও অন্তত কিছু কিছু লেখার কাজে চামড়ার ব্যবহার হ'ত। প্রাচীনতম চামড়ার উপরে লেখা গোটানো নথি যেটি বর্তমানে বার্লিনে আছে তার যে কাল নির্ণয় করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ২০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ। প্রায় তার শ' তিনেক বছর পরের আরেকটা নথি বৃটিশ মিউজিয়ামে আছে। তবে এগুলি চামড়া না পার্চমেন্টের নথি সেটা একমাত্র নিবিড় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমেই বলা সম্ভব। একমাত্র মিশরেই এই ধরণের অত্যন্ত পুরানো চামড়ায় লেখা নথি পাওয়া যাওয়া গেছে, তবে নানা স্থানে (আমেরিকা, ফ্রান্স, পারস্য ইত্যাদি) যে এর ব্যবহার চালু ছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

খুব সম্ভব প্লিনিই সম্রাট দ্বিতীয় ইউমেনেসের আগ্রহে ১৯০ খৃঃ পূঃ পার্চমেণ্টের উদ্ভাবণের কথা প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে এটি সত্যি নয় বলে এখন প্রমাণিত। এটা হয়ত ঠিক যে ঐ সময়ে এর প্রভূত উন্নতি করা হয়, যার ফলে এটি লেখার পক্ষে আরো উপোযোগী ও টেকসই হয়ে ওঠে এবং এর বহুল ব্যবহারও সুরু হয়। গ্রীক এবং রোমানদের সময়ে পার্চমেণ্টকে আয়তাকারে কেটে তার ওপর লেখা হ'ত, পরে একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে গুটিয়ে রাখার ব্যবস্থা ছিল। মধ্য, উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপে এর ব্যবহার ছড়ায় খৃষ্ট ধর্মপ্রসারের সাথে সাথে। মধ্য যুগে সবচেয়ে ভাল মানের পার্চমেণ্ট তৈরী হ'ত অজাত বা সদ্যজাত ভেড়া বা বাছুরের চামড়া থেকে। ফরাসীতে "Veter" বলতে বাছুর সম্বন্ধীয় বোঝায়, সেটা থেকে ভেলাম কথাটা এসেছে। কখনও কখনও সমার্থক হিসাবে এই দুই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একটি মত অনুসারে বাছুরের চামড়া থেকে পার্চমেণ্ট তৈরী হ'ত। অন্য আরেক মত অনুসারে অধিকতর উচ্চমানের পার্চমেণ্টকেই ভেলাম বলা হ'ত। বিভিন্ন নথিপত্তর থেকে মনে হয় শেষোক্ত মতবাদই সঠিক হওয়া সম্ভব।

পার্চমেণ্ট তৈরীর পদ্ধতির প্রথম অংশটা ছিল, চামড়া চুনের জলে ভিজিয়ে রেখে (দিন তিনেক) পরে ভোঁতা ছুরির সাহায্যে লোম পুরো পরিষ্কার করে নেওয়া। পরবর্তী পর্যায় সেটা কাঠের কাঠামোয় টান করে বাঁধা অবস্থায় শুকানো হ'ত। সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবার পর আরো চুন ঘসে প্রয়োগ করা হয় যাতে চামড়ার অবশিষ্ট আর্দ্রতা এবং চর্বি নষ্ট হয়ে যায়। শেষ পর্যায় ধারালো ছুরির সাহায্যে চেঁছে চামড়াকে আরো মসৃন ও পাতলা রূপ দেওয়া হয়। প্রয়োজন মত পাথরে ঘসে আরো লেখার উপযুক্ত করে নেওয়া হত। প্রথমদিকের পার্চমেণ্টের যে সব নমুনা পাওয়া যায়, তা থেকে দেখা যায়, সেগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত মোটা, পরবর্তীকালে একে চেঁছে পাতলা করার ব্যবস্থা যে হয়েছিল সেটা বোঝা যায়। আরো পরে দেখা যায় চামড়াকে দুই বা ততোধিক স্তরে ভাগ করে উপরের স্তরের (যেদিকে লোমের মূল থাকে) অংশটি বাঁধাইয়ের কাজে এবং তার নীচের অংশ লেখার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। কখনও কখনও পার্চমেণ্ট তৈরী করার আগে লবন ব্যবহার করে এর সংরক্ষণ করা হ'ত। কোন কোন ক্ষেত্রে পার্চমেণ্ট তৈরীর সময় শেষ পর্বে অল্প পরিমান ভেষজ রসায়ণ ব্যবহারের নিদর্শনও পাওয়া যায়। আধুনিক যুগেও পার্চমেণ্ট মোটামুটি একইভাবে তৈরী করা হয়, প্রভেদ শুধু এটুকু যে, চুনের বদলে

সোডিয়াম সালফাইড্ (Sodium Sulphide) ব্যবহার করা, মেশিনের সাহায্যে সরু সরু স্তরে কাটা, শুকোবার জন্য চক্রীর ব্যবহার করা হয়। এখানে একটা ব্যাপার উল্লেখ করা দরকার যে প্রস্তুত করার সময় প্রচুর চুন ব্যবহার করায় পার্চমেন্টের মধ্যে যে ক্ষারধর্মী আবেশের সৃষ্টি হয়, তারফলেই অম্ল আবহাওয়াতেও এটি চামড়ার তুলনায় অনেক কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

নানা পুঁথিপত্রে যদিও পার্চমেন্ট তৈরীতে নানাধরণের পশুচামড়ার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, ছাগল, ভেড়া এবং বাছুরের চামড়াই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হ'ত। চামড়ার তুলনায় পার্চমেন্ট বেশী জল শুষে নেয় এবং অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সেজন্য পার্চমেন্ট কখনও ধোয়া উচিত নয়—খুব দরকার হলে ভেজা স্পঞ্জ দিয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে এবং শুকনো আবহাওয়ায় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে নিতে হবে।

পার্চমেন্টের সংরক্ষণের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী তাপমাত্রা হচ্ছে ১৫° থেকে ২০° সে এবং আনুপাতিক আর্দ্রতা ৬০%। যদি অত্যধিক শুষ্কতার জন্য পার্চমেন্ট খুব শুকনো এবং প্রায় ভঙ্গুর অবস্থায় পেঁ'ছে যায়, তবে সেঁতসেঁতে দুটি ব্লটিং কাগজের মধ্যে কিছুক্ষণ সেটা রেখে দিতে হবে যাতে সেটি আর্দ্রতা শুষে নিয়ে খানিকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

চামড়া

গত শতাব্দী পর্যন্ত বইয়ের বাঁধাইয়ের মুখ্য আবরক উপাদান ছিল চামড়া। এইভাবে ব্যবহারের জন্য আগে কাঁচা চামড়া থেকে মাংস ও লোম সরিয়ে দিয়ে তৈরী চামড়া প্রস্তুত করা হয়, এই পদ্ধতিকে ট্যানিং করা বলে। হাজার বছর আগেও ভেষজের ব্যবহারের মাধ্যমে চামড়া ট্যানিং প্রক্রিয়া জানা ছিল। ঐসব ভেষজের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ গাছের ছালের নির্যাস, কয়েক ধরণের ফল ভিজিয়ে রেখে সেটা থেকে সংগৃহীত নির্যাস ইত্যাদি ব্যবহার করা হ'ত। প্রাচীন কালে বড় বড় পাত্রে ঐ ধরণের ভেষজ ও কাঁচাচামড়া সাজিয়ে নেওয়া হ'ত এমন ভাবে, যাতে চামড়ার উপর একস্তর ভেষজ থাকে তারপর আবার চামড়া তারপর ভেষজ। এভাবে সাজানোর পর পাত্রটি জলদিয়ে ভরে দেওয়া হ'ত। কিছুদিন পর পর ভেষজগুলো পাল্টে আবার আগের মত সাজিয়ে রাখা হ'ত। ঐ ভেষজের প্রধান রসায়ন—ট্যানিন, চামড়ার মধ্যের প্রোটিনের উপর এমনভাবে কাজ করে, যাতে এর ভিতরের সবটুকু জল বের হয়ে যায় এবং এর অনুগুলি (mole-

cules) সন্নিবন্যস্থ অবস্থায় পেঁৗছে যায়। ফলে কাঁচা চামড়া পাকা চামড়ায় রূপান্তরিত হয়, যেটা ব্যবহারের পক্ষে অনেকবেশী উপযোগী, নমনীয় এবং বেশী মাত্রায় জলপ্রতিরোধক। এই ট্যানিং পদ্ধতি কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম কাঁচা চামড়া ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয় তারপর এর উপরকার লোমগুলোকে ছাড়ানো হয় চুনের সাহায্যে। এভাবে চামড়া থেকে মাংস, লোম ইত্যাদি ছাড়িয়ে ফেলার পর গাছের ছালের নির্যাসে নির্দিষ্ট সময় ভিজিয়ে রাখা হয়। সবশেষে এটিকে শুকিয়ে প্রয়োজন মত রং করে ব্যবহারোপযোগী করে নেওয়া হয়। সেকালে এই পদ্ধতিতে একটা চামড়া ভাল ভাবে তৈরী করতে প্রায় দেড় বছর অর্থাৎ আঠারো মাস সময় লাগত, কিন্তু সেই তৈরী চামড়া হ'ত অত্যন্ত উচুমানের—যেমন ঝকঝকে তেমনই স্থায়ী এবং শক্ত সমর্থ। এভাবে তৈরী চামড়ার উপর পরিবেশজনিত ক্ষতিকারক পদার্থের—যথা অম্লতার প্রভাব অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এরকারণ এভাবে তৈরী করার সময় ব্যবহৃত কিছু ভেষজ রসায়ন ঐ চামড়ার মধ্যে থেকে যায়, যেটা পরবর্তী সময়ে দূষিত পরিবেশজনিত ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে একে রক্ষা করে।

কিন্তু গত শতাব্দী থেকে চামড়ার চাহিদা এত দ্রুত বাড়তে সুরু করে যে, এই ধরণের শ্লথ পদ্ধতি ক্রমশ যুগের পক্ষে অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। যুগের চাহিদার তাগিদে সুরু হয়—নতুন চামড়া তৈরী পদ্ধতি, যাতে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে আগের তুলনায় দেখতে আরো চক্‌চকে চামড়া আরো অনেক অল্প সময়ের মধ্যে তৈরী করা সম্ভব, কিন্তু গুণগত মানের বিচারে এই চামড়া সবদিক থেকেই অনেক নীচু স্তরের।

চ্যামড়া ট্যানিং ছাড়াও আরো দুভাবে তৈরী করার পদ্ধতি দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। এই দুই পদ্ধতি যথাক্রমে টওয়িং (towing) যাকে আমরা রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলতে পারি; অপরটি স্যাময়িং (chamoising), যাকে আমরা তেল সহযোগে চামড়া তৈরীর প্রক্রিয়া বলতে পারি। এই দুটি প্রক্রিয়া সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার।

রাসায়নিক উপায়ে চামড়া তৈরী পদ্ধতি (Towing): এটি একটি অত্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতি। এতে ৩ ভাগ ফটকিরি (alum) এবং ১২ ভাগ লবণ একসঙ্গে জলে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরী করা হয়। এই মিশ্রণে ১০-১৫ মিনিট কাঁচা চামড়া ডুবিয়ে রেখে তার পর শুকিয়ে নেওয়া হয়। সাধারণত ছাগল এবং ভেড়ার চামড়াই এভাবে তৈরী করা হয়। এই পদ্ধতিতে তৈরী চামড়ার রং

সাদা হয় এবং অত্যন্ত ভালভাবে নানা রংএ রং করা চলে। তৈরী হবার পরই এটি একটু খস্‌খসে ও কিছুটা অনমনীয় থাকে। কিন্তু সাধারণত তৈরীর পরে এটি নানাভাবে টানাটানির মাধ্যমে নমনীয় করে তোলা হয়। এই পদ্ধতিতে পাওয়া চামড়াকে পাকা চামড়া সঠিকভাবে বলা চলে না, কারণ ঐ তৈরী চামড়া গরম জলে ভালভাবে ধুয়ে নিলে আমরা আবার কাঁচা চামড়া ফিরে পাব। একারণে এইভাবে তৈরী চামড়া পরিষ্কার করার জন্য জলে ধোয়া উচিত নয়—তার পরিবর্তে জলরহিত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

১৮৮৮ সালের পর এই পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে যখন থেকে ক্রোমিয়াম যৌগের ব্যবহার সুরু হয়েছে। পরবর্তীকালে আরো কয়েক ধরণের ধাতুর যৌগ এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাছুরের চামড়া এবং অন্যান্য চামড়া যেগুলো জলপ্রতিরোধক সেগুলো এই পদ্ধতিতে তৈরী করা সম্ভব। এইভাবে তৈরী চামড়া জুতো, পোষাক তৈরী ইত্যাদির জন্যে ব্যবহার করা হয়। এই চামড়া ব্যবহারের পক্ষে খুবই ঠেকসই, স্থায়ী এবং এটি কিছুতেই ভঙ্গুর হয়ে গুঁড়িয়ে যায় না, যা রেড রট (Red rot) নামে পরিচিত। ক্রোমিয়াম যৌগ ব্যবহারে তৈরী চামড়া গরম এমন কি ফুটন্ত জলেও ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। কিন্তু এই চামড়া বই বাঁধাইয়ের জন্য ব্যবহার করা যায় না। চামড়ার রং সম্পূর্ণ সাদা হয় না। গত প্রায় ৯০ বছর ধরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ক্রোম পদ্ধতি। আধুনিককালে সাদা চামড়া পাবার জন্য জিরকোনিয়াম যৌগের সাথে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী ট্যানিন্‌ ব্যবহার করা হয়।

স্যামীয়ং বা তেল সহযোগে চামড়া তৈরী প্রক্রিয়া (Chamoising) ঃ এই পদ্ধতি মধ্যযুগ থেকেই চালু আছে। এইভাবে তৈরী করার জন্য প্রথমে চামড়ার উপরের লোম ও বাইরের ত্বক চেঁছে ফেলা হয়, চামড়ায় যাতে সহজেই তেল ঢুকতে পারে। এবার চামড়ার ওপর কড লিভার অয়েল (Cod Liver Oil) বা অন্য কোন সামুদ্রিক প্রাণী বা মাছের দেহজ তেল ছিটিয়ে ভাল করে পেটানো হয়, তারপর আবার তেল ছিটিয়ে একইভাবে কয়েকবার পেটাই করা হয়। পরে শুকনো গরম কক্ষে রেখে চামড়া শুকানো হয়। গরমে থাকাকালীন তেলের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেনের এবং চামড়ার আঁশের বিক্রিয়া ঘটে। পরে চামড়া ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। বর্তমানে ভেড়ার চামড়া এইভাবে তৈরী করা হয়—আগে হরিণের চামড়াও এইভাবে তৈরী করা হ'ত। এই চামড়া হাল্কা

হলদে রং এর হয়। ব্যাগ, পোষাক ইত্যাদি তৈরী করতে এর ব্যবহার হয়। এই চামড়া অত্যন্ত টেঁকসই এবং শক্ত। জলে এটা সহজেই ধোয়া সম্ভব, আবহাওয়ার প্রভাবে ভঙ্গুর হয়ে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া, যাকে রেড রট (Red rot) বলা হয়, তা এক্ষেত্রে কখনই ঘটে না।

১৮১৩ সাল থেকে আস্তে আস্তে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যবহার সুরু হয়—মাংস, লোম ইত্যাদি পরিষ্কারের জন্যে। ১৮৭৫ সাল থেকে ভেষজ রসায়নের ব্যবহারের মাধ্যমে শ্লথ ট্যানিং পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ-ভাবে সরিয়ে দিয়ে নতুন পদ্ধতি সর্বত্র চালু হয়ে যায়, কারণ এই পদ্ধতি অনেক দ্রুততর। এভাবে পরিশোধিত চামড়া সহজে অ্যালিলিন রং-এর সাহায্যে রং করা চলে। কিন্তু সেই সাথে বেড়ে যায় গ্রন্থাগারের সংরক্ষণের সমস্যাগুলি। নতুন পদ্ধতিতে তৈরী চামড়ার মধ্যে অল্প পরিমাণে অনিষ্কাশিত অ্যাসিডের অংশ থেকে যায়, যেটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুরু করে দেয় এর ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া চামড়াকে আক্রমণের মাধ্যমে, যার ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই চামড়াকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। কারণ তখন চামড়ার পরিবেশের সালফার ডাই-অক্সাইডের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় থাকে না—চামড়া আস্তে আস্তে খসখসে, এবং শুকনো হয়ে পড়ে এবং শেষে গুঁড়ো হয়ে যায়।

বাঁধাইয়ের উপযোগী চামড়া—অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঁধাইয়ের জন্য মুখ্যতঃ বাছুরের চামড়ার ব্যবহারই চালু ছিল, কারণ সেটা ছিল সহজলভ্য এবং অলঙ্করণেব সহায়ক। গরুর চামড়া সাধারণত মোটা ও শক্ত। এই চামড়াকে দুই বা তিন স্তরে কেটে নিয়ে তবে সেটা বাঁধাইয়ের বা আনুসাঙ্গিক অলঙ্করণের জন্য ব্যবহৃত হয়। শুয়োরের চামড়া খুব বড় এবং মোটা বইয়ের ক্ষেত্রেই শুধু ব্যবহার করা হয়, কারণ এটি খুবই মোটা ও খসখসে, কিন্তু অত্যন্ত টেকসই—দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে।

ছাগলের চামড়া নানা ধরণের হয় এবং নানা নামে সেগুলি পরিচিত—যেমন মরক্কো, নিগার, কেপ, পারসিয়ান, লেভান্ট ইত্যাদি। এই সব চামড়া অত্যন্ত উচ্চমানের এবং বই বাঁধাইয়ের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। এগুলো নরম অথচ টেকসই এবং যদি ভেষজ রাসায়নিকে ট্যান করা হয়, তবে কয়েক শতাব্দী অক্ষত থাকে। এগুলো অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে সুন্দর রং করা যায়। কিন্তু এটি অপেক্ষাকৃত বেশী দামী।

বাছুরের চামড়ার পরই বই বাঁধায়ের ক্ষেত্রে যে চামড়ার বেশী ব্যবহার হয়, সেটি ভেড়ার চামড়া, কারণ এটিও বাজারে সহজলভ্য এবং সস্তা। দেড় শতাব্দী আগে যখন কলে (মিলে) কাপড় বানানো সুরু হয়নি বা পেপারব্যাক বইয়ের প্রচলন হয়নি, তখন বই বাঁধায়ের কাজে এটি ছিল সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এটি নরম কিন্তু বেশী টেকসই নয় অতএব সূক্ষ্ম এবং সৌখিন বাঁধাইয়ে এর ব্যবহার অবিধেয়। চেহারা অনেকটা একরকম অথচ দামে সস্তা হওয়ায়, অপেক্ষাকৃত দামী ছাগলের চামড়ার ভেজাল/বিকল্প হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গ্রন্থাগার সংগ্রহে ব্যবহৃত চামড়ার জন্য বিশেষ পরিচর্যা

গ্রন্থাগারের চামড়ার বাঁধাইয়ে যাতে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া না ঘটে—সেজন্য কয়েকটি পরিচর্যার ব্যবস্থা সাধারণভাবে সর্বত্র চালু আছে।

সাধারণত চামড়ার বাঁধাইয়ের পরিচর্যায় মোমের ব্যবহার করা হয়। এই মোম ছয়টি বিভিন্ন রং-এ পাওয়া যায়—সাদা (চামড়ার নিজস্ব রং-এর জন্য), নীল, কালো, লাল, সবুজ এবং মেরুন। অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং ভালমানের চামড়ার জন্য সাদা রংই বেশী ব্যবহার করা হয়। অন্য রঙ্গীন চামড়ার জন্য অন্যান্য যথাযথ রং। সূক্ষ্ম নরম কাপড়ের উপর খুব অল্প পরিমাণে মোম লাগিয়ে সেটা খুব তাড়াতাড়ি চামড়ার উপর দিয়ে বুলিয়ে নেওয়া হয় যাতে খুব সূক্ষ্ম একটা প্রলেপ চামড়ার উপর লেগে থাকে। মিনিট পনেরোর মধ্যে এটি শুকিয়ে যাওয়ার পর চামড়াটা পালিশ করে নিলে বেশ চক্‌চকে দেখায়। শুধুমাত্র চামড়ার বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রেই মোমের ব্যবহার করা চলে।

পৃথিবীর বিভিন্ন বড় গ্রন্থাগারে চামড়ার পরিচর্যার জন্য বিবিধ মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়, গ্রন্থাগারের নামেই এগুলি বেশী পরিচিত—যেমন বৃটিশ মিউজিয়াম, ভারতের জাতীয় মহাফেজখানা (ন্যাশন্যাল আরকাইভস্‌), আমেরিকান লাইব্রেরী অব কংগ্রেস ইত্যাদি। এগুলি ছত্রাক বা কীটপতঙ্গের হাত থেকে চামড়াকে যে শুধু রক্ষা করে তাই নয়—পরিবেশের ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া বা কালের নিজস্ব ক্ষয় থেকে রক্ষার ব্যাপারেও এটি সহায়ক।

বৃটিশ মিউজিয়মের পরিচর্যার মিশ্রণ

এটি নীচের উপকরণগুলি দিয়ে তৈরী করা হয়।

হেক্সেন (Hexane)	১১ আউন্স	(৩১২ গ্রাম)
জলবিহীন ল্যানোলিন	৭ ,,	(১৯৮.৫ ")
সিডার উড তেল	১ ,,	(২৮.৪ ")
মৌচাকের মোম	½ ,,	(১৪.২ ")

হেক্সেন একধরণের পেট্রোলিয়াম ঘটিত পদার্থ। মিশ্রণে এটি দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রথমে গরম পরিবেশে মোম হেক্সেনের সাথে মেশানো হয়। হেক্সেন যেহেতু অত্যন্ত দাহ্য এবং সহজেই বাষ্পীভূত হয়, সেহেতু লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এটি আগুনের সংস্পর্শে বা কাছাকাছি না আসে। এবার এর সাথে সিডার উড তেল মেশাতে হবে। সবশেষে জলবিহীন ল্যানোলিন ঈষৎ গরম করে, যখন সেটি তরল হয়ে যাবে, সেটিকে মিশিয়ে দিতে হবে মিশ্রণে। প্রতিবার ব্যবহারের আগে মিশ্রণটি ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। ল্যানোলিন জৈব তেল হওয়ায় চামড়া এটিকে সহজেই শুষে নেয় এবং এর ফলে চামড়া নরম এবং মসৃন থাকে এবং এর পচন রোধ হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় এটি থক্‌থকে পাতলা মলমের মত এবং ঠিকমত ব্যবহার না করলে এটি চামড়ার উপর দাগ ফেলতে পারে। মিশ্রণে সামান্য মোম মেশানোর কারণ হচ্ছে যাতে এটি সহজেই চক্‌চকে করা চলে এবং ফেটে যাওয়া বা গুঁড়ো হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করা যায়, বিশেষ করে ভেলামের বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে। সিডার উড তেল তার সর্বজনবিদিত সংরক্ষণোপযোগী গুণ ছাড়াও এটি মিশ্রণের ল্যানোলিন এবং মোমকে ভালভাবে মিশতে সাহায্য করে। হেক্সেনে যেহেতু সহজেই মৌচাকের মোম গলে যায়, সেহেতু এটিকে দ্রাবক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

এটি লাগাবার আগে সব বইয়ের বাঁধাইয়ের অংশটি সাবান জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর গরম ঘরে দু'তিন দিন রেখে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর মিশ্রণটি ঘষে ঘষে লাগাতে হবে। লাগানোর পর চামড়াকে তেলতেলে মনে হবে কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা অর্থাৎ দুদিনের মধ্যে ল্যানোলিন চামড়ার মধ্যে ঢুকে যাবার পর সহজেই চামড়াকে চক্‌চকে করে তোলা যায়। এটি ব্যবহারের ফলে চামড়া অপেক্ষাকৃত নরম এবং তাজা থাকে। শুকনো আর খস্‌খসে হয়ে যায় না।

ভারতের জাতীয় মহাফেজখানার (ন্যাশনাল আরকাইভ
ব্যবহৃত মিশ্রন

এই মিশ্রণটি মোটামুটি বৃটিশ মিউজিয়ামের মিশ্রণের মতই একই উপাদানে তৈরী। শুধুমাত্র পরিমানে অল্প হেরফের করা হয়েছে এবং মোমের বদলে বেনঞ্জিনের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

হেক্সেন	১১ আউন্স	(৩১২ গ্রাম)
সিডার উড তেল	১ ,,	(২৮·৪ ,,)
জলহীন ল্যানোলিন	৯ ,,	(২৫৫ ,,)
বেনঞ্জিন	½ ,,	(১৪·২ ,,)

আমেরিকার লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের চামড়ার পরিচর্যা মিশ্রণ

সব মিশ্রণের মধ্যে এটি অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয়। এটি তৈরী করতে যে সব উপাদানের ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে—

নীট্‌স ফুট অয়েল	২৫ আউস	(৭১৮·৮ গ্রাম)
জলবিহীন ল্যামোনিন	১২ ৫ ,,	(৩৫৪·৪ ,,)
জাপানী মোম (বিশুদ্ধ)	১০ ,,	(২৮৩ ৫ ,,)
সোডিয়াম ষ্টেরেট গুঁড়ো	২·৫ ,,	(৭১ ,,)
ডিস্‌টিল ওয়াটার	৪৫ ,,	(১২৭৫·৮ ,,)

প্রথমে নীটস ফুট অয়েল, মোম এবং ল্যানোলিন একসাথে গরম করে মিশিয়ে নিতে হবে। অন্য আরেকটা ঢাকা পাত্রে জলের মধ্যে সোডিয়াম ষ্টেরেট ঢেলে মিশাবার জন্য গরম করতে হবে। সম্পূর্ণ মিশে যাবার পর প্রথম মিশ্রণটি গরম করতে করতে তাতে জলের মিশ্রণটি আস্তে আস্তে ঢালতে হবে। ঢাল্যার সময় মিশ্রণটি ক্রমাগত নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে ভাল ভাবে মিশে যায়। মিশে যাবার পর, ক্রমাগত নাড়াচাড়া করতে করতে ঠাণ্ডা করতে হবে যাতে দুটি মিশ্রণ আলাদা না হয়ে যায়। সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর সাদাটে মলমের মত মিশ্রণটি মুখআটা কাচের পাত্রে রেখে দিতে হবে।

চামড়ার উপর প্রয়োগের জন্য নরম কাপড়ের টুকরো বা চ্যাপটা ব্রাস অথবা কাপড়ের প্যাড দিয়ে চামড়ার উপর সূক্ষ্ম প্রলোপ দিতে হবে।

গ্রন্থাগার সংরক্ষণে মুদ্রণের ভূমিকা

গ্রন্থাগার সংরক্ষণের ব্যাপারে কাগজ বা অন্যান্য মাধ্যমের যেমন নিজস্ব একটি প্রভাব আছে ঠিক তেমনি মুদ্রণেরও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। কোন লেখা, ছবি অথবা অন্যকিছুর সম্পূর্ণ অনুরূপ প্রতিলিপিকরণই মুদ্রণ।

মুদ্রণশিল্পের ইতিহাস প্রায় কাগজশিল্পের ইতিহাসের সমসাময়িক। মুদ্রণের সূত্রপাত চীন দেশে। সন্দেহ করা হয় যে পাথরের দেওয়ালের নক্সার ওপরে রং লাগিয়ে সেটা থেকে কাগজে অথবা কাগজ জাতীয় জিনিষের ওপর ছাপ তোলা থেকেই মুদ্রণ শিল্পের জন্ম। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনে মুদ্রণের প্রযুক্তি জানা ছিল বলে মনে করা হয়। মুদ্রণের জন্য প্রয়োজন তিনটি উপকরণের (ক) কাগজ অথবা অনুরূপ উপযুক্ত মাধ্যম (খ) কালি (গ) ছাঁচ অথবা অনুরূপ দ্রব্য যার ওপর মুদ্রণের চিত্র অথবা লেখাটি উপযুক্তভাবে খোদাই করা থাকে।

মনে করা হয়, শ্বেতপাথরের ধর্মমন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ ধর্মোপদেশের (বৌদ্ধ ধর্মের) উপর ভেজা কাগজ প্রযোগ করে, যে সব অংশ পাথরের সংস্পর্শে রয়েছে, সেগুলোকে কালিতে চিত্রিত করে প্রথম (আদি) মুদ্রণের সূত্রপাত। এর পরে বোধহয় মোহর (seal) ব্যবহার মুদ্রণের পরবর্তী ধাপ।

চীন দেশে মোম মাখানো কাঠের ওপর প্রথমে লিখে নিয়ে পরে সেটাকে খোদাই করার মাধ্যমে মুদ্রণের উপযোগী ব্লক (block) তৈরী করা হ'ত। মুদ্রণের সুবিধা হচ্ছে, এর মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে নিখুঁত অনুলিপি প্রস্তুত করা সম্ভব। কাঠের ব্লকের মাধ্যমে ছাপার প্রাচীনতম যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে সেটি জাপানে এবং সম্ভবত ৭৭০ খৃঃ নাগাদ প্রস্তুত। প্রাচীনতম ব্লকে ছাপা বই যার মধ্যে মুদ্রণকালের উল্লেখ পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে, চীনাভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থের অনুবাদ, যেটি ডায়মন্ড সূত্র (Diamond Sutra) নামে পরিচিত এবং ৮৬৮ খৃীঃ মুদ্রিত। এটি ১৯০০ খৃঃ চীন দেশের তুর্কিস্থানের তুনহুয়াং অঞ্চলের হাজার বুদ্ধের গুহা থেকে আবিষ্কৃত হয় এবং বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। এই ধরণের ছাপার ক্ষেত্রে একেকটি পৃষ্ঠা একটি

ব্লকের মাধ্যমে ছাপা হ'ত। অন্যান্য সব প্রযুক্তির মতই এই ব্যাপারেও নানাধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। চীনদেশেও তার ফলশ্রুতি হিসাবে কাঠের অপসারণ যোগ্য অক্ষরের (movable type) মাধ্যমে মুদ্রণের কিছু কিছু কাজও হয়, কিন্তু এই ব্যপারে বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি। এর পিছনে যে কারণটি কাজ করে-ছিল সেটি বোধ হয় এই যে চীনা ভাষায় মোট অক্ষরের সংখ্যাধিক্য। সেদিক থেকে রোমান বা অনুরূপ অন্যান্য ইউরোপীয় বর্ণমালার সংখ্যা সীমিত (২৬টি) হওয়ায় অপসারণযোগ্য অক্ষরের মাধ্যমে মুদ্রণ ব্যবস্থার পক্ষে অধিক উপযোগী। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কোরিয়ার সম্রাট তাই ঝোঙ্গ এর (Htai Tjong) আদেশে এবং আনুকুল্যে ছাপার উপযোগী ধাতব অক্ষর প্রস্তুত করা হয় (১৪০৩ খৃী)। কিন্তু আধুনিক মুদ্রণশিল্পে অপসারণযোগ্যে ধাতব অক্ষরের ব্যাপক এবং যথাযথ ব্যবহার সুরু হয় ইউরোপে। চীন বা কোরিয়া অথবা তার সন্নিহিত এলাকায় ধাতব অক্ষর ব্যবহারে ছাপা বেশিদিন চলেনি, কারণ এর ব্যবহারের মাধ্যমে ছাপার জন্য মুদ্রণ যন্ত্রের যেসব পরিবর্তন বা উন্নতির প্রয়োজন ছিল সেগুলো ঘটেনি।

১৪৩০ খ্রীঃ ধাতব অক্ষরের মাধ্যমে হল্যাণ্ডে ছাপার যে প্রচলন ছিল সেটা জানা গেলেও আধুনিক মুদ্রণ শিল্পের ক্ষেত্রে জোহানেস গুটেনবার্গ (Johannes Guttenberg) এর অবদান অপরিসীম। তিনি কেবলমাত্র ধাতব অক্ষর তৈরীতে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন, তাই নয়—মুদ্রণ যন্ত্রের নানা রদবদলের মাধ্যমে অপসারণ যোগ্য অক্ষরের সাহায্যে ছাপার ব্যাপারে এটিকে আরো উপযোগী করে তোলেন। এরই সাথে নিজে ছাপাখানা স্থাপনের মাধ্যমে এই শিল্পকে সমাজের কাছে পরিচিত করার প্রয়াস পান। প্রথম যুগের মুদ্রিত বইএর মধ্যে ফরটিটু লাইন বাইবেল (Forty-two Line Bible) খুবই বিখ্যাত। গুটেনবর্গের যুগে যে মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহার করা হ'ত, সেটা ছিল কাঠের তৈরী।

গুটেনবার্গের পরবর্তী প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর ধরে মুদ্রণ যন্ত্র এবং মুদ্রণ শিল্পের নানা ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে, যার ফলে কাগজের উপর সর্বত্র সমান চাপ, সমানভাবে কালির সরবরাহ, অপেক্ষাকৃত দ্রুত ছাপানোর ব্যবস্থাদি সম্ভব হয়।

১৭৯৫ খৃীঃ ইংল্যান্ডে প্রথম সম্পূর্ণ ধাতুনির্মিত মুদ্রণ যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়। সেই সাথে প্রযুক্তিরও নানাধরণের উন্নতি সাধিত হয়। ১৮১৪ সালে

প্রথম সার্থকভাবে ঘূর্ণীয়মান রোলারের মাধ্যমে (যার গায়ে বিশেষ উপায়ে অক্ষর লাগানোর ব্যবস্থা থাকে) ক্রমান্বয়ে কাগজের দুই দিকে ছাপার ব্যবস্থা করা হয়—এই ধরণের একটি যন্ত্র লণ্ডনের টাইমস (Times) পত্রিকার ছাপার জন্য ব্যবহৃত হতে সুরু করে। ক্রমশ এই ধরণের যন্ত্রেরও আরো অনেক উন্নতি ঘটে, যার ফলে তৈরী হয় রোটারী মুদ্রণ যন্ত্রের এর মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ছাপা, কাগজের জোগানের ব্যবস্থা (কাগজের রোল থেকে), ছাপার পর কাগজ কেটে প্রয়োজনীয় ভাজ করে (খবরের কাগজ বিতরণের জন্য তৈরী অবস্থায় বের হয়ে আসে।

মুদ্রণ যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ছাপার কাজ দরকার মত অক্ষর সাজানোর (composition) ব্যাপারে যান্ত্রিক সহায়তা গ্রহণ অনেকদিন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। ১৮১২ খৃঃ বোষ্টন শহরে উইলিয়াম চার্চ (William Church) প্রথম একটি যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন যেটিতে টাইপ যন্ত্রের অনুরূপ একটি Key board এর সাহায্যে প্রয়োজনীয় অক্ষরগুলি ছাঁচে ঢালাইয়ের ব্যবস্থা ছিল—ফলে প্রয়োজনীয় অক্ষরগুলি পর পর হাতের কাছে পাওয়া যেত। তারপর দরকার মত লাইনের উপযোগী অক্ষরগুলি নিয়ে নানা শব্দের (word) মধ্যে ছাড়ের জায়গা কমিয়ে বাড়িয়ে সাজিয়ে নেওয়া হ'ত (justify)। এই যন্ত্রই মনোটাইপ যন্ত্রের পূর্বসুরী। পরবর্তীকালে এরও নানা উন্নতি ঘটানো হয়েছে। নানা উৎকর্ষ সাধনের ফলে উদ্ভাবিত হয় লাইনোটাইপ যন্ত্র যাতে এককভাবে অক্ষর ঢালাই না হয়ে যথাযথভাবে সাজানো একেকটি লাইন একক হিসাবে ঢালাই করা হয়। ১৮৮০ খৃঃ আমেরিকা নিবাসী জার্মানী প্রযুক্তিবিদ অট্মার্ ম্যারজেনথালার (Ottman Mergenthaler) এই যন্ত্র তৈরী করেন। ১৮৮৫ খৃঃ আমেরিকায় টলবার্ট ল্যান্সটন (Tolbert Lanston) প্রথম মনোটাইপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন যার মাধ্যমে অক্ষরের এককে টাইপ ঢালাই হলেও, যন্ত্রের মাধ্যমেই লাইন যথাযথভাবে সাজিয়ে তৈরী হয়ে যায়। এখনকার মনোটাইপ যন্ত্রে একধরণের কাগজের ফিতে ব্যবহৃত হয় যার মধ্যে ছিদ্র করার মাধ্যমে অক্ষর নির্বাচন করা হয়। লাইনো টাইপের তুলনায় মনোটাইপ অপেক্ষাকৃত দ্রুততর ছিল (ঘণ্টায় ১২,০০০ অক্ষর ঢালাইয়ে সক্ষম ; লাইনোটাইপে ঐ একই সময়ে ৭০০০ অক্ষর ঢালাই করা সম্ভব)।

ক্রমাগত যন্ত্রের নানা উন্নতি যখন হচ্ছিল ঠিক সেই সময় ছাপার বিভিন্ন নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনও ঘটছিল। প্রথম যুগে নক্সা বা ছবি ছাপার

ব্যাপারে কাঠের উপর খোদাই করা ব্লককে পৃষ্ঠার অন্যান্য লেখার সঙ্গে একই সাথে জুড়ে যন্ত্রে ছাপানো সুরু হয়। এইভাবে ছবি ছাপাকে জাইলোগ্রাফি (Xylography) বলে। এরপর এলো ধাতব পাতে বিশেষ উপকরণের সাহায্যে ছবি ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা—যার মাধ্যমে ঐ পাতের মধ্যে ছোট ছোট নানা আকারের ও গভীরতার গর্ত সৃষ্টি করে। ছাপার জন্য যখন কালি ঐ পাতের উপর লাগানো হয়, তখন ঐ সব অঞ্চলে বিভিন্ন পরিমাণ কালি লেগে থাকে (বাড়তি কালি ধাতব পাতের সাহায্যে চেঁছে ফেলা হয়) পরে চাপের সাহায্যে ছাপার সময় ঐ কালির পরিমাণের হেরফেরের মাধ্যমে সুন্দরভাবে ছবিটা ফুটে উঠে। এই পদ্ধতিকে ইণ্টাগ্লিও (Intaglio) পদ্ধতি বলে।

তেল আর জল কখনও মেশে না, এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে পরবর্তী মুদ্রণ পদ্ধতি লিথোগ্রাফী ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে উদ্ভাবিত হয়। এতে এক বিশেষ ধরণের মসৃণ পাথরের ওপর তৈলাক্ত কালিতে নকসা অথবা ছবিটি আঁকা হয়, তারপর অল্প জলে পাথরের তলটি ভিজিয়ে তার উপরে ছাপার কালি ব্যবহারের মাধ্যমে কাগজে ছাপা হয়। এই পদ্ধতিতে পরবর্তীকালে পাথরের পরিবর্তে জিংকের পাতের ব্যবহার চালু হয়। এইভাবে ছাপার জন্য বিশেষ ধরণের মুদ্রণ যন্ত্রও প্রস্তুত করা হয়।

লিথোগ্রাফীর ক্ষেত্রে আরো উন্নততর পদ্ধতির প্রয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করার সময় ১৮২০ খৃঃ জোসেফ নিসপোর নিপ্‌স (Joseph-Nicephore Niepce) লক্ষ্য করেন যে কয়েকধরণের রাসায়নিক যৌগ আছে যারা আলোক সচেতন। এইতথ্য নজরে আসার পর সেটা থেকে প্রথমে আলোকচিত্রগ্রহণ অর্থাৎ ফটোগ্রাফী এবং পরে মুদ্রণে ঐ প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন প্রয়োগ ঘটে।

১৮৫২ সালে বৃটিশ বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম হেনরী ফক্স ট্যালবট্ (William Henry Fox Talbot) ধাতব পাতের উপর আলোকসচেতন রাসায়নিক প্রয়োগের পর প্রথমে আলোক রশ্মি এবং পরে অ্যাসিডের ব্যবহারে ক্ষয়ের মাধ্যমে মুদ্রণ কাজে ব্যবহারোপযোগী ব্লক তৈরী করেন। এই পদ্ধতিই ফটো এচিং (Photo etching) নামে পরিচিত। পরবর্তী কালে ১৮৮০ সালে সমান সমান্তরাল রেখা সম্বলিত দুটি কাচের পাত (sheet) আড়াআড়িভাবে

রেখে তার মাধ্যমে আলোক সম্পাত করে এই পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হয়, যার ফলে হাফটোন এবং অন্যান্য ছবি ছাপার ব্যবস্থা সম্ভব হয়।

লিথোগ্রাফীর উন্নয়নের কাজকর্ম যখন চলছিল, ঠিক তখনই আরেকদিকে অফ্‌সেট মুদ্রণের উদ্ভাবন ঘটে। অফ্‌সেট মুদ্রণের উপযোগী মুদ্রণ-যন্ত্র তৈরী হবার পর ১৮৭৮ নাগাদ প্রাথমিকভাবে মুখ্যতঃ পাতলা টিনের পাতের উপর ছাপার কাজে এর ব্যবহার সুরু হয়। পরবর্তীকালে কাগজ ছাপার জন্যেও এর ব্যবহারের প্রচলন হয়। এই পদ্ধতিতে ছাপার সময় ছাপার টাইপ বা ব্লক কখনই যার উপর ছাপা হচ্ছে, তার সংস্পর্শে আসে না। ব্লক বা টাইপ থেকে প্রতিচ্ছবি কোন রবারে আবারিত রোলারে স্থানান্তরিত হয়, যেটি থেকে কাগজ বা অন্য উপযুক্ত মাধ্যমের উপর ছাপা হয়।

১৯০৪ সালে আমেরিকান মুদ্রাকর আই ডবল্যু রুবেল অফসেট যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি করেন তিনটি সিলিন্ডারের ব্যবহারের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতির আরো অনেক উন্নতি ঘটেছে, যার ফলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ছাপা সম্ভব হচ্ছে অনেক কম সময়ে।

মুদ্রণ যন্ত্র এবং পদ্ধতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ছাপার জন্য অপসারণযোগ্য অক্ষর সাজানোর ব্যাপারেও নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে মুদ্রণ শিল্পের প্রথম যুগ থেকেই। মনোটাইপ পদ্ধতির উদ্ভাবনের ফলে যান্ত্রিক উপায়ে দ্রুততরভাবে অক্ষর সাজানো অথবা কম্পোজিশন সম্ভব হয়।

১৯২৯ সালে আমেরিকায় উদ্ভাবিত টেলি-টাইপসেটার কম্পোজিটর যন্ত্রের মাধ্যমে একটি ফিতার উপর গর্ত করার মাধ্যমে নানা অক্ষর সূচিত হয়, অপর একটি যন্ত্রের সাহায্যে যেটি থেকে নির্দিষ্ট অক্ষরগুলি ঢালাইসহ জাষ্টিফাই হওয়া অবস্থায় পাওয়া যায়। এই যন্ত্রের ক্ষমতা প্রতি ঘণ্টায় ২০,০০০ অক্ষর।

১৯৫০ সালে ফ্রান্সের তিন বৈজ্ঞানিক যৌথভাবে উপরোক্ত পদ্ধতির সঙ্গে কম্পিউটার যন্ত্রের সহযোগীতায় অপেক্ষাকৃত দ্রুততর আরেক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন, যাতে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৩,০০,০০০ অক্ষর সাজানো সম্ভব। এই পদ্ধতিতে কম্পিউটার প্রতিটি লাইনের আকার এবং প্রয়োজনে শব্দ কিভাবে ভাগ করা হবে ইত্যাদি স্থির করে। পরবর্তীকালে ১৯৬০ সাল নাগাদ ফিতার উপর গর্ত করার মাধ্যমে অক্ষর সাজানোর বদলে, এই কাজে ম্যাগনেটিক টেপ অর্থাৎ চৌম্বক ফিতার ব্যবহার সুরু হয়, যার ফলে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৩৬,০০,০০০ অক্ষর সাজানো সম্ভব হয়।

যখন প্রথম ফটোগ্রাফী প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়, তার কিছুদিন পর থেকেই এই নতুন প্রযুক্তি মুদ্রণেব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা সেটা নিয়ে নানা চিন্তাভাবনা করা সুরু হয়। কিন্তু প্রথম যুগে এব্যাপারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। যদিও ১৯১৫ সালে মুদ্রণ শিল্পে ফটোগ্রাফির প্রাথমিক কিছু প্রয়োগ সুরু হয় কম্পোজ করার ক্ষেত্রে, কিন্তু এই ব্যাপারে দ্রুত প্রগতি সুরু হয় ১৯৪৭ সালের পর। সংক্ষেপে, এই প্রগতির ফলে যেটা সম্ভব হয়েছে সেটা হচ্ছে—আমরা ছাপার ব্যাপারে ধাতব অক্ষরের ব্যবহার কোন স্তরে না করেও ছাপার কাজ সুষ্ঠুভাবে এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুত পারতে পারছি। এখানে ফটোকম্পোজিং মেসিনে (যেটি দেখতে কতকটা লাইনোটাইপ অথবা মনোটাইপ যন্ত্রের মতই (key board সম্বলিত) অক্ষর সাজানোর বদলে ছবি তৈরী করা হয়। এই যন্ত্রের উন্নততর প্রতিরূপে (model) আমরা দেখতে পাই যে চৌম্বক ফিতার ব্যবহারের মাধ্যমে এবং যন্ত্রের চলমান যন্ত্রাংশ (movab'e parts) কমিয়ে এনে এমন একটা পর্যায় পেঁছানো সম্ভব হয়েছে, যাতে এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা চলে অদূরে ভবিষ্যতে আরো কিছু প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ঘণ্টায় ৩,০০,০০,০০০ অক্ষর কম্পোজ করা সম্ভব হবে।

শুধুমাত্র দ্রুততর কম্পোজই আমাদের মুদ্রণ শিল্পে অগ্রগতির পথ দেখাতে পারে না, তারজন্য চাই ঐ গতির সঙ্গে সমানতালে ছাপার দ্রুততর ব্যবস্থা। ক্যাথোড রশ্মি, বেতার তরঙ্গ, স্থির বিদ্যুৎ প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে ছাপার ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন এসেছে, যেখানে কোন ধরণের চাপ প্রয়োগ ছাড়াই ছাপা সম্ভব।

মুদ্রণের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে যে সব পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যে একটি জেরোগ্রাফী। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে উদ্ভাবিত হওয়ার পর এক্ষেত্রেও নানা ধরণের উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু এর প্রয়োগ সীমিত সংখ্যক প্রতিলিপি প্রস্তুতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। দৈনন্দিন অফিসের কাজে, গবেষণার জন্য এবং অন্যান্য নানাভাবে এর ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে আজকাল। এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হয়েছে।

অত্যন্ত সংক্ষেপে মুদ্রণ-শিল্পের ক্রমোন্নতির একটা বিবরণ দেওয়া হ'ল। এবার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রাথমিক যুগে কাঠের ব্লক অথবা অক্ষর স্বাভাবিকভাবেই মানের দিক থেকে

খুব একটা উন্নত না হওয়ার ফলে সেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে যে সব ছাপা হ'ত সেগুলোর উপকরণ অর্থাৎ কাগজ অথবা অন্য অনুরূপ মাধ্যমের ভৌতিক ক্ষতিসাধিত হ'ত। ঐসময়ে ব্যবহৃত কাঠের মুদ্রণ যন্ত্রের ছাপার জন্য প্রদত্ত চাপের ফলেও ঐ একই ধরণের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকত। পরবর্তীকালে উন্নতমানের ধাতব অক্ষর এবং উন্নততর মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের মাধ্যমে এধরণের ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। অফসেট আবিষ্কারের পর ধাতব তলের সঙ্গে কাগজের কোন সংস্পর্শ না ঘটায় মাধ্যমের ভৌতিক ক্ষতির সম্ভাবনা আরো অনেক কমে যায়।

অনুরূপভাবে প্রাথমিক যুগের কালির জন্মগত অম্লতাহেতু মাধ্যমের ক্ষতি হ'ত। পরবর্তীকালে ছাপার মানের কোন হেরফের না ঘটিয়েও কালিকে অম্লতামুক্ত করা সম্ভব হয়।

মুদ্রণ শিল্পে ব্যবহৃত কালি

ছাপার কালি অথবা মুদ্রণ শিল্পে ব্যবহৃত কালিতে, অন্য তরল কালির মত: তিনটি পৃথক অংশ থাকে, যথা বাহক বা তরল অংশ, আঠা জাতীয় পদার্থ এবং রং। তরল অংশের কাজ হচ্ছে কালিকে ছাপার জন্য ব্যবহৃত অক্ষর অথবা ব্লকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সাহায্য করা। এর প্রধান উপাদান সাধারণত ভেষজ অর্থাৎ নানা ধরণের উদ্ভিজ তেল, যেগুলো সহজে ছাপার মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করতে পারে এবং অল্প সময়ের মধ্যে শুকিয়ে যায়। কখনও কখনও ভেষজ উপাদানের পরিবর্তে অন্য কোন দ্রাবকের ব্যবহার করা হয় যার প্রধান উৎস কেরাসিন তেল বা পেট্রোকেমিক্যাল ঘটিত পদার্থ। এই তরল অংশের অন্য প্রধান কাজ হচ্ছে কালির দাগ বা ছাপাকে স্থায়ী করতে সহায়তা করা। ভেষজ তেল সাধারণত বাতাসের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে অর্থাৎ অক্সিডেশনের মাধ্যমে শুকিয়ে যায় এবং কেরাসিন ঘটিত দ্রাবক বাষ্পীকরণের মাধ্যমে (evaporation) শুকোয়।

এই কালিতে ব্যবহৃত রং এরমধ্যে সাধারণত কয়েকটি ছোট ছোট কঠিন দানার আকারে অর্থাৎ পিগমেণ্ট রূপে থাকে। এগুলি নানাধরণের রাসায়নিক পদার্থ, যার অধিকাংশই জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু ব্যবহৃত দ্রাবকে আংশিক দ্রবণীয়। আবার রং-এর অন্য কয়েকটি উপাদান এমন ধরণের রাসায়নিক পদার্থে তৈরী যা জলে এবং ব্যবহৃত দ্রাবক দুইয়েতেই দ্রবণীয়। বাকী রং-এর উপাদানগুলি

পাওয়া যায় অ্যালুমিনিয়ামের অত্যন্ত সূক্ষ্ম গুঁড়োর (powder) উপর রঙ্গীন রাসায়নিকের পাতলা আস্তরণ দেওয়ার মাধ্যমে।

উপরে উল্লেখিত দুটি অংশের সঙ্গে আঠা জাতীয় পদার্থের মিশ্রণে কালি তার পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে।

কোন মাধ্যমের উপরে, কোন মুদ্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে মুদ্রণের কাজটি করা হবে, সেটির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কালির উপাদানের হেরফের ঘটিয়ে নির্দিষ্ট কালি তৈরী করা হয়।

সাধারণ লেটার প্রেসে (letter press) এবং অফসেটে ছাপার জন্য ব্যবহৃত কালি খানিকটা তেলচিটে হয়ে থাকে। ছাপার জন্য ব্যবহৃত ঘন তেলচিটে কালিতে সাধারণত ভেষজ তেলের ব্যবহার করা হয়, যার সঙ্গে শক্ত প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম রজন সহ খনিজ তেলের মিশ্রণ ঘটানো হয়। রোটারী মুদ্রণযন্ত্রে ব্যবহারের জন্য অপেক্ষাকৃত তরল তৈলাক্ত কালি তৈরী হয় মূলতঃ খনিজ তেলের উপর ভিত্তি করে।

ছাপাতে ব্যবহৃত কালির মধ্যে কালো রংএর কালির ব্যবহারই সর্বাধিক। এর রংএর প্রধান উপাদান ভুষোকালি—যেটি সংগৃহীত হয় নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় প্রাকৃতিক গ্যাস অথবা তেল জ্বালিয়ে। অন্যান্য রংএর জন্য নানা ধরণের রাসায়নিক যথা লোহা, ক্যাডমিয়াম (Cadmium), ক্রোমিয়াম (Chromium), মোলাইবডেনাম (Molybdenum) যৌগ ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে অফসেটের জন্য ব্যবহৃত রঙ্গিনকালি লেটারপ্রেসের জন্য ব্যবহৃত কালির তুলনায় অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল এবং গাঢ় রংএর হয়ে থাকে এবং এর উপর জলের প্রতিক্রিয়া প্রায় থাকেই না।

লেটারপ্রেস অথবা অফসেট যেকোন ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ ছাপার জন্য বিশেষ ধরণের কালি ব্যবহারের প্রচলন আছে। অত্যন্ত উজ্জ্বল ছাপার জন্য যে কালি ব্যবহার করা হয়, সেটিতে কৃত্রিম রজনের সঙ্গে সিসে এবং কোবাল্ট যৌগের ব্যবহার করা হয়। ঐকালি শুকোবার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। কোন কোন কালিতে এক বিশেষ ধরণের দ্রাবকের ব্যবহার করা হয় যাতে ছাপার কালি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে পারে। জেরোগ্রাফিতে ব্যবহৃত কালি (শুকনো কালি) তাপের প্রয়োগে স্থায়ী করা হয়। বিদেশে খাবারের প্যাকেট ছাপাবার জন্য এক বিশেষ ধরণের গন্ধহীন কালির ব্যবহার করা হয়, যেটিতে উপস্থিত পিগমেন্টগুলো আর্দ্রতা বা অল্প আর্দ্র কাগজের

সংস্পর্শে এসে কাগজের উপর স্থায়ী হয়ে যায়। খাবারের প্যাকেট অথবা ঐ জাতীয় কাজে ছাপার জন্য যে কালি ব্যবহার করা হয়, সেটিতে অত্যন্ত সতর্ক নজর রাখা হয়, যাতে ঐ কালিতে এমন কোন উপাদান না থাকে যা থেকে প্যাকেটে রাখা খাবার বিষিয়ে যেতে পারে। আবার বিশেষ বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহৃত বিশেষ কালিতে ছাপা অন্ধকারে / অল্প আলোতে জ্বলজ্বল করে। এই ধরণের কালিকে ফ্লুরোসেণ্ট (fluorescent) কালি বলে। ফ্লেক্সোগ্রাফিতে ব্যবহৃত কালির জন্য দ্রাবক হিসাবে অ্যালকোহলের ব্যবহার করা হয়।

কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতির ফলে সত্তরদশকের শেষ ভাগ থেকে ছাপার কালির জগতে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা. পেট্রোলিয়ামঘটিত পদার্থের উচ্চমূল্য, পরিবেশ দূষণ রোধে নানা সরকারী বাধানিষেধ আরোপ ইত্যাদি এইসব পরিবর্তনের কারণ। এই পরিবর্তনের ধারা এখনও চলেছে। পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে কয়েক ধরণের রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় কয়েক রকমের কালি তৈরীর উপাদানেও পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে।

অফসেট মুদ্রণে ব্যবহৃত বিশেষ ধরণের কাগজ

সাধারণভাবে লেখা বা ছাপার জনা ব্যবহৃত কাগজের কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকা দরকার, যথা মসৃণতা (যার অভাবে লেখা বা ছাপার কাজ ব্যাহত হ'তে পারে), কালি শুষে নেবার ক্ষমতা, লেখা বা ছাপার জন্য যে পরিমাণ চাপের দরকার হয় সেটি সহ্য করার ক্ষমতা ইত্যাদি। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ধরণের ছাপার জন্য ব্যবহৃত কাগজের কিছু অতিরিক্ত গুণ থাকা দরকার হয়ে পড়ে। যেমন অফসেট ছাপার জন্য ব্যবহৃত কাগজকে সাধারণ লেটারপ্রেসে ছাপায় ব্যবহৃত কাগজের তুলনায় আরো মজবুত হতে হয়, কারণ ছাপার প্রয়োজনে কাগজে কিছুটা আদ্রর্তা সঞ্চারিত করে দেওয়া হয় এবং ঐ অবস্থায় কাগজটি চাপ এবং টানের (tension) মাধ্যমে রোলারের মধ্য দিয়ে যায়। যথেষ্ট মজবুত এবং উপযোগী না হলে ঐ পর্যায়ে কাগজের ক্ষতি হবে। অফসেট ছাপার কাগজ এমন হওয়া দরকার যাতে সেটি অতিরিক্ত আদ্রর্তা শুষে না নেয়। কাগজের তল পরিষ্কার মসৃণ এবং শক্ত হওয়া দরকার এবং এর উপরিভাগে এমন কিছু (যেমন কোন আস্তরণ) থাকা চলবে না, যেগুলি ছাপার সময়ে রবারের রোলারে স্থানান্তরিত হতে পারে। কাগজটি সম্পূর্ণ সমপ্রকৃতির (homogeneous) হওয়া দরকার—নতুবা কাগজের এক অংশ যদি অপর অংশের তুলনায় বেশী আদ্রর্তা গ্রহণ করে তবে তার ফলে ছাপার মান বিঘ্নিত হবে।

আধুনিক গ্রন্থাগারের কয়েকটি বিশেষ ধরণের সংগ্রহ : তার সংরক্ষণের সমস্যা এবং সমাধান

সাবেকী গ্রন্থাগার সংগ্রহের প্রধান উপকরণ বই, কাগজ, চামড়া, কাপড়, ভূর্জপত্র, তালপাতা ইত্যাদি ছাড়াও আজকের আধুনিক গ্রন্থাগারে এমন অনেক জিনিষ ঢুকে পড়েছে যেগুলো আগের কালের গ্রন্থাগারে তো দূরের কথা কয়েক দশক আগের গ্রন্থাগারেও ছিল না। এর মধ্যে আছে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান গ্রামাফোন রেকর্ড, ফটোগ্রাফ, মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোকার্ড, মাইক্রোফিস, সিনেমা ফিল্ম, অডিও টেপ, ভিডিও টেপ, কম্পিউটার টেপ ইত্যাদি। এদের ব্যবহার হয়ত ব্যবহারকারীদের কাছে বইয়ের তুলনায় অসুবিধাজনক কিন্তু সার্বিক বিচারে এবং তথ্য বিস্ফোরণের (Information explosion) এই যুগে, এইসব নবতর সামগ্রীর প্রয়োজন এবং ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে স্থান সঙ্কুলান এবং সংরক্ষণের খরচ সীমিতকরণের প্রয়োজনেই গ্রন্থাগারে খবরের কাগজ সংগ্রহ মাইক্রোফিল্ম আকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা এখন সর্বজন স্বীকৃত। গ্রন্থাগারে এইসব নবাগতদের উপকরণ এবং বৈচিত্র্যের জন্য এদের সংরক্ষণের সমস্যা এবং তার সমাধান আলাদা আলাদা ধরণের। সেগুলো বুঝতে গেলে আমাদের এদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে পৃথকভাবে জানতে হবে।

গ্রামাফোন রেকর্ড

শব্দতরঙ্গ রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থার আবিষ্কার হয় গত শতাব্দীর শেষে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এটি বাজারে আসে গত শতকের শেষ দশকে। কিন্তু গ্রন্থাগারে এর অনুপ্রবেশ ঘটে এই শতকের সুরুতে। এরই মধ্যে রেকর্ডিং জগতে অনেক বিবর্তন ঘটে গেছে। একমাত্র প্রাচীন স্মারকের সংগ্রহালয় ছাড়া প্রথম দিকের রেকর্ডিং গ্রন্থাগারে বড় একটা থাকে না। গ্রন্থাগারে সাধারণত যেসব গ্রামাফোন রেকর্ড স্থান পেয়েছে সেগুলো হয় ৭৮ আর. পি. এম (revolution per minute) অথবা ৩৩⅓ আর. পি. এম। প্রথম দিকের

রেকর্ডগুলোর উপাদান ছিল সহজে ভঙ্গুর ; পরবর্তীকালে এমন সব উপাদানে রেকর্ড তৈরী হতে সুরু করে যেগুলো মোটেই ভঙ্গুর নয়। এই পরিবর্তন সংরক্ষণের একটা বড় সমস্যা কমিয়ে দিয়েছে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে আবহাওয়ার প্রধান ক্ষতিকারক উপাদান—আর্দ্রতা, অত্যাধিক তাপ, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারক দূষণ এবং কখনও কখনও ছত্রাকের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে গ্রামাফোন রেকর্ড। এছাড়া আগের দিনের রেকর্ডগুলো সহজে ভেঙ্গে যেতে পারত, সেজন্য আঘাত বা চাপ ইত্যাদিও ক্ষতি করতে পারে।

যদি আর্দ্রতা 50% বা তার নীচে থাকে, তবে গ্রামাফোন রেকর্ডের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির সমস্যা খুব কম থাকে। সত্যিকারের ভাল গালার (shellac) তৈরী রেকর্ডে বয়সজনিত ক্রমাবনতি প্রায় ঘটে না। ভালভাবে তৈরী ভিনাইল (vinyl) রেকর্ডও স্থায়ী। কিন্তু এছাড়াও কয়েক ধরণের উপাদানের ব্যবহারে রেকর্ড তৈরী হয়েছে, যেগুলো ততটা স্থায়ী নয়। কোন কোনটি তাপ, আর্দ্রতা এবং বাতাসের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে উপরের আস্তরণ ভঙ্গুর হয়ে যায়, ফলে শব্দের তারতম্য দেখা দিতে পাবে। যেসব রেকর্ডে সেলুলোজ নাইট্রেট (Cellulose Nitrate) অথবা সেলুলোজ অ্যাসিটেট (Cellulose Acetate) ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো অত্যন্ত অস্থায়ী এবং সহজেই তাপ, আর্দ্রতা এবং আলোর প্রতিক্রিয়ার ফলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

গ্রামাফোন রেকর্ডিং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সেগুলো রাখার ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেকর্ডকে সব সময়ই সোজা করে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। এগুলো কে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য বিশেষ ধরণের তাক থাকে যেখানে প্রতি ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি (অর্থাৎ ১০-১৫ সেমি) পর পর সোজাভাবে রাখবার জন্য ঠেক (support) লাগানো থাকে। এইভাবে দাঁড় করিয়ে না রাখলে তাপে এবং আর্দ্রতায় রেকর্ড বেঁকে যেতে পারে, যার ফলে রেকর্ডের শব্দের অবনতি ঘটবে। যেহেতু গালা এবং ভিনাইল যথেষ্ট শক্ত উপাদান সেহেতু ৭ বা ১০ বছর পর রেকর্ড যে কোনা বা প্রান্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেটা পরিবর্তন করে দিলেই চলে। নিয়ন্ত্রিত আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা সংরক্ষণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

টেপ রেকর্ড

যদিও চৌম্বকশক্তির ব্যবহারে শব্দ রেকর্ডিং-এর পদ্ধতি গত শতাব্দীর শেষে (১৮৯৯) আবিষ্কৃত হয়, তবু প্রথম সফল টেপরেকর্ডিং করা হয় ১৯৩৬ সালে। কিন্তু শুধুমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই এটি একটি জনপ্রিয় মাধ্যমের রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথমে বিশেষধরণের কাগজে, তারপর সেলুলোজ অ্যাসিটেট এবং এখন বিশেষ ধরণের পলিয়েষ্টার মাধ্যমের উপর এই রেকর্ডিং করা হয়। যে মাধ্যমের উপর রেকর্ডিং করা হয়েছে, তার উপাদান, স্থূলতা (thickness) ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সংরক্ষণের সমস্যা ও তার সমাধান। অপেক্ষাকৃত উন্নতধরণের টেপের ক্ষেত্রে, একই টেপে একাধিক স্তরে রেকর্ডিংএর (multi-track) ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত রূপটি হচ্ছে ক্যাসেট টেপ, যেখানে অপেক্ষাকৃত পাতলা মাধ্যমে, সরু টেপের মধ্যে রেকর্ডিং করা হয় এবং অপেকাকৃত কম জটিল যন্ত্রের সাহায্যে বাজানো সম্ভব।

পলিয়েষ্টার মাধ্যমের উপর করা রেকর্ডিং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। টেপ রীলের উপর জড়ানো থাকে একটি নির্দিষ্ট টানের (tension) মধ্যে। এটি যদি যথাযথভাবে গোটানো না থাকে তবে সঞ্চিত শব্দতরঙ্গ বিকৃত হয়ে যেতে পারে। টেপ যখন 'পুনরায় গোটানো' (rewind) অথবা 'দ্রুত গোটানো' (fast forward) হয় তখন অনেক বেশী শক্ত ভাবে (tight) বা বেশী টানের (tension) মধ্যে গোটানো হয়। সংরক্ষণের পক্ষে এটি ক্ষতিকারক। ব্যবহারের পর তুলে রাখার সময় যেন টেপ কখনই বেশী শক্ত করে গোটানো না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। চালানোর পরই rewind না করে তুলে রাখা দরকার। যেহেতু এক্ষেত্রে রেকর্ডিং করা হয়েছে চৌম্বক শক্তি প্রয়োগে, সেহেতু এই সব টেপ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা এবং তার ওঠানামা সম্বন্ধে অত্যন্ত সংবেদনশীল। এগুলো যেখানে রাখা হবে সেখানে যাতে তাপমাত্রার ওঠানামা ২° সেঃ এবং আর্দ্রতার পরিবর্তন ১০%এর মধ্যে থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শীতাতপনিয়ন্ত্রণ সেদিক থেকে খুবই সুবিধাজনক। আরেকটা ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে, যাতে যেখানে এগুলো রাখা হয়েছে সেখানে যেন কোন চৌম্বক ক্ষেত্র না থাকে কারণ তাতে এর কিছু ক্ষতি হতে পারে। কাছাকাছি ইলেকট্রিক মোটর বা উচ্চ শক্তি (high-voltage) সম্পন্ন বিদ্যুৎবাহী তার বা ট্রান্সফরমার থাকলে টেপের অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।

তুলনামূলকভাবে ক্যাসেট টেপে পাতলা মাধ্যম ব্যবহার করার এর স্থায়িত্ব সীমিত, কারণ এই টেপ সহজে ছিড়ে যেতে পারে এবং সঞ্চিত শব্দ বিকৃত হতে পারে, যদিও এটি ব্যবহারের পক্ষে অনেক সহজ। এই কারণে সংরক্ষণের দিক থেকে ক্যাসেট টেপে সংগৃহীত শব্দ রীল টেপে পুনরায় স্থানান্তরিত (রি-রেকর্ডিং) করে নিতে হবে।

সব ধরণের রেকর্ডিংএর যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে ধুলো ময়লা। সেজন্য ধুলো ময়লা থেকে মুক্ত পরিবেশে এদের সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করতে হবে— দেখতে হবে ব্যবহারের উপকরণগুলোও যেন ধুলো ময়লা থেকে মুক্ত থাকে।

রেকর্ডিং এর সংরক্ষণের ব্যাপারটা জটিল, মূলতঃ এর বিবিধ উপাদান এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারিগরী প্রেক্ষাপটের জন্য। এর সংরক্ষণ এমনভাবে করতে হবে যাতে শুধুমাত্র এটিকে রক্ষা করা নয়, সময়ের সাথে সাথে সঞ্চিত শব্দের কোন বিকৃতি বা তারতম্য না ঘটে সেদিকেও নজর রাখা দরকার। অনেকক্ষেত্রে সঠিক সংরক্ষণের জন্য অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত মাধ্যমে পুনঃ-শব্দগ্রহণ (re-recording) করা জরুরী হয়ে পড়ে। যেহেতু শব্দ অতি সহজেই বিকৃত হতে পারে সেজন্যে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা গ্রহণ করা আবশ্যক। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে টেপের অবাঞ্ছিত শব্দ অপসারণ সম্ভব। কিন্তু সঙ্গীত বা ঐ ধরণের রেকর্ডিংএর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার না করাই উচিত, কারণ তাতে মূল সঙ্গীতের শব্দতরঙ্গের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

যদিও উপযুক্তভাবে তাপমাত্রা এবং আদ্রর্তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়, দূষণ জনিত ক্ষতিকারক পদার্থকে গ্রন্থাগারের বাইরে ঠেকিয়ে রাখা যায়, উপযুক্ত আধারে যথাযথভাবে রাখা যায়, তবে রেকর্ডিংও দীর্ঘদিন পর্যন্ত অত্যন্ত ভালভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব। যথাযথ যন্ত্রের মাধ্যমে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করাটাও নিশ্চিত করা দরকার সংরক্ষণের জন্যে। সাধারণভাবে দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান মূল রেকর্ডিং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য না রেখে তার প্রতিলিপির (copy) ব্যবস্থা করা উচিত।

ফটোগ্রাফ

ফটোগ্রাফ বলতে সাদাকালো, রঙিন ফটো প্রিন্ট, নেগেটিভ, স্লাইড ইত্যাদি সবই একসাথে বোঝানো হয়। ফটোগ্রাফ সংরক্ষণের ব্যাপারটা বেশ জটিল। প্রধানতঃ দুটি কারণে, প্রথমতঃ গ্রন্থাগার সংগ্রহে এটি অপেক্ষাকৃত নবীন

সংযোজন, দ্বিতীয়তঃ এই ধরণের বস্তুতে ব্যবহৃত উপাদান ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো বিবিধ রকমের, একটার থেকে আরেকটার পার্থক্য অনেক।

আসলে ফটোগ্রাফ হচ্ছে কাগজ, কাচ, ধাতু, প্লাস্টিক ইত্যাদি যে কোন মাধ্যমের উপর মাখানো কোন রাসায়নিকের আস্তরণের সঙ্গে আলোর প্রতিক্রিয়ায় ফুটিয়ে তোলা ছবি।

সাদা কালো ছবির ক্ষেত্রে রৌপ্য ঘটিত যৌগের মাধ্যমে এবং রঙিন ছবির ক্ষেত্রে নানা ধরণের রং এর মাধ্যমে প্রতিরূপটি ফুটে ওঠে।

ফটোগ্রাফের অবস্থার ক্রমাবনতির কারণ : ফটোগ্রাফের রাসায়নিক ক্ষতির ঘটনা এবং সম্ভাবনা খুব বেশী। এর প্রধান কারণ ফটোগ্রাফিক জিনিষপত্রের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উৎপাদনের সময় থেকেই ক্রমাবনতির বীজ রোপিত থাকে। এতে ব্যবহৃত রাসায়নিক আস্তরণের স্থায়িত্বের অভাব, ছবি ফোটাবার কাজ ব্যবহৃত রাসায়নিকের অংশবিশেষের ফটোগ্রাফের মধ্যে থেকে যাওয়া, বাতাসে বাহিত নানা দূষণের সঙ্গে বিক্রিয়া, অনুপোযোগী তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা ইত্যাদি মুখ্যতঃ এই ধরণের ক্রমাবনতি ঘটায়। রাসায়নিক ক্ষতির ফলে ছবি ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসে, রং নষ্ট হয়ে যায়, কখনও বা রাসায়নিক আস্তরণ মাধ্যম থেকে উঠে আসে।

নেগেটিভ : এই শতাব্দীর প্রথম তিনদশক পর্যন্ত ফিল্মের নেগেটিভের মূল মাধ্যম (base) (যার উপর রাসায়নিক আস্তরণ লাগানো থাকে) ছিল সেলুলোজ নাইট্রেট। যদিও বিভিন্ন উৎপাদকের ব্যবহৃত সেলুলোজ নাইট্রেটের স্থায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন ছিল তবু সাধারণভাবে বলা যায় যে এই উপকরণটি যথেষ্ট অস্থায়ী এবং অত্যন্ত দাহ্য (বিশেষতঃ যতই পুরানো হয়, এর দাহ্যতা বেড়ে যায়)। ক্রমাবনতির সাথে সাথেই এর রং নষ্ট হয়ে যায় এবং এটি ভঙ্গুর হয়ে যায়। অনেক সময় এর উপরের জিলেটিন মিশ্রিত রাসায়নিক আস্তরণ নরম এবং আঠালো হয়ে ওঠে। ক্রমাবনতির সাথে সাথে সেলুলোজ নাইট্রেট নাইট্রিক অ্যাসিডের সৃষ্টি করে যে ব্যাপারে উচ্চ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা অত্যন্ত সহায়ক। অতিরিক্ত দাহ্যতা এবং নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন, এর আশেপাশে রাখা জিনিষ পত্রের পক্ষেও বিপজ্জনক।

১৯৩৫ সালের পর থেকে ক্রমশ সেলুলোজ নাইট্রেটের বদলে সেলুলোজ অ্যাসিটেট ব্যবহার সুরু হয়। এটি যদিও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী মাধ্যম তবু, প্রথমযুগের নেগেটিভের ক্ষেত্রে নেগেটিভ সংকোচন (shrinking), আস্তরণ

খ্যেন আলা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যেত। এটিও উচ্চতাপমাত্রায় ক্রমাবনতির শিকার হ'ত। পরবর্তীকালের উন্নততর সেল্লোজ অ্যাসিটেটের ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত ত্রুটিগুলোর পরিমান অনেক কমে গিয়েছিল।

১৯৬৫ সালের পর থেকে পলিয়েস্টারের (polyester) ব্যবহার চালু হয়েছে মাধ্যম হিসাবে, যেটি সেলুলোজ অ্যাসিটেটের মতই স্থায়ী—যথেষ্ট টেকসই এবং উচ্চ তাপমাত্রায় ক্ষতিরোধকারী।

পজেটিভ ঃ যে কাগজের উপর ফটো ছাপা হয়েছে, তার উপাদানের উপর এর স্থায়িত্ব অনেকটা নির্ভরশীল। এই ব্যাপারটা অল্পকালের মধ্যেই উপলব্ধি করায় উচ্চমানের কাগজের ব্যবহার সুরু হতে থাকে, যার ফলে ছাপা ফটোর ক্রমাবনতির কারণগুলো উৎপাদনের সময় রোপিত/প্রোথিত (in-built) না হয়ে পরবর্তী কালে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেই আসে। যে ছবি যথেষ্ট সাবধানতার সাথে ছাপানো হয়েছে এবং উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে ছবি দীর্ঘদিন পর্যন্ত অক্ষত এবং অবিকৃত অবস্থায় না থাকার কোন কারণ নেই।

কিছু দিন হ'ল বাজারে এক ধরণের রজনের আস্তর দেওয়া (resin-coated) ফটো ছাপার কাগজ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাওয়া যাচ্ছে। এটির স্থায়িত্ব এবং সুবিধা অসুবিধা এখনও যথেষ্ট পরীক্ষিত হয়নি, সে কারণে গ্রন্থাগারিকদের এটি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কিছুটা অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সাধারণভাবে দেখা যায় যে ফটোর প্রান্তদেশে ছবি ফোটাবার কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক (developer) অল্প পরিমানে জমে আছে। সেজন্য সংরক্ষণের আগে সবপ্রান্তগুলি অল্প করে ছেঁটে নেওয়া ভালো। এছাড়াও একটা ছবি অন্য ছবি থেকে কাগজ দিয়ে আলাদা করে রাখা উচিত, যাতে কোন একটার ত্রুটি পাশের ফটোকে ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে।

পজেটিভ এবং নেগেটিভ দুইয়ের ক্ষেত্রেই যথাযথ ভাবে যদি ছবি ফোটানোর কাজগুলি না করা হয় তবে ফটোর স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয়। এই সমস্যার সমাধান সহজে সম্ভব, যদি কাজের সময় প্রস্তুতকারকের নির্দেশ সম্পূর্ণ মেনে উপযুক্ত শক্তি সম্পন্ন নির্দিষ্ট রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের রেশ যাতে উৎপাদিত পজেটিভে বা নেগেটিভে না থেকে যায়, সেজন্য যথাযথ ধোয়ার (washing) ব্যবস্থা করতে হবে। জলের বিশুদ্ধতা এবং বারবার জল পাল্টানোর মাধ্যমেই ধোয়ার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা

সম্ভব। পদ্ধতির প্রতিটি স্তরেই অত্যন্ত সচেতনভাবে মান নিয়ন্ত্রণ (quality control) একান্ত প্রয়োজন।

বাতাসের দূষণ ছবি ঝাপসা করে দেয় এবং তার উপর ছোপ ধরায়, নিম্নমানের কাগজের এবং জিলেটিনঘটিত আস্তরণসহ ফিল্মের মাধ্যমের ক্রমাবনতি ঘটাতে সাহায্য করে।

ফটো সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয় আরেকভাবে—সেটা হচ্ছে কিভাবে সেগুলোকে রাখা হয়েছে, কিভাবে সাঁটা হয়েছে বা ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে ইত্যাদির উপর। সস্তা প্লাইউড (plywood), কার্ডবোর্ড বা কাগজ ফটো সংরক্ষণের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক কারণ ঐসব উপকরণ থেকে অ্যাসিডসহ অন্য ক্রমাবনতিকারক পদার্থ ফটোকে আক্রমণ করতে পারে, যার ফলে দেখা দেয় নানা ধরণের দাগ এবং ভঙ্গুরতা। রাখার জন্য ব্যবহৃত কাগজের খাম, সেলুলোজ অ্যাসিটেটের খাপ বা প্লাষ্টিকের রীলের (reel) মধ্যেও ক্ষতিকারক পদার্থ থেকে যেতে পারে। খাম জুড়বার জন্য অস্থায়ী ধরণের ব্যবস্থা (unstable adhesive) যেমন রবারঘটিত আঠা, চেপে লাগাবার উপযোগী আঠালো টেপ (adhesive tapes), কয়েক ধরণের কালি ইত্যাদি ফটোগ্রাফিক সামগ্রীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ফিল্মের চেয়ে কাগজে ছাপা ফটো বেশী তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়, কারণ ছাপা ফটোব কাগজের মাধ্যম অপেক্ষাকৃত সহজে বাতাস থেকে আর্দ্রতা এবং দূষণ জাত ক্ষতিকারক পদার্থ টেনে নেয়—তাছাড়া নেগেটিভ ফিল্মের তুলনায় এগুলো অনেক বেশী নাড়াচাড়া করা হয়।

আধুনিক রঙ্গীন ছবির রং খুব বেশী রকম ঝাপসা হয়ে আসে বা পরিবর্তিত হয়ে যায় মাত্র ১০।.২ বছরের মধ্যেই—এর কারণ কয়েকটি জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া যেগুলো উচ্চতর আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত ঘটে—তার সঙ্গে যদি বাতাসে দূষণজাত পদার্থের এবং পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে আলোর (সাধারণ এবং অতি বেগুনী দু ধরণেরই) উপস্থিতি থাকে তবে তো সোনায় সোহাগা। তবে বিভিন্ন ধরণের রংএর উপর এদের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন। বিদেশে রঙ্গীন ছবির এই সব সমস্যা ও তার প্রতিকারের সাম্ভাব্য উপায় নিয়ে নানা ধরণের পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে।

কোডাক কোম্পানী এক ধরণের ছাপানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে—যেখানে রঙিন ছবি থেকে বিভিন্ন সাদা-কালো নেগেটিভ তৈরী করে সেগুলোর সাহায্যে বিশেষ ধরণের ফটোগ্রাফিক মাধ্যমের উপর তিন রং-এর উন্মোচনের সাহায্যে

রং গ্রহণ পদ্ধতিতে (dye imbibition of tri-colour exposure on to photographic materials) ছবি তৈরী হয়। এইভাবে তৈরী ছবি অনেক বেশী স্থায়ী। এই পদ্ধতি তাই ট্রান্সফার পদ্ধতি নামে পরিচিত (Dye-transfer process) এবং অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ।

এখন পর্যন্ত সংরক্ষণের সবচেয়ে ফলপ্রসূ যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে অত্যন্ত ঠাণ্ডায় ফটো সংরক্ষণ করা। এ ব্যাপারে কোডাক কোম্পানীর তৈরী একটি সারণীর উল্লেখ করা যেতে পারে

রং-এর পরিবর্তনের মাত্রা (৪0% আর্দ্রতায়)

তাপমাত্রা	ঝাপসা হবার আপেক্ষিক মাত্রা	সংরক্ষণের আপেক্ষিক সময়
৩0° সেঃ	২	১/২
১৯° সেঃ	১/২	২
৭° সেঃ	১/১৮	১0
−১0° সেঃ	১/১৫0	১00
−২৬° সেঃ	১/১৫00	১000

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে ১৯° সেঃ সংরক্ষিত ছবির তুলনায় ৩0° সেঃ রাখা ছবি চারগুণ বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

রাসায়নিক ক্ষয়ক্ষতির কথা যা আলোচনা করা হল, তাছাড়াও পোকা-মাকড় ছত্রাক ইত্যাদির আক্রমণেও ফটো ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ব্যবহারের সময় অসাবধানতার জন্য দাগ বা আচড় (scratch) পড়া অসম্ভব নয়। যেসব ক্ষেত্রে ছবিতে রংএর কোন বিশেষ প্রয়োজন নেই, সেক্ষেত্রে সেটা থেকে সাদাকালো ছবি করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়, কারণ সেটি অপেক্ষাকৃত বেশী স্থায়ী।

সম্পূর্ণ অন্ধকারে ৩0% আর্দ্রতায় অত্যন্ত নীচু তাপমাত্রায় ২0-২১° সেঃ ফটোগ্রাফিক জিনিষপত্র সংরক্ষণ করা উচিত। যদিও আরো কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণ আরো বেশী ফলপ্রসূ, তবু সাধারণভাবে অধিকাংশ গ্রন্থাগারের পক্ষেই সে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, কারণ এ ব্যাপারে যেসব উপকরণের প্রয়োজন হয়, সেগুলো অত্যন্ত খরচ-সাপেক্ষ। আরেকটি সাবধানতা অবলম্বন করা চলে

সংরক্ষণের জন্য—ছবির মূল প্রিন্টটি সরিয়ে রেখে তারই একটি অনুলিপি (copy) প্রয়োজনে ব্যবহারকারীদের দিতে হবে।

সিনেমার ফিল্ম

আজকাল অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেহেতু শ্রাব্য-দার্শন পদ্ধতির (audio-visual system) মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেজন্য কোন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত গ্রন্থাগারে শিক্ষামূলক সিনেমা ফিল্মের দেখা পাওয়া যায়—সাধারণত এগুলি ১৬ মিমি অথবা ৮ মিমি হয়ে থাকে।

ফটো সংরক্ষণের ব্যাপারে যেসব সমস্যার কথা আলোচনা করা হয়েছে সেসব-গুলি এক্ষেত্রেও খাটে। উপরন্তু তার সাথে যুক্ত হবে আরেকটি সমস্যা—ছবি দেখানোর সময় ফিল্মের উপর যে চাপ পড়ে সেটা থেকে এর সূত্রপাত।

রঙ্গিন ফিল্মের ব্যাপারে একটা কথা জেনে রাখা ভাল যে এর প্রথম যুগে অর্থাৎ ১৯২৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত যেসব ফিল্ম তৈরী করা হয়েছে, সেগুলোতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হ'ত, সেটা ছিল যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য, কিন্তু তৈরী কপির রং হ'ত অনেক স্থায়ী। কিন্তু ১৯৫১ সালে ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানীর উদ্ভাবিত রঙ্গিন ফিল্ম তৈরীর নতুন পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য। এইভাবে তৈরী করা ছবির রং নতুন অবস্থায় বেশ ভালই থাকে কিন্তু মোটেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়না। এক্ষেত্রে রং বছর পাঁচেকের মধ্যেই যথেষ্ট ফিকে হয়ে আসে।

সাধারণভাবে গ্রন্থাগারে যেসব সিনেমা ফিল্ম থাকে সেগুলো রক্ষার জন্য বিস্তর খরচ বহনের অবকাশ থাকে না। তবু জেনে রাখা ভাল বিদেশে রঙ্গিন ফিল্ম সংরক্ষণের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন রংএর অংশ আলাদা আলাদা রীলে তুলে রেখে আরো বেশী-দিন ভালভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা খুবই ব্যয়-সাধ্য। একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি এইভাবে সংরক্ষণের জন্য তৈরী করতে প্রাথমিক খরচ হয় দুই থেকে চার লক্ষ টাকার মত। সেকারণে অত্যন্ত দুর্লভ এবং মূল্যবান ছবির ক্ষেত্র ছাড়া ওদেশেও এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

এক্ষেত্রেও সাধারণভাবে ৩০% আর্দ্রতা এবং ২১° সেঃ তাপমাত্রায় ফিল্মগুলো রেখে দেওয়া হলে যথেষ্ট ভাল ফল পাওয়া সম্ভব।

মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস, মাইক্রোকার্ড ইত্যাদি

১৯৩০ সালের পর থেকে মাইক্রোফিল্ম আস্তে আস্তে গ্রন্থাগারে স্থান পেতে সুরু করে মুখ্যতঃ তিনটি কারণে, যেমন এর মাধ্যমে স্থান সঙ্কুলানের সুবিধা হয়, তুলনামূলকভাবে খরচ কম, ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক। ক্রমশঃ বড় বড় গ্রন্থাগারে এর বহুল ব্যবহার সুরু হয়ে যায়। আজকাল পুরানো পত্রপত্রিকা সংরক্ষণের ব্যাপারে মাইক্রোফিল্মের ব্যবহার ব্যাপক ও সার্বজনীন। সাধারণত আকারের দিক থেকে এরা দু'ধরণের হয়ে থাকে—১৬ মিমি এবং ৩৫ মিমি চওড়া, যদিও দ্বিতীয়টিই বেশী ব্যবহৃত। সাধারণ এক একটি রোলের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট (অর্থাৎ প্রায় ২৫০ সে মি)। এগুলো তিন ধরণের হতে পারে, যথা —সিলভার হ্যালাইড, ডিয়াজো এবং ভ্যাসিকুলার (silver halide, diazo and vesicular)। আসলে এই নামগুলো ফিল্মের গঠনপ্রকৃতির নির্দেশক। এই গঠনপ্রকৃতির উপরই ফিল্মের স্থায়িত্ব, ক্রমাবনতির কারণ এবং সংরক্ষণের উপায় নির্ভর করে।

সিলভার হ্যালাইড ফিল্ম হুবহু সাদা-কালো ফটোগ্রাফির নেগেটিভের উপকরণ সহযোগে তৈরী। এটিতে পাতলা স্বচ্ছ কোন প্লাষ্টিকের (যেমন সেলুলোজ অ্যাসিটেট বা পলিয়েষ্টার) একদিকে রূপার যৌগ জিলোটিনে মিশিয়ে মাখানো থাকে। ক্যামেরার মাধ্যমে সাধারণ আলোতে এই ফিল্মকে যখন খোলা হয় (expose), তখন আলোর বিক্রিয়ায় ফিল্মে নেগেটিভ ছবি তৈরী হয়। যেহেতু সিলভার হ্যালাইড অত্যন্ত বেশী আলোক-সংবেদনশীল, সেহেতু নেগেটিভ তৈরীতে এর ব্যবহার প্রায় সার্বজনীন। নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ অন্ধকারে এটিতে ছবি ফোটানোর কাজ (developing) করতে হয়। এরপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ছবিকে স্থায়ী করা হয় (fixing)। সবশেষে যথেষ্ট পরিমাণ পরিষ্কার জলের ব্যবহারের মাধ্যমে স্থায়ীকরণে ব্যবহৃত অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থ (মুখ্যতঃ সোডিয়াম থাইওসালফেট (Sodium Thiosulphate) যেটা হাইপো (hypo) নামেই বেশী পরিচিত) ধুয়ে ফেলা হয়। কারণ এর রেশ থেকে গেলে পরবর্তী-কালে এটিই ক্রমাবনতির এক প্রধান উৎস হয়ে উঠে।

ডিয়াজো (Diazo) ফিল্মের ক্ষেত্রে সিলভার হ্যালাইড্ আস্তরণের বদলে ডিয়াজোনিয়াম যৌগ (Diazonium salt) উপযুক্ত মাধ্যম সহযোগে

সেলুলোজ অ্যাসিটেট অথবা পলিয়েষ্টার ফিল্মের উপর লাগানো হয়। এই রাসায়নিক পদার্থ যেহেতু সাধারণ আলোক সংবেদনশীল (sensetive) নয়, একমাত্র অতিবেগুনি রশ্মি সহযোগে এতে ছবি তোলা হয়। ছবি ফোটানো এবং স্থায়ীকরণের জন্য অ্যামোনিয়া বাষ্প ব্যবহৃত হয়। অতিবেগুনী রশ্মি রাসায়নিক যৌগের পরিবর্তন ঘটাবার ফলে অ্যামোনিয়া বাষ্প ঐ সব অংশে বিক্রিয়া ঘটিয়ে গাঢ় ছাপ আনতে পারেনা। কিন্তু এই বিক্রিয়া অত্যন্ত শ্লথ, সেকারণে এই ফিল্ম ক্যামেরায় ব্যবহার করা যায় না। দামের দিক থেকে এটি অনেক সস্তা হওয়ায় সাধারণত বিতরণ বা পরিসেবার (service) ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বেশী চালু। সিলভার হ্যালাইড নেগেটিভ থেকে তৈরী ডিয়াজো প্রতিলিপির রূপান্তরে মাত্র 4% সূক্ষ্ম অংশ(details) হারিয়ে যায়, যেটা সাধারণ ছবির পক্ষে কিছুই নয়। ডিয়াজো ছবি কত ভাল হবে, সেটা নির্ভর করে যে নেগেটিভ থেকে এটি তৈরী হচ্ছে এবং কতটা নিপুনতার সঙ্গে প্রতিলিপি করা হচ্ছে তার ওপর। প্রতিলিপি করার সময় ডিয়াজো ফিল্ম ও সিলভার হ্যালাইড নেগেটিভ একটার সঙ্গে আরেকটা সেটে রেখে, তার মধ্য দিয়ে অতিবেগুনী রশ্মি চালিত করা হয় (contact printing).

ভ্যাসিকুলার ফিল্মের ক্ষেত্রে পলিমার ফিল্ম এর উপর ডিয়াজোনিয়াম যৌগ ছড়ানো থাকে। যখন এর উপর অতিবেগুনী রশ্মির বিক্রিয়া ঘটে তখন উদ্ভূত নাইট্রোজেন গ্যাস পলিমারের স্তরে ঢুকে পড়ে এবং ছবি ফোটানোর জন্য তাপ প্রয়োগে ঐ গ্যাস নরম হয়ে যাওয়া পলিমারের স্তরের মধ্যে ছোট ছোট বুদবুদের সৃষ্টি করে। এরপর আবার বেশী শক্তিশালী (high intensity) অতিবেগুনীরশ্মি চালিত করে স্থায়ী করে নেওয়া হয়। সিলভার হ্যালাইড অথবা ডিয়াজো ফিল্মের মত এখানে ছবি ফোটাবার জন্য আলোকরসায়ন বিক্রিয়ার (photo-chemical reaction) ব্যবহার করা হয়না। যেহেতু এই পদ্ধতিতে রাসায়নিক বা জলীয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না, সেহেতু এটি খুবই সস্তা ও সহজ। এটিও বিতরণ অথবা পরিসেবার ক্ষেত্রেই বহুল ব্যবহৃত।

যেকোন ধরণের মাইক্রোফিল্মের ক্ষেত্রে ক্রমাবনতি (অর্থাৎ ছবির সূক্ষ্ম অংশগুলি নষ্ট হওয়া অথবা ছবির মান পরিবর্তিত হওয়া) ঘটে তিন ভাবে— আঁচড় লেগে ছবির ক্ষতি হওয়া, রাসায়নিক আস্তরণের উঠে যাওয়ার ক্ষতি এবং মূল মাধ্যম অর্থাৎ সেলুলোজ অ্যাসিটেট অথবা পলিমার সীটের ক্রমাবনতিজনিত ক্ষতি। ক্ষতি দুধরণের হয়ে থাকে, যেমন ছবির সূক্ষ্ম অংশগুলো হারিয়ে

যেতে পারে অথবা পশ্চাদপট এবং ছবির রংএর মধ্যের তারতম্য ক্রমশ কমে যেতে পারে।

মাইক্রোফিল্ম তৈরীর যে কোন স্তরে সামান্যতম ত্রুটি পরবর্তীকালে সংরক্ষণের পক্ষে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু এব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের কিছুই করার থাকে না, কারণ অধিকাংশ গ্রন্থাগারে তৈরী মাইক্রোফিল্মই কেনা হয় (অবশ্য খুব বড় দু'চারটে গ্রন্থাগারে তাদের নিজস্ব মাইক্রোফিল্ম তৈরীর বিভাগ থাকে)। মাইক্রোফিল্ম কিভাবে রাখা হবে সেটা কিন্তু গ্রন্থাগারিকেরই হাতে এবং এর মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে তৈরী করার সময়ের ত্রুটি-জনিত ক্রমাবনতির সম্ভাবনাকে অনেকটা কম করা, এমনকি পরবর্তীকালে অন্যান্য কারণে ক্ষতির যে সব সম্ভাবনা থাকে তাও রোধ করা যায়।

বিভিন্ন ফিল্ম ত্রুটিপূর্ণ রাখার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমন আলোর প্রতিক্রিয়ায় ডিয়াজো ফিল্মের ছবি ঝাপসা হয়ে যাবে। সবচেয়ে সাধারণ ঘটনা হচ্ছে, ফিল্মটি পাঠযন্ত্র (reader) লাগানো অবস্থায় রেখে দেওয়া। এতে সিলভার হ্যালাইড ফিল্মের আর্দ্রতাজনিত ক্ষতি হতে পারে। ৬০ % আর্দ্রতায় জিলোটিন স্তরে ছত্রাকের দ্রুত প্রসার ঘটে। অন্য দুধরণের ফিল্মে আর্দ্রতাজনিত ক্ষতির সম্ভাবনা কম। অত্যধিক তাপে অল্পসময় থাকলে ডিয়াজো বা সিলভার হ্যালাইড ফিল্মের বিশেষ ক্ষতি না হলেও ৮০° সেঃ তাপমাত্রায় ভ্যাসিকুলার ফিল্মের ছবি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় পাঠযন্ত্রে থাকলেও তাপজনিত ক্ষতি হতে পারে।

সবজাতীয় প্লাষ্টিকই সময়ের সাথে সাথে ক্রমাবনতি ঘটে, কিন্তু উচ্চ তাপমাত্রা সেটিকে দ্রুততর করে। সেলুলোজ অ্যাসিটেট আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ায় আঠালো হয়ে পড়ে এবং ছবি সম্বলিত আস্তরণটি উঠে আসে বা খসে যায়। আর্দ্রতা পলিয়েষ্টারের কোন ক্ষতি না করলেও উচ্চ তাপমাত্রা এর ক্ষতি করে।

ভালভাবে রাখা না হলে দূষণজনিত গ্যাসীয় ক্ষতিকারক পদার্থ ফিল্মের মূল মাধ্যম এবং তার উপরের আস্তরণের যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। ধুলোময়লা থেকে আঁচড় পড়ার সম্ভাবনাও থাকে। সিলভার হ্যালাইডের পক্ষে সালফার ডাইঅক্সাইড, প্যারোক্সাইড, ওজোন, অ্যামোনিয়া গ্যাস অত্যন্ত ক্ষতিকারক। মাইক্রোফিল্মের কয়েক ধরণের ত্রুটি "রেডক্স" ত্রুটি (redox blemishes) নামে পরিচিত। এব্যাপারে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর এর কারণগুলি নির্দিষ্ট করা সম্ভব

হয়েছে। সংক্ষেপে বলা চলে নিম্নমানের কাগজ বা কার্ডবোর্ডের বক্স থেকে উদ্ভূত প্যারক্সাইড, আবহাওয়ায় মিশে থাকা দূষণজনিত গ্যাস, তৈরীর সময়ে ব্যবহৃত রাসায়নিকের সামান্য অংশ অপসারিত না হওয়া, ইত্যাদি রেডক্স ত্রুটির কারণ। বর্তমানে ০ ২ গ্রাম পটাসিয়াম আইয়োডাইড (Potassium Icdide) প্রতি লিটার ছবি স্থায়ীকারী রাসায়নিকের (fixer) সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করে রেডক্স ত্রুটির সম্ভাবনা দূর করা সম্ভব। ফিল্মে কখনো রবারের বন্ধনী (rubber-band) লাগিয়ে বাখতে নেই, কারণ তার ফলে সিলভার হ্যালাইড স্তরের ক্ষতি হতে পাবে।

১৯৭০ সালের কুখ্যাত ক্যালভার ফিল্ম দুর্ঘটনায় (Kalvar film scandal) ফিল্ম রাখার ধাতব পাত্রে মরচে ধরে যায়, বিশেষ ধরণের ভ্যাসিকুলার ফিল্ম থেকে উদ্ভূত হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বাষ্প কার্ডবোর্ডের বাক্স নষ্ট কবে দেয় এবং ফিল্মের প্রভূত ক্ষতি করে। এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি কবে বলা চলে সিলভার হ্যালাইড, ডিয়াজো এবং ভ্যাসিকুলার ফিল্ম সব সময়েই আলাদা আলাদা করে রাখা উচিত।

সব ফিল্মই খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করা উচিত। সিলভার হ্যালাইড ফিল্মের ক্ষেত্রে আঙ্গুলের ছাপ খুব ক্ষতিকারক, কারণ ঐ ছাপের সাথে ঘাম অথবা অন্য পদার্থ ফিল্মের উপরের আস্তরণের ক্ষতি করে। ফিল্ম কখনও অত্যন্ত আঁটসাঁট করে গুটাতে নেই। ধুলো ময়লা থেকেও এদের রক্ষা করার দিকে নজর দিতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে সিলভার হ্যালাইড ফিল্মই সংরক্ষণের দৃষ্টিতে বিচার করলে সবচেয়ে স্থায়ী, যদি ব্যবহারে ও রক্ষণাবেক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অবশ্য যেসব গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীদের মধ্যে মাইক্রোফিল্ম ব্যবহারের প্রবণতা বেশী সে ক্ষেত্রে ভ্যাসিকুলার ফিল্মের ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই বেশী এবং তার জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ডিয়াজো এবং ভ্যাসিকুলার ফিল্ম উদ্ভাবিত হয় এবং সাধারণ অবস্থায় এগুলি বেশ টেকসই এবং দামে অত্যন্ত সস্তা হওয়ায় এর বহুল ব্যবহার সুরু হয়।

ব্যবহারের সময় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব সাবধানতার কথা আগে বলা হয়েছে তাছাড়া সংরক্ষণের জন্য শুধুমাত্র উপযুক্ত পরিবেশের কথাই বলা চলে। এই উপযুক্ত পরিবেশ বলতে যেটা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে

(ক) ৩০% আদ্র'তা এবং ২১° সে তাপমাত্রা (যা সব সময় একই মাত্রায় রাখার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে), (খ) যে ঘরে এগুলো রাখা হবে সেগুলো বিশেষভাবে অগ্নিনিরোধক করে নিতে হবে।

মাইক্রোকার্ড—১২ × ৭½ (৫" × ৩") সেমি আকারের অস্বচ্ছ উপকরণ, যার উপরে সংকুচিত ভাবে ছাপা থাকে। লেখা প্রতিফলিত করে পর্দায় ফেলে এবং ইচ্ছা/প্রয়োজন মত সংকুচিত বস্তুকে বর্ধিত আকারে পরিবর্তিত করে তবেই পড়া সম্ভব হয়।

মাইক্রোফিস—১'৪৮ সেমি × ১০৫ সেমি (৬" × ৪") আকারে স্বচ্ছ ফিল্ম যার উপরের অংশে সাধারণ চোখে পাঠযোগ্যভাবে ঐ ফিসের মধ্যে রাখা তথ্য সম্বন্ধে নির্দেশিকা থাকে। নীচের অংশ সাধারণত ৬০ অথবা ৯৮টি সমান অংশে ভাগ করা থাকে, যার একেকটি অংশে একেক পৃষ্ঠার ছবি ২৪ গুণ সংকুচিত অবস্থায় রাখা হয়। এগুলি বিশেষ পাঠযন্ত্রের সাহায্যে পর্দার উপর প্রতিবিম্ব ফেলে পড়তে হয়।

কমফিস্ (Comfisch : Computer output on microfisch)—মাইক্রোফিস কিন্তু এক্ষেত্রে ৯৮টির বদলে ২৭০ পৃষ্ঠা একই কার্ডে রাখা সম্ভব। এতেও বিশেষ পাঠযন্ত্রের ব্যবহার দরকার।

আলট্রাফিস (Ultrafisch)—এটিও সাধারণ মাইক্রোফিসেরই মত শুধুমাত্র এটাতে একটা ফিসে সাধারণ বইয়ের অর্থাৎ ২১'৫ × ২৮ সেমি (৮½" × ১১") আকারের ৩২৮০ পৃষ্ঠা রাখা সম্ভব। এ থেকে অনুমান করা সম্ভব যে প্রতি পৃষ্ঠা কত সূক্ষ্ম অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এটি নাড়াচাড়া না করলে সামান্যতম আঁচড়েই এটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এই সবগুলিই মোটামুটি সিলভার হ্যালাইড মাইক্রোফিল্মের উপকরণে গঠিত—সেজন্য এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ সমস্যা এবং তার সমাধান একই রকমের হবে।

ভিডিও টেপ

সাউন্ড টেপের মতই ভিডিও টেপও চৌম্বক শক্তির একটি বিশেষ প্রয়োগে তৈরী। উৎপাদকেরা প্রথম থেকেই উৎপাদনের সুবিধা, সস্তা দাম, প্রচুর উৎপাদনের দিকে বেশী নজর দিতে সুরু করায়, এর স্থায়িত্বের দিকটা প্রায় অবহেলিত হয়েছে। যদিও এটির ব্যবহারের সুবিধার জন্য এমন সব জিনিস

এতে নথিভুক্ত করা হয় যে এর যথাযথ সংরক্ষণ করা খুব দরকার। কিন্তু এর তৈরীর সময় থেকেই এটি মোটামুটি অস্থায়ীভাবেই তৈরী।

সংরক্ষণের দিক থেকে টেপের রাসায়নিক চরিত্র এবং ভৌতিক চরিত্র, যেমন মূল মাধ্যমের সম্প্রসারণশীলতা, টান সহ্য করার ক্ষমতা (tensile strength), স্থূলতা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সবধরণের ভিডিও টেপই বার বার ব্যবহারে আস্তে আস্তে তারমধ্যে নথিভুক্ত করা তথ্য (recorded information) হারিয়ে ফেলে কারণ এর উপরের চৌম্বক শক্তি ধরে রাখার ক্ষমতা শিথিল হয়ে আসে। এছাড়া প্রতিবার চালানোর সময় কিছু না কিছু ধুলোময়লা এতে অনুপ্রবেশ করে, বাজাবার অংশ (tape head) থেকে। পরের বার বাজানোর সময় এই ধুলোময়লা ঘর্ষণজনিত ত্রুটির সৃষ্টি করে। এই সবের হাত থেকে রক্ষা পাবার এবং টেপের জীবন দীর্ঘায়িত করার একটাই উপায়—যথাযথ ভাবে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহারের যন্ত্রপাতির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ, সাবধানতার সাথে নাড়াচাড়া এবং রাখার (storage) সুব্যবস্থা করা। অডিও টেপ রেকর্ডের মত এটির ক্ষেত্রেও ব্যবহারের পর তুলে রাখার সময় যেন কখনই বেশী শক্ত করে গোটানো না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সাধারণভাবে বলা চলে ১৯৮০ সালের পর তৈরী টেপ তার আগের টেপের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং টেকসই। ভিডিও টেপ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার ওঠানামা সম্বন্ধে অত্যন্ত সংবেদনশীল। দেখতে হবে যেখানে এগুলো রাখা হয়েছে, সেখানের তাপমাত্রা ২° সেঃ এবং আর্দ্রতা ১০% এর বেশী ওঠানামা না করে। শীতাতপনিয়ন্ত্রণই এ ব্যাপারে সবচেয়ে সুবিধাজনক সমাধান। রাখার জায়গার কাছে ইলেকট্রিক মোটর, উচ্চশক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎবাহী তার বা ট্রান্সফরমার যেন না থাকে, সেদিকে নজর দিতে হবে।

কম্পিউটার টেপ

এটিও চৌম্বকশক্তির প্রয়োগে তৈরী হওয়ায় অডিও টেপ বা ভিডিও টেপের মত একইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এটিতে যেহেতু প্লাষ্টিক মাধ্যম ব্যবহার করা হয়, সেহেতু ক্ষতির সম্ভাবনা কিছুটা বেড়ে যায়। সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশে রাখলেও এর জীবন ১০ থেকে ২০ বছরের বেশী হয় না। বিভিন্ন প্রস্তুতকারকের তৈরী কম্পিউটার টেপের স্থায়িত্ব ভিন্ন। আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ

এক্ষেত্রেও অত্যন্ত জরুরী। সুখের কথা ইদানিং বিভিন্ন প্রস্তুতকারক এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধির দিকে আরো দৃষ্টি দিতে সুরু করেছেন।

যেহেতু এই ধরণের টেপে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রাখা থাকে, সেহেতু এগুলো যে ঘরে রাখা হবে সেটি ভালভাবে আগুন এবং জল (বন্যা) নিরোধক ব্যবস্থাসম্পন্ন হওয়া দরকার।

সংরক্ষণের সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশ হচ্ছে তাপমাত্রা ২১° সেঃ (±২° সে) এবং আর্দ্রতা ৫০% (±১০%); ধুলোবালি এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ এবং উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের আওতার বাইরে, নিয়ন্ত্রিত আলোর মধ্যে। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করলে, সেটা সংরক্ষণের সহায়ক হয়। প্রতিটি টেপ বছরে একবার অন্তত চালিয়ে দেখে নেওয়া দরকার। এতে টেপের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। প্রয়োজনে পুনরায় রেকর্ডিং করে নিতে হবে।

পুঁথি / পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির সংরক্ষণ

আমরা 'প্রাচীনকালের লেখার সামগ্রী' অধ্যায়ে জানতে পেরেছি কাগজের আবিষ্কারের এবং তার বহুল ব্যবহার সুরু হবার আগে প্রধান লেখার মাধ্যম-গুলির মধ্যে কাদার তাল, পাথর, প্যাপিরাস, কাঠের টুকরো, চামড়া (বিশেষতঃ পার্চমেণ্ট এবং ভেলাম) বার্চ জাতীয় গাছের ছাল, তালপাতা, কাপড় (বিশেষতঃ রেশমী কাপড়) লেখার প্রধান মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত ।

যদিও সেই প্রাচীনযুগে লেখার মাধ্যমের অভাব ছিল, জ্ঞানের প্রচার ছিল না সার্বজনীন—সেটা ছিল অল্প কিছু বিদ্বান পণ্ডিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ—তবু সেকালের সামান্য কিছু লিপিবদ্ধ যেসব সামগ্রী, যা কালের করাল গ্রাস এড়িয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তার মূল্য আমাদের কাছে অপরিসীম, সেকালের সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারক হিসাবে। সেইসব হাতে লেখা পুরোনো নথিপত্র. যা সাধারণভাবে পুঁথি এবং পাণ্ডুলিপি হিসাবে পরিচিত তার সযত্ন সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন ; বিশেষতঃ যেহেতু উপকরণের বিভিন্নতা এবং বয়সের আধিক্যের জন্য এদের বেশীরভাগই অত্যন্ত দুর্বল এবং ভঙ্গুর অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে ।

এই বিশেষ সংরক্ষণের দুটি প্রধান অংশ আছে। একটি হচ্ছে ক্রমাবনতির প্রতিকার (preservation) যার মধ্যে পড়ে এগুলো নির্দিষ্ট মানে রাখার ব্যবস্থা, বেশী নাড়াচাড়া না করা, কীটপতঙ্গ ও আবহাওয়াজনিত সম্ভাব্য ক্ষতি বিষয়ে সজাগ থাকা ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে পুনরুদ্ধারকরণ (restoration)। এই দুটি ব্যবস্থা একটি অপরের পরিপূরক। সহজভাবে বলতে গেলে বলা চলে ক্রমাবনতির প্রতিকার হচ্ছে, পাণ্ডুলিপিগুলিকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ক্রমাবনতির হাত থেকে যে উপায়ে বাঁচান যায়, তার ব্যবস্থা করা এবং পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে, আগে ঘটে যাওয়া ক্রমাবনতির ফলগুলো যথাসম্ভব দূর করে এগুলোকে অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং সহনশীল করে তোলা।

উপকরণের ভিন্নতার জন্য সারান (সংস্কার) এবং পুনরুদ্ধারের পদ্ধতিও ভিন্নতর হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি যেমন বিস্তৃত আয়তনের, অপরদিকে তেমনি বেশ দক্ষতা সাপেক্ষ। এই কাজের প্রতি ধাপে কর্মীদের বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার।

কার্যক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তগুলি অবাস্তব এবং অসম্ভব মনে হলেও এ কথা মনে রাখতে হবে যে পুনরুদ্ধারকরণে নিযুক্ত কর্মীর দক্ষতা/সতর্কতার অভাবে যথাযথ পুনরুদ্ধার না হয়ে আরো অধিক ক্রমাবনতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। এর বহু উদাহরণ আছে আমাদের হাতের কাছেই—অজন্তা গুহাচিত্রের পুনরুদ্ধারকরণের কথা এ ব্যাপারে উল্লেখ করা চলে।* শুধুমাত্র জ্ঞান ও দক্ষতাই যথেষ্ট নয়, তাদের পুনরুদ্ধারকরণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকাও দরকার। আমাদের মত দেশে যেখানে নানা ধরণের অভাব এবং অপ্রতুলতার (যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি) মধ্যে কাজ করতে হয় সেখানে কর্মীদের বিকল্প সামগ্রী ব্যবহারের মৌলিক চিন্তাশক্তি এবং কর্মকুশলতা অত্যন্ত উপযোগী এবং অভিনন্দনযোগ্য।

পুনরুদ্ধারকরণের প্রতিটি কাজ একক এবং অন্যসবগুলো থেকে আলাদা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে একে দেখতে হবে। প্রতিটি পাণ্ডুলিপির পুনরুদ্ধারকরণের আগে এবং পরে ছবি তুলে রাখা দরকার। যদি তা সম্ভব না হয় তবে হাতে লিখে অথবা এঁকে যতটা সম্ভব সেটাকে নথিভুক্ত করে রাখতে হবে। এর প্রয়োজন বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কর্মীদের কাছে যথেষ্ট। পুনরুদ্ধারকরণ এমন একটি ব্যাপার যার শেষ কথা কখনও বলা যায় না, সেকারণে সবচেয়ে আধুনিক অথবা সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতিই ব্যবহার করা উচিত—এ ব্যাপারে এগোবার আগে কর্মীকে কয়েকটি পদ্ধতি সম্বন্ধে ভেবেচিন্তে নিতে হবে, যথা—

(১) অর্থনৈতিক দিক—অর্থাৎ এটি করা আর্থিক দিক থেকে বুদ্ধিমানের কাজ কিনা ;

(২) প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং সাজসরঞ্জাম সহজে এবং আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে পাওয়া সম্ভব কিনা ;

(৩) অনুসৃত পদ্ধতি যেন প্রতিবর্তশীল (reversible) হয় ;

(৪) এই পদ্ধতি যেন মূল পাণ্ডুলিপি বা তার উপাদানকে (কালি ইত্যাদি) উল্লেখনীয় ভাবে নষ্ট / ক্ষতিগ্রস্ত না করে ;

(৫) এবং সবশেষে এই পদ্ধতি যেন পাণ্ডুলিপির পাঠযোগ্যতার কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি না করে।

---

* Jain, Madhu. Ajanta painting : monuments to neglect —*India Today* volume 12, No 5, 15 March 1987. p-160

আমাদের মত প্রাচ্যের দেশগুলিতে অর্থাৎ ভারত পাকিস্থান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, চীন, জাপান ইত্যাদি দেশে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির উপকরণের মধ্যে তালপাতা, বার্চজাতীয় গাছের ছাল, পার্চমেন্ট, ভেলাম, রেশমী কাপড়, কাগজ ইত্যাদি আছে।

তালপাতা : ভারত, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে কাগজের বহুল ব্যবহার সুরু হবার আগে পর্যন্ত তালপাতা লেখার অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল। ভারতে উড়িষ্যা, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু প্রভৃতি অঞ্চলে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর ব্যবহার ছিল বেশ জনপ্রিয়। আবহাওয়ার অনুকূল পরিবেশের জন্য এই অঞ্চলে তালপাতা সহজলভ্যও ছিল।

ভারতে তিনধরণের তালপাতার ব্যবহার দেখা যায়—এগুলো হচ্ছে (ক) তাল (বোরাসাস ফ্ল্যাবেলিফার (Borassus flabellifer) (খ) শ্রীতাল (কোরিফা আমব্রাক্যাউফেরা Corypha umbracauifera) (গ) পাম তাল (কোরিফা তালিয়ারা (Corypha taliara)। এদের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 'প্রাচীনকালের লেখার উপকরণ' অধ্যায়ে করা হয়েছে। (৪-৫ পৃঃ)

লেখার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য তালপাতা তৈরী করার বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল, যথা দক্ষিণভারতে পামতালের পাতা ব্যবহারের আগে তার উপর তিল তেল মাখানো হ'ত, যাতে উপরের তলটা লেখার উপযোগী এবং মসৃণ হয়।

উড়িষ্যায় তালপাতা ব্যবহারের আগে তিনভাবে সেটাকে তৈরী করার পদ্ধতি চালু ছিল। যেমন—

(১) পাতাগুলো রোদে শুকিয়ে নেওয়া হ'ত। ভালোভাবে শুকিয়ে যাবার পর সেগুলোকে কাদার মধ্যে বা ডোবার পাঁকের মধ্যে ১০/১৫ দিন রেখে দেওয়া হ'ত। তারপর সেগুলোকে তুলে ভালকরে ধুয়ে নিয়ে আবার রোদে শুকানোর পরে শুকনো পাতার উপর হলুদ বাঁটা লাগিয়ে নেওয়া হ'ত।

(২) কখনও কখনও তালপাতা দীর্ঘদিন ধোঁয়ার মধ্যে রান্নাঘরে রেখে দেওয়া হ'ত। পরে সেই পাতাগুলো পরিষ্কার করে তার উপর হলুদবাটা লাগিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা হ'ত।

(৩) মোটা খসখসে তালপাতা অল্প কিছুক্ষণ জলে সেদ্ধ করে নিয়ে, তারপর সেটাকে পরিষ্কার করা হ'ত; এতে পাতা অনেক নরম এবং পাতলা

হয়ে যায়। এরপর পাতাকে ক্রমান্বয়ে রোদে এবং শিশিরের মধ্যে রেখে আস্তে আস্তে শুকিয়ে নিয়ে তারপর তার উপর হলুদবাটা লাগিয়ে নেওয়া হ'ত।

এভাবে তৈরী করা তালপাতা তারপর নির্দিষ্ট মাপে কেটে নেওয়া হ'ত এবং ঐ পাতার ঠিক মাঝখানে একটা ফুটো করা হ'ত। একই আকারের দুটি কাঠের টুকরো নেওয়া হ'ত যার ঠিক মাঝখানে অনুরূপ ভাবে ফুটো করা থাকে। ঐ কাঠ দুটো পাতাগুলোর দুদিকে রেখে মাঝখানদিয়ে সুতো ঢুকিয়ে বেঁধে রাখা হ'ত। কাঠদুটো দুদিকে দেবার কারণ হচ্ছে যাতে তালপাতা সহজে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। মাঝখান দিয়ে সুতো থাকায় পাতাগুলো সহজে খুলে লেখার কাজ বা পড়ার কাজ করা সম্ভব হয়।

এবার দেখা যাক কি কি কারণে এবং কিভাবে তালপাতার ক্রমাবনতি ঘটে। এই সব ক্ষতিগুলোকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা (ক) ভৌতিক এবং রাসায়নিক ক্ষতি, (খ) ছত্রাক, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা কৃত ক্ষতি, (গ) ক্রমাগত ব্যবহার জনিত ক্ষয়ক্ষতি, (ঘ) রাখার ত্রুটি জনিত ক্ষয়ক্ষতি। তালপাথার পুঁথি সংরক্ষণের সময় এ ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেমন—(ক) তালপাতার সাধারণ ব্যবহারের ধকল সইবার ক্ষমতা কম, (খ) এরা সহজেই বাতাসের আর্দ্রতা শুষে নেয় এবং ফুলে উঠে, (গ) কীটপতঙ্গ সহজেই এদের আক্রমণ করে এবং বিশেষতঃ কোণাগুলো খেয়ে নষ্ট করে ফেলে, (ঘ) কখনও কখনও একটা পাতা আরেকটার সাথে জুড়ে যায়, যেটা খোলা শক্ত হয়ে পড়ে, (ঙ) কোন কোন পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার শক্ত হয়ে পড়ে কারণ হয় সেটিতে ব্যবহৃত কালি ঝাপসা হয়ে গেছে অথবা যথাযথভাবে কালি লাগানো হয়নি।

ক্রমশ পুরনো হওয়ায় (অর্থাৎ বয়স হওয়ায়) এবং দীর্ঘদিন তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার দ্রুত ওঠানামার ফলে তালপাতা তার নিজস্ব স্বাভাবিক তেল হারিয়ে ফেলে। এই তেল প্রাকৃতিক নিয়মে তালপাতার মধ্যে থাকে, যার ফলে সেটি নমনীয় ও ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠে। কিন্তু এই তেল যখনই নষ্ট হয়ে যায় তখনই তালপাতা ক্রমশঃ শক্ত এবং ভঙ্গুর হতে থাকে, উপর থেকে পাতলা পাতলা আস্তরণ উঠে যায়। শুকনো গরমই সেকারণে তালপাতার সবচেয়ে বড় শত্রু। বাতাসের অম্লতা তালপাতার সংরক্ষণের পথে আর একটা মস্ত বাধা। সহজেই লিট্‌মাস কাগজের (Litmus paper) পরীক্ষার মাধ্যমে তালপাতার অম্লতা নির্ণয় করা সম্ভব।

আর্দ্র বাতাস তালপাতার নমনীয়তা এবং ব্যবহারযোগ্যতা বজায় রাখতে সাহায্য করলেও, স্বাভাবিকভাবেই নানাধরণের ছত্রাক আক্রমণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই ধরণের আক্রমণে তালপাতার উপরে সাদাটে, সবুজে অথবা কালচে ছোপ ধরে। এছাড়া আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কীটপতঙ্গের আক্রমণের শিকার হয় তালপাতা। পাতার অংশ খেয়ে ফেলা ছাড়াও, কীটপতঙ্গ এর উপর মলমূত্র ত্যাগ করে রাখে, যার ফলে পাশাপাশি পাতাগুলো অনেক সময় সেটে যায়।

যথাযথভাবে ব্যবহারের অভাবে তালপাতার ক্ষতি হতে পারে, বিশেষ করে প্রান্তগুলো তাড়াতাড়ি ভঙ্গুর হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। উপযুক্তভাবে বাঁধার শক্ত সুতোটি সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার না করলে পাতার মধ্যেকার ফুটোটা ক্রমশ চওড়া হয়ে যায়। যদি সাধারণ সুতো ব্যবহার না করে রেশমী সুতো ব্যবহার করা হয়, তবে পাতায় ঘর্ষনজনিত ক্ষতি কম হয়।

কিভাবে তালপাতার পাণ্ডুলিপি রাখা হয়েছে তার উপরেও ক্রমাবনতি নির্ভর করে। একটার উপর আরেকটা এইভাবে রাখা হলে চাপে তালপাতার পাণ্ডুলিপি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য ষ্টীলের তাকে (rack) প্রত্যেকটি পাণ্ডুলিপি আলাদা আলাদা করে রাখতে হবে—এতে পাণ্ডুলিপি অনেকদিন ভাল অবস্থায় থাকে। ২২°—২৫° সেঃ তাপমাত্রা এবং ৫৫% থেকে ৬০% আর্দ্রতা তালপাতার পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী পরিবেশ।

কীটপতঙ্গের আক্রমণ কমবেশী আরম্ভ হয়ে গেলে এর হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ধূপন পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। পরীক্ষার ফলে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, থাইমল এবং প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন ধূপনের ফলে ৬৫% আর্দ্রতায় সাতদিনের মধ্যেই তালপাতার যথাক্রমে ২১.৫% এবং ১১% ক্ষতি হয়। অতএব তালপাতার সংরক্ষণের জন্য থাইমল ধূপন কখনও করা উচিত নয়। নেহাৎ প্রয়োজনে প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন ধূপন করা চলে। প্রতি কিউবিক মিটারে ১৯গ্রাম হিসাবে প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন ব্যবহার করে ১৪ দিন ধরে ধূপন করতে হবে। প্রতিরোধক হিসাবে যেতাকে তালপাতার পাণ্ডুলিপি রাখা আছে সেখানে কীটপতঙ্গের আক্রমণ যাতে না হয় তার জন্য ন্যাপথালিনের বল বা থান (brick) রাখা দরকার। ছত্রাক নাশক হিসাবে ৩% প্যারানাইট্রোফেনল (Para-nitrophenol) মিথাইল অ্যালকোহলে মিশ্রণ অথবা ১০% সোডিয়াম

পেন্টাক্লোরোফেনেট (Sodium Penta-chlorophenate) জলে মিশ্রণ তালপাতার উপর ছিটাতে / স্প্রে (spray) অথবা ব্রাশ দিয়ে লাগাতে হবে।

কাগজের ক্ষেত্রে যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে তালপাতা অম্লতা শুষে নিতে পারে। এগুলো বিঅম্লীকরণ করার জন্য প্রথমে দেখতে হবে যে তালপাতায় লেখা পাতার মধ্যে কেটে বসেছে কিনা। সাধারণ-ভাবে বোঝার অসুবিধা হলে স্টেরিও-মাইক্রোসকোপ (stereo-microscope) ব্যবহারের মাধ্যমে এই কাজ সেরে নেওয়া যেতে পারে। যেসব পাতায় শলাকার সাহায্যে কেটে কেটে লেখা হয়, নরম ব্রাশ দিয়ে ধুলো ময়লা পরিষ্কার করে নিয়ে অনেক সময় দেখা যায় পাতায় নানা ধরণের দাগ হয়েছে। উপযুক্ত রাসায়নিক সাবধানতার সাথে ব্যবহার করে সেগুলো তুলে দিতে হবে, পাতার কোন ক্ষতি না করে। তারপর নরম তুলোয় রেকটিফাইড স্পিরিটের (recti-fied spirit) সঙ্গে চুন জল (৩ : ২ মাত্রায় মিশ্রণ) নিয়ে সেটা দিয়ে পাতার দুদিক মুছে পরিষ্কার করে নিতে হবে। পাতার আঁশের দৈর্ঘ্যের দিকে তুলো চালালে বেশী ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। পাতার অম্লতা চুনের জলের দ্বারা দূর করা হয়। এইভাবে পাতাকে বিঅম্লীকরণের পরে ব্লটিং কাগজের মধ্যে রেখে শুকোতে হবে।

যদি পরীক্ষার পর নিশ্চিত হওয়া যায় যে লেখাতে পাতা কেটে যায়নি, তবে সেটাকে পরিষ্কারের জন্য তুলোতে ট্রাইক্লোরোইথেন (Trichloroethane) লাগিয়ে নিয়ে তালপাতার আঁশের দৈর্ঘ্যের দিকে বুলিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এই ধরণের সচিত্র পাণ্ডুলিপি বিঅম্লীকরণের জন্য অ্যামোনিয়া গ্যাসের ব্যবহার বিধেয়। যদি এই ধরণের পাণ্ডুলিপিতে কোন দাগ ধরে যায়, তবে সেটাকে তোলার জন্য এক বিশেষ ধরণের মিশ্রণের প্রয়োজন হয়। এই বিশেষ মিশ্রণটি ১0 গ্রাম ক্লোরামিন আই (Chloramin'I') ২৫মিলি লিটার জলে মিশিয়ে একটু গরম করার পর ৫00 মিলি লিটার মিথাইল অ্যালকোহল সহযোগে তৈরী হয়। এই মিশ্রণের সাহায্যে আস্তে আস্তে দাগগুলো তুলে ফেলার পর ঐ জায়গাটা ৫0% শক্তিসম্পন্ন মিথাইল অ্যালকোহল দিয়ে মুছে নিতে হবে যাতে ক্লোরামিন আই এর রেশ না থেকে যায়।

যেসব তালপাতা তার প্রাকৃতিক তেল হারিয়ে ফেলে শুকনো এবং ভঙ্গুর হয়ে যায় সেগুলোর দুদিকে কর্পূর তেল (Camphor oil) অথবা সাইট্রোনেলা তেল (Citronella oil) ৩ : ২ মাত্রায় রেকটিফায়েড স্পিরিটের সঙ্গে মিশিয়ে

তুলোর করে বার বার লাগাতে হবে, যতক্ষণ না সেগুলোর নমনীয়তা আবার ফিরে আসে। যদি পাতায় কেটে লেখা হয়ে থাকে, তবে লেখাকে স্পষ্টতর করে তুলবার জন্য ঐ মিশ্রণে অল্প গ্র্যাফাইট পাউডার মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এইভাবে মিশ্রণ প্রয়োগের পর পাতাটি ১৫ থেকে ২০ মিনিট খোলা রেখে দেওয়া হবে। অল্প তুলোতে রেকটিফায়েড স্পিরিট লাগিয়ে সেটা দিয়ে পাতাটি পরিষ্কার করে নেওয়ার পর পাতাটি দুটো ব্লটিং কাগজের মধ্যে ১০/১২ ঘণ্টা চেপে রেখে দেওয়া হয়। যেসব তালপাতার প্রান্তগুলো ভেঙ্গে গেছে অথবা যার মাঝখানের ফুটোটা অনেক বেড়ে গেছে, সেটাকে মেরামত করার জন্য একই ধরণের এবং একই স্থূলতার তালপাতা নিয়ে খুব ধারালো কিছু (ব্লেড অথবা নরুণ) দিয়ে প্রয়োজনীয় টুকরো কেটে নিয়ে খুব সরু নরম ব্রাশ (উটের লোমের ব্রাশ শূন্য নম্বরের) দিয়ে মোইকল (Mowicol) অথবা ফেভিকল (Fevicol) জাতীয় আঠার সাহায্যে নির্দিষ্ট স্থানে লাগিয়ে নিতে হবে। তাল-পাতার অভাবে একই স্থূলতার হাতে তৈরী কাগজের ব্যবহার করা চলে, তবে সেক্ষেত্রে জুড়ে নেবার পর দরকার মত পাতার সঙ্গে মিলিয়ে কাগজে রং করে নিতে হবে। এরপর এই পাতাটি ৫% পলিভিনাইল অ্যাসিটেট (Polyvinyl acetate) টোল্যুন (Tolune) মিশ্রণের মধ্যে ডুবিয়ে নিলে লেখার কালি স্থায়ী হয় এবং পাতাটিও মজবুত হয়ে ওঠে।

অন্য ভাবেও পাতাটিকে মজবুত করে তোলা যায়, যেমন পাতলা পলিথিনের সিট (·০৩ মিমি থেকে ·০৪ মিমি স্থূলতার) পাতার দুদিকে রেখে ১২০° সেঃ তাপমাত্রায় ইস্ত্রি দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়। অথবা সেলুলোজ ট্রাই অ্যাসিটেটের পাতলা সিট যার একদিকে এক ধরণের আঠা লাগানো থাকে ৬০° থেকে ৭০° সেঃ তাপমাত্রায় ২ মিনিট চাপের মধ্যে রেখে জুড়ে নিতে হবে। এটি মোরেন টাইপ (Morane type) ল্যামিনেশন নামে পরিচিত। এইভাবে আস্তরিত অর্থাৎ ল্যামিনেশন করে নিলে তালপাতার ক্ষেত্রে ক্রমাবনতিকারী নানা ধরণের পরিস্থিতির মোকাবিলা সম্ভব হতে পারে ফলে এই পাণ্ডুলিপিগুলি সহজেই আবার ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে।

বার্চজাতীয় গাছের ছালের পাণ্ডুলিপি

বার্চজাতীয় গাছের ছালের লেখার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার উত্তর ভারতে হিমালয়ের পাহাড়ী এলাকায়, বিশেষতঃ কাশ্মীর, কুলু, মানালী এবং তার

আশপাশ অঞ্চলে ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দীতে সবচেয়ে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। হিমালয় অঞ্চলে কাশ্মীর এবং তার আশপাশ অঞ্চলে বার্চজাতীয় গাছ জন্মায়। গাছের বাইরের ছালের ঠিক নীচে যে পাতলা নমনীয় ছাল থাকে সেটাই ১ মিটার × ১ ২৫ মিটার আকারে সংগ্রহ করা হয়। এর উপরে সরু ব্রাশের সাহায্যে কার্বন কালি দিয়ে লেখা যায়। লেখার উপযুক্ত করে তৈরী করার জন্য এই ছালকে আস্তে আস্তে শুকিয়ে নেওয়া হয়, তারপর এর উপর তেল লাগিয়ে পালিশ করা হয়। এইভাবে তৈরী ছাল কয়েকটি স্তরে একটির উপর একটি করে প্রাকৃতিক আঠার মাধ্যমে জুড়ে নেওয়া হয়। বার্চজাতীয় গাছের ছালের মধ্যে কয়েকটি ভেষজ রসায়ন (যথা—স্যালিসেলিক অ্যাসিডের যৌগ) থাকে যেগুলো সংরক্ষণের সহায়ক। ফলে কীটপতঙ্গের আক্রমণে এর ক্ষতিগ্রস্থ হবার ঘটনার বিরল।

কীটপতঙ্গের আক্রমণজনিত ও অম্লতাজনিত ক্ষতি ছাড়া আর সবধরণের ক্ষতির সম্ভাবনাই বার্চছালের পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে থাকে।

ঠিক তালপাতার মতই বয়সের সাথে সাথে এবং ক্রমাগত উচ্চ হারে আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা ওঠানামার ফলে বার্চছালের আস্তরণগুলো খুলে আসে, তারি নমনীয়তা নষ্ট হয়ে দুর্বল এবং ভঙ্গুর হয়ে যায়। প্রান্ত গুলোর রং গাঢ় হয়ে লালচে হয়ে পড়ে। বার্চছালে অম্লতাজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয় না। ক্রমাগত ব্যবহারজনিত ক্ষতির ফলে বার্চছাল নরম হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। সংরক্ষণের ব্যাপারে তালপাতার মতই তাপমাত্রা ২২° থেকে ২৫° সেঃ এবং আর্দ্রতা ৫৫% থেকে ৬০% মধ্যে রাখা দরকার। আগের গ্রন্থাগারে এই ধরণের পাণ্ডুলিপি কাপড়ের বাণ্ডিলের মধ্যে চেপে বেঁধে রাখা হ'ত, কিন্তু এরফলে চাপে এবং আনুসাঙ্গিক অন্যান্য কারণে সেগুলো যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হ'ত। ভাল কার্ডবোর্ডের অথবা কাঠের বাক্সে বার্চছালের পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাগুলো আলাদা আলাদাভাবে রাখা উচিত।

বার্চছালের পাণ্ডুলিপি সারান—স্বাভাবিকভাবেই বার্চছালের উপর নানা ধরণের দাগ থাকে। কোন দাগ থাকলে সেটাকে অপসারণের জন্য কোন রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে বার্চ ছাল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বার্চছালের পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত নরম উটের লোমের ব্রাশ দিয়ে যতটা সম্ভব পরিষ্কার করতে হবে। এরপর গ্লিসারিণ এবং জল দিয়ে বার্চছালের পাণ্ডুলিপি পরিষ্কার করতে হবে—এটা করা সম্ভব একমাত্র

পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত কালিটি যদি জলপ্রতিরোধক হয়। যেক্ষেত্রে ব্যবহৃত কালিটি জলপ্রতিরোধক নয়, সেক্ষেত্রে লিসাপল-এইচ (Lissapol H) এবং অ্যালকোহলের মিশ্রণের ব্যবহারের মাধ্যমে পাণ্ডুলিপি পরিষ্কার করতে হবে। পাণ্ডুলিপির একটা পৃষ্ঠা যদি অন্য পৃষ্ঠার সঙ্গে অল্প আটকে যায় তবে ধারালো ছুরির সাহায্যে সেটা খুলে নিতে হবে। কিন্তু যদি অনেকটা অংশ জুড়ে থাকে তবে গরম প্যারাফিন তেলের মিশ্রণের ব্যবহারের মাধ্যমে আলাদা করতে হবে। এর সাহায্যে আলাদা করার সময় পাণ্ডুলিপির গায়ে লেগে থাকা সব ধুলো বালিও পরিষ্কার হয়ে যায়। এইভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করার পর কাঁচের সীটের উপর রেখে সেগুলো শুকানো হয়। শুকিয়ে যাবার পর আলাদা করা অংশগুলো পাণ্ডুলিপির যথাস্থানে কার্বোক্সিমিথাইল সেলুলোজ (Carboxy-methyl cellulose) আঠা সহযোগে আটকে দিতে হবে। যথাযথভাবে আটকাবার জন্য এবং পাণ্ডুলিপির দুর্বলতা দূর করার জন্য খুব নরম পাতলা ব্রাশের সাহায্যে পাণ্ডুলিপি এবং আলাদা হয়ে যাওয়া অংশের মধ্যে ঐ আঠা লাগাতে হবে। পৃষ্ঠার দুদিকে ঐ আঠা পাতলা করে লাগিয়ে তার ওপর জাপানী টিস্যু কাগজ জুড়তে হবে। ভবিষ্যতে যদি কখনও সিফন প্রয়োগের অথবা ল্যামিনেশনের মাধ্যমে পাণ্ডুলিপিকে আরো টেকসই করে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে খুব সহজেই টিস্যু কাগজ খুলে ফেলা যায়।

পাণ্ডুলিপির কোন পৃষ্ঠায় যদি ভাঁজ পড়ে অথবা নমনীয়তা নষ্ট হয়ে যায় তবে কোন ভেষজ তেল, যেমন সাইট্রোনেলা তেল (Citronella oil) পৃষ্ঠার দুদিকে লাগিয়ে পৃষ্ঠাটি ভাল ভাবে খুলে (যাতে ভাঁজ আর না থাকে) চাপের মধ্যে রেখে দিতে হবে ২৪ ঘন্টার জন্য। বার্চছালের এবং তালপাতার পাণ্ডুলিপিতে যদি কার্বণের কালি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং সেটা যদি ঝাপসা হয়ে আসে তবে সেটার গাঢ়ত্বের উন্নতি ঘটানো সম্ভবপর নয়।

সাধারণ ময়দার আঠা সহযোগে সিফন প্রয়োগে বার্চছালের পাণ্ডুলিপি যথেষ্ট টেকসই করে তোলা সম্ভব। অত্যন্ত দুর্বল পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থূলতার হাতে তৈরী কাগজের উপর পৃষ্ঠাকে রেখে তার উপর সিফন প্রয়োগে অত্যন্ত ভাল ফল পাওয়া যায়। এইভাবে সারান পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করার পক্ষে বেশী উপযোগী হয়ে থাকে। এছাড়াও মোরেণ টাইপ ল্যামিনেশনে সেলুলোজ ট্রাই-অ্যাসিটেটের পাতলা সীট (Celullose

tri-acetate) যার একদিকে একধরণের আঠা লাগানো থাকে ৬০° থেকে ৭০° সে তাপমাত্রায় ২ মিনিট চাপের মধ্যে রেখে জুড়ে নিতে হবে।

পার্চমেণ্ট এবং ভেলামের পাণ্ডুলিপি

এই উপকরণ লেখার সামগ্রী হিসাবে ভারতে কখনই তেমন বহুল ব্যবহৃত হয় নাই। মিশর থেকে সুরু করে গ্রীস রোম হয়ে মধ্য উত্তর এবং পশ্চিম ইউরোপে, এমন কি মধ্য এশিয়ায় এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। পার্চমেণ্ট এবং ভেলাম তৈরী, ব্যবহার এবং ক্রমাবনতি সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

চারভাবে এর ক্রমাবনতি ঘটতে পারে (ক) ভৌতিক এবং রাসায়নিক ক্ষতি (খ) কীটপতঙ্গের আক্রমণজনিত ক্ষতি (গ) ক্রমাগত ব্যবহারজনিত ক্ষতি (ঘ) রাখার ত্রুটিজনিত ক্ষতি।

সাধারণভাবে বলা চলে যে তালপাতা অথবা বার্চছালের পাণ্ডুলিপির তুলনায় এগুলো অপেক্ষাকৃত টেকসই। পার্চমেণ্টের তুলনায় ভেলাম অপেক্ষাকৃত দামী, বেশী মসৃণ, চকচকে সাদা রংএর এবং লেখার পক্ষে বেশী উপযোগী। কার্বন কালি, সোনালী অথবা রুপালী রং এর উপর লেখা হ'ত। যদিও পার্চমেণ্ট ও ভেলাম অপেক্ষাকৃত, স্থায়ী তবু অত্যধিক আর্দ্রতায় এগুলো সেঁতসেঁতে হয়ে যায় এবং অত্যধিক শুষ্কতায় খস্‌খসে হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে বয়সের সাথে সাথে এগুলোতে হলদেটে রং ধরে। অত্যাধিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার ওঠানামা এগুল্যেকে দুর্বল করে ফেলে—উপরের আস্তরণ উঠে যেতে সুরু করে—কালির রং পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ভেলামের তুলনায় পার্চমেণ্ট ছত্রাক জাতীয় আক্রমণের বেশী শিকার হয়। এদের সংরক্ষণের প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে স্থিতিশীল করা—শীতাতপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারলে সবচেয়ে ভাল। কিন্তু তার অভাবে যান্ত্রিক অথবা রাসায়নিক পদ্ধতিতে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরী। মূলতঃ চামড়া থেকে উদ্ভূত হওয়ায়, কীটপতঙ্গ ছাড়াও ইঁদুরের এর প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে এবং এদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এগুলোকে খুব শক্ত বাক্সে অথবা ষ্টীলের আলমারীর মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

প্রায়ই দেখা যায় পুরানো পার্চমেণ্ট এবং ভেলামের পাণ্ডুলিপির উপর ছত্রাক

জনিত নানা ধরণের ছোপ ধরেছে। এই ধরণের দাগ তোলার জন্য কোন অবস্থাতেই জলের ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ জলে এগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ছত্রাকের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এবং ফলপ্রসূ ব্যবস্থা হচ্ছে প্রথমে ছত্রাকের বীজগুলো (spore) শুকনো ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে, তারপর মিথাইল অ্যালকোহলে ১0% থাইমল মিশ্রণ ব্রাশ দিয়ে পাণ্ডুলিপির উপর লাগিয়ে ছত্রাকের বংশ ধ্বংস করতে হবে। অথবা পরিষ্কার করার পর প্রতি ৩ কিউবিক মিটারে ২৫0 গ্রাম থাইমল ব্যবহার করে থাইমল ধূপনের ব্যবস্থা করতে হবে, যেটি ১৪ দিন ধরে চলবে। কিন্তু এই ব্যাপারে একটা সাবধানতা অবলম্বনের দরকার আছে—দেখে নিতে হবে ব্যবহৃত কালি ধূপনে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে কিনা। খুব বেশী আর্দ্র আবহাওয়ায় থাইমল সংপৃক্ত ব্লটিং কাগজের মধ্যে পার্চমেণ্ট এবং ভেলাম পাণ্ডুলিপি রাখলে সেগুলোকে ছত্রাকের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব।

পার্চমেণ্টের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ছত্রাক নিবারক হিসাবে যে মিশ্রণটি ব্যবহার করা হয় সেটি তৈরী হয় 0·৫% শক্তি সম্পন্ন প্যারাক্লোরোমিথাইলক্রেসল (Para-chlorc-methyl-cresol)-এর সঙ্গে 0·৫% শক্তি সম্পন্ন পেণ্টাক্লোরো-ফেনল অ্যালকোহলে মিশিয়ে। যদিও ভেলামে লেখার এবং চিত্রিত করার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জল রং বা জলে দ্রবীভূত কালি ব্যবহৃত হয়েছে তবুও ঐ ব্যাপারে যথেষ্ট নিশ্চিত না হয়ে (যে লেখার কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই) কখনই জলের ব্যবহার করতে নেই, এইসব পাণ্ডুলিপিতে। ভেলাম ঘষে পরিষ্কার করা যায়। এর জন্য ওপালিন প্যাড (Opaline rubbing pads) বা ঐ জাতীয় জিনিষের ব্যবহার করা চলে। যে ক্ষেত্রে কোনো কারণে ভেলাম ধোয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সে ক্ষেত্রে অ্যালকোহল অথবা অ্যালকোহলে লিসাপোল এইচ (Lissapol-H) মিশ্রণই শুধুমাত্র ব্যবহার করা উচিত। খয়েরী দাগ ওঠাবার জন্য হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড (Hydrogen Peroxcide) সাবধানে ব্যবহার করা চলে। স্পঞ্জে অল্প মিশ্রণ লাগিয়ে সেটা দিয়ে নির্দিষ্ট অংশটি মোছার চেষ্টা করা যায়।

ভেলামের উপর কালির দাগ লাগলে ক্লোরামিন আই এর মিশ্রণ (তালপাতা, পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে এর প্রস্তুত প্রণালী এবং ব্যবহারের কথা বিশদভাবে বলা হয়েছে, ৯২ পৃঃ) ব্যবহার করতে হবে। তবে সাবধানতা হিসাবে দেখতে হবে যাতে এই মিশ্রণের রেশ ভেলামে না থেকে যায়।

কুঁকড়ে যাওয়া ভেলামের পাণ্ডুলিপি সারানোর প্রথম ধাপ হচ্ছে, তার লেখা এবং আঁকা ছবি পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে যে সেটা জলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা। যদি সে সম্ভাবনা না থাকে, তবে ০·২৫% শক্তিসম্পন্ন সোডিয়াম পেন্টাক্লোরোফেনলের জলে মিশ্রণে আর্দ্র করা ব্লটিং কাগজের মধ্যে টান করে মসৃনতলের উপর (যথা কাঁচের সীটের উপর) রেখে কাঁচের নীচে চেপে রাখতে হবে কয়েকদিন। তারপর আবার শুকনো ব্লটিং কাগজের মাঝে রেখে আগের মতই চাপে রাখতে হবে। খুব বেশী কুকড়ে যাওয়া ভেলামকে উপরোক্তভাবে ঠিক করার আগে বেশী আর্দ্র ব্লটিং চেপে নিয়ে অথবা আর্দ্রতাবর্দ্ধক কক্ষে (humidity chamber) কিছুক্ষণ রেখে নিলে বেশী ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। খুব শক্ত করে মুড়ে রাখা ভেলামের ক্ষেত্রেও বেশী আর্দ্র ব্লটিং বা আর্দ্রতাবর্দ্ধক কক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে নমনীয় করে নিয়ে তারপর চাপে রেখে খুলতে হবে।

শক্ত করে ভাঁজ করা অথবা গুটিয়ে রাখা পার্চমেণ্টের ক্ষেত্রে ৫0% অ্যাল-কোহলের সঙ্গে ১0% অ্যালকোহলে, ইউরিয়া মিশ্রণে ভিজিয়ে নিয়ে সাবধানে খুলতে হবে। খোলার পর কয়েকদিন ধরে ল্যানোলিন মাখানো হবে টান করে রেখে। পরে টান করে ব্লটিং কাগজের মধ্যে রেখে অন্তত দিন সাতেক চাপের মধ্যে রেখে দিতে হবে।

ভেলামের ছোট খাট ফুটো বন্ধ করার জন্য পাশের জায়গাগুলো ঘসে ভেলামের টুকরো দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়। বড় ফুটোর ক্ষেত্রে পিছনের দিকে একটা বড় টুকরো জুড়ে নিয়ে পরে সামনের দিকে ঠিক ফুটোর আকারে এক টুকরো ভেলাম নিয়ে সামনের দিকে পরিপাটি করে আটকে দিতে হবে। আঠা শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চাপের মধ্যে রাখতে হবে। ছেড়া অংশ মেরামতের ব্যাপারে যথেষ্ট নিপুণতার দরকার হয়। প্রান্তের দিকে ছেঁড়া সারাইয়ের ব্যাপারে আঠার ব্যবহার না করে ১0% অ্যাসেটিক অ্যাসিড ব্যবহার করা ভাল। ব্রাশে করে এই মৃদু অ্যাসিড প্রয়োগ করলে ভেলাম জিলেটিনের মত নরম হয়ে যায়, তখন দুটি প্রান্ত পাশাপাশি রেখে ঘসে দিয়ে শুকিয়ে নিলে জুড়ে যাবে। এইভাবে সারান জোড়টা সহজে নজরে আসে না অথচ টেকসই হয়। চিত্রিত পার্চমেণ্ট ধুয়ে পরিষ্কার করার জন্য যে মিশ্রণটি ব্যবহার করা হয় সেটি তৈরী করা হয় ১৬% অ্যালকোহলের সঙ্গে ১0% অ্যালকোহলে ইউ-রিয়ার মিশ্রণকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে। যেক্ষেত্রে কালি অথবা রং চটা ওঠার মত

(flaking) উঠতে থাকে, সেক্ষেত্রে ৫% দ্রবনীয় নাইলন মিথাইল অ্যালকোহলে মিশিয়ে অথবা ২% থেকে ৫% পলিভিনাইল অ্যালকোহলের টোলউন মিশ্রণ নরম ব্রাশে করে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে লাগালে স‍ুফল পাওয়া যাবে।

কাগজের পাণ্ডুলিপি ও প‍ুঁথি

চীনে প্রথম কাগজ উদ্ভাবনের পর থেকে ক্রমশঃ জাপান, এশিয়া মাইনর হয়ে সম্প‍ূর্ণ এশিয়া এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এর ব্যবহার। সহজলভ্যতা, ব্যবহারেব স‍ুবিধা ইত্যাদি কারণে এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে, ক্রমশ যার ফলস্বর‍ূপ অন্য সব লেখার মাধ্যমের ব্যবহার কমতে কমতে প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। কাগজ তার তৈরীর নানা পদ্ধতি, ব্যবহারের বহ‍ুক্ষেত্র, এবং ক্রমাবনতির নানা কারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আগেই আমরা আলোচনা করেছি। (১৮-৩৮ প‍ৃঃ) সেখানেই আমরা দেখেছি কাগজকে মোটাম‍ুটিভাবে দ‍ুভাগে ভাগ করা সম্ভব—হাতে তৈবী কাগজ এবং যান্ত্রিক উপাযে তৈরী কাগজ। এদের মধ্যে হাতে তৈবী কাগজের উপকরণ অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট মানের হওয়াতে এটি অনেক টেকসই। কাগজ ভেষজ উপকরণে তৈবী, সেকারণে উচ্চ তাপমাত্রায় এবং অত্যাধিক আর্দ্রতায় আবহাওয়া দ‍ূষণ, স‍ূর্যের আলো, অতিবেগ‍ুনী রশ্মি, প্রভৃতির প্রভাব এবং ছত্রাক, কীট পতঙ্গ, ইঁদ‍ুর ইত্যাদির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এইসব অবস্থা হাতে তৈরী কাগজের তুলনায়, যন্ত্রে তৈরী কাগজকে বেশী প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্থ করে। নানাধরণের ক্ষতি এবং ক্রমাবনতি সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

অন্যসব পাণ্ড‍ুলিপির মতই কাগজের প‍ুঁথি / পাণ্ড‍ুলিপির রক্ষা এবং সারানোর কাজের প্রথম ধাপ হচ্ছে জিনিষটি ভালোভাবে পরীক্ষা করা। সেটি করার সময় প্রায়ই দেখা যায় যে পাণ্ড‍ুলিপি থেকে কেমন যেন একটা সেঁতসেঁতে ভ্যাপ‍্সা গন্ধ বের‍ুচ্ছে। এ থেকে সহজে অন‍ুমান করা যায় আগে অথবা এখন এতে ছত্রাকের আক্রমণ ঘটেছে। এছাড়াও আন‍ুষঙ্গিক ছত্রাকজনিত নানাধরণের ছোপ ধরতেও দেখা যায়। ছত্রাকের আক্রমণের বির‍ুদ্ধে ধ‍ূপনই সবচেয়ে ফলপ্রস‍ূ পদ্ধতি—এতে ছত্রাক সম্প‍ূর্ণর‍ূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ছত্রাক জনিত ছোপ বা দাগ তুলবার জন্য ইথাইল অ্যালকোহল অথবা বেনজিনের ব্যবহার করা চলে। এই দ‍ুটি পদার্থই দাহ্য, অতএব সে ব্যাপারে সচেতনতা এবং সাবধানতা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন।

কাগজ তৈরীর উপাদানের ত্রুটি থেকে, পরিবেশের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি কারণে কাগজে অম্লতা সৃষ্টি হয়। অম্লতার জন্য কাগজের রং হলদেটে হয়ে যায় এবং সেটি ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। কাগজের অম্লতা সহজেই নীল লিট্‌মাস (blue litmus) কাগজের ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা চলে। কাগজের অম্লতা দূর করার বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যাপারে আগে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। (৩৩-৮ পৃঃ)

অনেক সময় পুরানো কাগজপত্র অনেকদিন পর নাড়াচাড়া করার সময় দেখা যায় যে তার মধ্যে পোকামাকড়ের মৃতদেহ অথবা ময়লা রয়েছে। আবার কখনও কখনও কাগজের মধ্যে নানাধরণের কীটপতঙ্গের ডিম থেকে যায়, যেটা সাধারণ চোখে দেখা যায় না। এদের বিরুদ্ধে ধূপন পদ্ধতিই সবচেয়ে ফলপ্রসূ।

কাগজের পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হচ্ছে এতে ব্যবহৃত কালির চরিত্র সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা। কয়েকটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে সেটি করা চলে, যেমন—

(ক) পাণ্ডুলিপির লেখার কোন একটি দাগের এককোনায় ৫% অ্যাসেটিক অ্যাসিডের একটি ফোঁটা ফেলতে হবে। কয়েক মিনিট পরে সাদা ব্লটিং কাগজে সেটা শুষে নিতে হবে—ব্লটিংএর ঐ ভেজা অংশে ১% পটাসিয়াম ফেরোসাইনাইড (Potassium Ferro-cyanide) মিশ্রণের একটি ফোঁটা ফেলতে হবে—এতে যদি ব্লটিং কাগজের উপর নীল রং ফুটে ওঠে তবে বুঝতে হবে লেখার জন্য লোহা ঘটিত কালির ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) পাণ্ডুলিপির লেখার কোন একটি দাগের এককোনায় ৪% শক্তিসম্পন্ন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (Sodium Hydroxide) মিশ্রণের একটি ফোঁটা ফেলতে হবে। তারপর সেটি সাদা ব্লটিং কাগজে শুষে নিতে হবে। যদি ব্লটিং কাগজে গাঢ় লালচে বাদামী / খয়েরী (dark redish brown) রংএর দাগ হয়, তবে বুঝতে হবে কালিটি লোহাঘটিত। যদি দাগটি বাদামী হয় তবে বুঝতে হবে কালিটি কাষ্ঠ (logwood) ঘটিত। বিভিন্ন ধরণের কালি এবং তার চরিত্র সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। (৩৯-৫২ পৃঃ)

সারানর কাজে এগোবার জন্য কাগজ সম্বন্ধেও কয়েকটি বিষয় জেনে নিতে হবে। সারানর কাজ অনেক সুবিধাজনক হয়ে পড়ে, যদি আমরা কাগজের আঁশ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করে নিতে পারি। এই ব্যাপারেও কয়েকটি সহজ পরীক্ষার সাহায্য নেওয়া চলে।

(ক) কাগজের উপর আয়োডিন প্রয়োগে যদি দেখা যায় যে খুব হাল্কা (প্রায় রংহীন) বাদামী ছোপ ধরেছে তবে বুঝতে হবে কাগজে রাসায়নিক কাঠের আঁশ অথবা ঘাস এবং খড়ের আঁশ ব্যবহৃত হয়েছে। যদি হলদে থেকে বাদামী রংএর মধ্যে কোন ছোপ ধরে, তবে বুঝতে হবে প্রধান উপাদান মেকানিক্যাল কাঠের মণ্ড। আবার যদি হাল্কা থেকে গাঢ় বাদামী দাগ ধরে তবে বুঝতে হবে উৎপাদনের সময় তুলো অথবা রেশমী আঁশ ব্যবহৃত হয়েছে।

(খ) কাগজের উপর জিঙ্ক ক্লোরোআইডিন মিশ্রণ প্রয়োগের ফলে যদি হলুদে দাগ ধরে তবে বুঝতে হবে কাগজের প্রধান উপাদন হচ্ছে মেকানিক্যাল কাঠের মণ্ড। যদি নীল দাগ ধরে তবে বুঝতে হবে প্রধান উপাদান হিসাবে রাসায়নিক কাঠের মণ্ড অথবা খড় এবং / অথবা ঘাসের আঁশের ব্যবহার করা হয়েছে। যদি দাগের রংটা হাল্কা লালচে বাদামী (strong wine colour) হয় তবে বুঝতে হবে তুলো বা রেশমের আঁশ প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

(গ) কাগজের উপর ফ্লোরোগ্লুসিনল মিশ্রণ (Phloroglucinol solution) প্রয়োগে যদি গাঢ় লাল দাগ পড়ে তবে বুঝতে হবে মেকানিক্যাল কাঠের মণ্ডের ব্যবহারের মাধ্যমে এটি তৈরী হয়েছে।

(ঘ) কাগজে হাবজবার্জের রং প্রয়োগে যদি দেখা যায় যে লাল দাগ হয়েছে তবে বুঝতে হবে সুতো বা রেশমের আঁশের ব্যবহার করা হয়েছে। যদি নীল দাগ পড়ে তার বুঝতে হবে রাসায়নিক কাঠের মণ্ডের ব্যবহার করা হয়েছে। যদি দাগের রং হয় হলুদ তবে বুঝতে হবে মেকানিক্যাল কাঠের ব্যবহারে কাগজটি তৈরী হয়েছে।

কাগজ পরীক্ষার পর এবং দরকার হলে ধূপনের পর ধুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে। কাগজের উপর অনেকভাবে প্রায়ই দাগ পড়ে যেগুলো সহজেই নানা রাসায়নিকের ব্যবহারের মাধ্যমে তুলে ফেলা চলে। রাসায়নিক ব্যবহারের আগে নিশ্চিত হতে হবে, যাতে এতে কালির কোন ক্ষতি না হয়। কার্বণঘটিত কালির ক্ষেত্রে এধরণের সমস্যা কম থাকে। লোহাঘটিত কালির ক্ষেত্রে (iron gall ink) ঘষে পরিষ্কার (erase) করে বিশেষ দ্রাবকের সাহায্যে উন্নতি ঘটিয়ে ধোয়া এবং বিঅম্লীকরণের ব্যবস্থা করা চলে। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত কালিকে কৃত্রিম রঞ্জনের সাহায্যে কাগজের উপর স্থায়ী করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সংরক্ষণ সম্পূর্ণ হয় না। কালি স্থায়ীকরণের জন্য যে সব রাসায়নিক মিশ্রণ সাধারণভাবে ব্যবহার করা চলে, সেগুলো হচ্ছে—

(ক) ০'৫% দ্রবণীয় নাইলনের অ্যালকোহলে মিশ্রণ।

(খ) ০'৫% থেকে ১% পলিমিথাইল মিথাক্রাইলেট (Polymethyl methacrylate) টোলিউনে মিশ্রণ।

(গ) ১% থেকে ২% পলিভিনাইল অ্যাসিটেট্ (Polyvinyl acetate) টোলিউনে মিশ্রণ।

(ঘ) ২% থেকে ১০% বেডাক্রাইলের (Bedacryle) অ্যাসিটোনে অথবা জাইলিনে (Xylene) মিশ্রণ।

কৃত্রিম কালির ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে সেটি জলে দ্রবণীয় কিনা কিংবা অন্য দ্রাবকের এর উপর বিক্রিয়া কি সেটা ভালভাবে জেনে নিয়ে তবে এগোতে হবে। এই ধরণের কালি স্থায়ী করার জন্য তার উপর স্যাণ্ডোফিক্স (Sandofix) প্রয়োগ করে নেওয়া দরকার, সংরক্ষণের অন্যান্য কাজ সুরু করার আগে।

ছাপা বইয়ের ক্ষেত্রে ছাপার কালি অনেকস্থায়ী হওয়ায় এধরণের সমস্যার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

কাগজের পুঁথি / পাণ্ডুলিপি অনেক সময় অম্লতাজনিত বিক্রিয়া অথবা ছত্রাক আক্রমণের ফলে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে—সেগুলোকে যথারীতি বিঅম্লীকরণ, ধূপন এবং পরিমার্জন করার পর নতুন করে সাইজিং (siz ng) করে টেকসই করে নেওয়া দরকার।

বিঅম্লীকরণের সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করে উপযুক্ত পদ্ধতি খুঁজে নিতে হবে—বিশেষ করে যেখানে অস্থায়ী কালি ব্যবহৃত হচ্ছে, অথবা সচিত্র পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে। অ্যালকোহলের দ্রবণের সাহায্যে ধুলো ময়লার এবং ছত্রাকের দাগ পরিষ্কার করা চলে। সচিত্র পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া গ্যাসের ১ : ১০ মিশ্রণের সাহায্যে বিঅম্লীকরণ করা চলে। (বিঅম্লীকরণের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আগে করা হয়েছে। (৩৩-৩৮ পৃঃ)

পাণ্ডুলিপির উপর পেন্সিলের দাগ বিঅম্লীকরণ, ধূপন এমন কি অন্য সাধারণ পরিষ্কার করার ব্যবস্থায় তোলা যায় না। যদি লেখা অংশের বাইরের খালি জায়গায় (margin) পেন্সিলের লেখা থাকে, তবে সেটিকে ৫% পলিভিনাইল অ্যাসিটেট টোলিউনে মিশ্রণের প্রয়োগের মাধ্যমে রক্ষা করা যায়। এই মিশ্রণ নরম পাতলা তুলি দিয়ে আস্তে আস্তে প্রয়োগে সংরক্ষণের সময় নানারকমের প্রক্রিয়া থেকে একে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

অনেক সময় দেখা যায় পাণ্ডুলিপি যথেষ্ট টেকসই অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও

ভাঁজ পড়ে বা কুঁচকে গিয়ে নানা সমস্যা সৃষ্টি করছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি টেকসই থাকায় এগুলোকে টানটান করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা বড় একটা শক্ত কাজ নয়। সাবধানতার সঙ্গে এগুলোকে খুলে আর্দ্র ব্লটিং-এর মধ্যে রেখে কয়েক সপ্তাহের জন্য মৃদু চাপের মধ্যে রেখে দিতে হবে। এই পদ্ধতি প্রয়োগের সময় যদি জলে ব্লটিংকে আর্দ্র না করে ০'২৫% থাইমলের অ্যালকোহলে মিশ্রণ অথবা ০'০১% সোডিয়াম অরথোফেনল ফেনেট (Sodium Orthophenyl Phenate) ব্যবহার করা হয় তবে এই প্রক্রিয়া চলার মধ্যেই পাণ্ডুলিপির মধ্যেকার অবশিষ্ট কীট বা ছত্রাক (যদি থেকে থাকে) ধ্বংস হয়ে যায়।

গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার সংগ্রহের শত্রু এবং তার প্রতিকার

গ্রন্থাগার সংগ্রহে যেসব জিনিষের দেখা আমরা পাই তার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জৈব/ভেষজ পদার্থ থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে এই অংশই সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়মেই জৈব পদার্থ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই রূপান্তর গ্রন্থাগার সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঘটলেই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গ্রন্থাগার সংগ্রহের প্রধান কাজ হল তার পাঠক বা ব্যবহারকারীকে জ্ঞান / তথ্য (information) প্রদানের অনুকূলে কিছু উপাদান সরবরাহ করা। এই কাজ বস্তুগত কারণে বাধাপ্রাপ্ত বা ব্যাহত হলেই সেটাকে ক্ষতির অবস্থা বলে ধরা যায়। ক্ষতি তিন রকমের হতে পারে, যথা—রাসায়নিক (chemical), ভৌত (physical) এবং জৈব (biological)। এই সব ক্ষতিকে কোন অবস্থায়ই এমন পর্যায় পেঁছিতে দেওয়া উচিত নয়, যখন গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগার সংগ্রহ তার পরিসেবামূলক কর্তব্য পালনে অক্ষম হয়ে পড়বে।

সহজেই অনুমেয় যে গ্রন্থাগার সংগ্রহেব ক্ষতির কাবণগুলি গ্রন্থাগারের পারিপার্শ্বিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর নির্ভরশীল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গ্রন্থাগারের পরিবেশে উপস্থিত কয়েকটি উপাদান এই ধরণের ক্ষতি ঘটিয়ে থাকে, গ্রন্থাগার সংগ্রহের জৈব / ভেষজ পদার্থের উপর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। গ্রন্থাগারের অবস্থান (location), আবাসনের বিভিন্ন দিক (housing structure and cons ruction) এবং জলবায়ু / আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে সংগ্রহের কোন কোন জিনিষ কি কি ভাবে রূপান্তরিত/আক্রান্ত/ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষে মরুভূমির উগ্র তাপ, পার্বত্য অঞ্চলের প্রচণ্ড শীত, দীর্ঘস্থায়ী বর্ষা থেকে সুরু করে সব ধরণের জলবায়ু ও আবহাওয়ারই দেখা পাওয়া যায়। স্বভাবতই প্রতিটি বিশেষ অঞ্চলের সমস্যা আলাদা। রাজস্থানের মরুপ্রায় অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের সমস্যার মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া

যাবে না। তেমনি কাশ্মীরের শীতপ্রধান আবহাওয়ার সঙ্গে কেরলের বৃষ্টিবহুল আবহাওয়ার মধ্যে যে মৌলিক অমিল, তারই প্রতিফলন দেখা যায় ঐ অঞ্চলের গ্রন্থাগার সংগ্রহের নানা ধরণের সমস্যার ক্ষেত্রে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে মরুভূমির আবহাওয়ায় ধুলো গ্রন্থাগার সংগ্রহের উপর ঘর্ষণজনিত (abrasive) ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটায়। কিন্তু আর্দ্র আবহাওয়ায় সেই ধুলোই ছত্রাকের আক্রমণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার শহর কলিকাতার ধুলো, যার মধ্যে পরিবেশ দূষণজনিত অনেক রাসায়নিক পদার্থের কণা থাকে, ছত্রাকের আক্রমণকে সাহায্য করা ছাড়াও গ্রন্থাগার সংগ্রহের (কাগজ, চামড়া ইত্যাদির) উপর অম্লতাজনিত ক্ষতি এবং মসৃণ উপরিভাগে ঘর্ষণজনিত ক্ষতি ঘটাতে পারে।

আমরা আগেই বলেছি যে ক্ষতিকারক পদার্থ তিন রকমের ক্ষতি করতে পারে, যথা রাসায়নিক, ভৌত এবং জৈব। একই ক্ষতিকারক উপাদান আবার একাধিক ক্ষতি করতে পারে, যেমন জল (আর্দ্রতা): চামড়া, পার্চমেন্ট, ভেলাম, কাগজ ইত্যাদিকে আর্দ্রতা ফুলে উঠতে সাহায্য করে—ভৌত ক্ষতি; কাগজে উপস্থিত রাসায়নিক পদার্থগুলিকে সক্রিয় করে (active) রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে দিতে পারে—রাসায়নিক ক্ষতি; অথবা এর উপস্থিতি ছত্রাকের বিস্তারে / বংশ বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে—জৈব ক্ষতি। যদিও ছত্রাকের আক্রমণকে জৈব ক্ষতি হিসাবে ধরা হয়, তবু এইটি শেষ পর্যন্ত ভৌত ক্ষতিতেই পর্যবসিত হয়।

গ্রন্থাগার সংগ্রহের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি একটি জটিল সমস্যা। গ্রন্থাগার সংগ্রহের গঠনপ্রণালীর মধ্যেও এই ক্রমাবনতির বীজ লুকিয়ে থাকে, কিন্তু বিভিন্নধরণের ক্ষতিকারক পদার্থ—প্রত্যেকে এককভাবে অথবা কখনও কখনও সঙ্ঘবদ্ধভাবে এক বা একাধিক ক্ষতির সূত্রপাত করে। গ্রন্থাগারিককে তার সংগ্রহের ক্রমাবনতির কারণ এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে ভালভাবে অবহিত হ'তে হবে যাতে এর প্রতিকারের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

গ্রন্থাগার সংগ্রহের পক্ষে ক্ষতিকারক যে সব উপাদানের কথা সচরাচর আমরা জানতে পারি, সেগুলো হচ্ছে—

(১) আবহাওয়া
(২) অত্যধিক তাপ

(৩) আর্দ্রতা
(৪) আলো
(৫) পরিবেশ দূষণজনিত নানাবিধ ক্ষতিকারক গ্যাস—ধোঁয়া
(৬) ধুলো, বালি, ময়লা
(৭) ছত্রাক—ভাইরাস, জীবাণু
(৮) কীটপতঙ্গ
(৯) ইঁদুর এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য প্রাণী
(১০) মানুষ
(১১) প্রাকৃতিক দুর্যোগ—বন্যা
(১২) আগুন

আবহাওয়া

আবহাওয়ার দুটি মুখ্য উপকরণ হচ্ছে তাপ আর আর্দ্রতা। এই দুটি অতিরিক্ত উঠানামা করলে, সেটা গ্রন্থাগার সংগ্রহের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক। সাধারণ চোখে ধরা না পড়লেও প্রতি বস্তুই তাপের উঠানামা দ্বারা সঙ্কুচিত এবং প্রসারিত হয়—এর ফলে ক্রমাবনতি যে রূপে দেখা দেয়, সেটা হচ্ছে বস্তু দুর্বল হয়ে ভঙ্গুর হয়ে যায়। অনুরূপভাবে আর্দ্রতাব ক্রমাগত পরিবর্তন সংগ্রহের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

এইসব ক্ষতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে মোটামুটি একই তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা গ্রন্থাগারের মধ্যে রাখা সম্ভব হয়। যদি শীততাপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তবে সেটাই সবচেয়ে ভাল। কারণ এরফলে গ্রন্থাগারের ভেতরেব আবহাওয়াকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্বে রাখা সম্ভব, যাতে শুধু আবহাওয়াই নয় আরো অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, যথা—ধুলো বালি, ময়লা, পরিবেশ দূষণজনিত নানা ক্ষতিকারক গ্যাস, ছত্রাক ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের মত দেশে এধরণের ব্যবস্থার ব্যাপক প্রয়োগের কথা চিন্তা করা বাতুলতা। খুব বড় অথবা বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগারের সামান্য ভগ্নাংশের পক্ষে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক শীতাতাপনিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার প্রয়োগ সম্ভব হতে পারে, কিন্তু অন্য অধিকাংশকেই খুঁজতে হবে স্বল্প খরচের কার্যকর বিকল্প পদ্ধতি।

তাপ

তাপের সম্পূর্ণ অভাব বা অ্যাবসলিউট জিরো (absolute zero) তাপমাত্রা গ্রন্থাগারের পক্ষে একটি অবাস্তব অবস্থা। তাই স্বাভাবিকভাবে কিছু না কিছু তাপ গ্রন্থাগারে থাকবেই। অল্প তাপ অথবা অত্যধিক তাপ গ্রন্থাগার সংগ্রহের উপরে কিভাবে কাজ করে সেটা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তার বিক্রিয়ার ফল আমরা চোখে দেখতে পারি—যেমন অত্যাধিক তাপে কাগজ ভঙ্গুর হয়ে যায়, চামড়া তার নিজস্ব তেল হারিয়ে ফেলে যাতে সেটি রুক্ষ এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। ম্যাগনেটিক টেপের—সাউণ্ড এবং ভিডিও-দুইএরই স্থায়িত্ব হ্রাস পায়। তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি রাসায়নিক এবং ভৌত ক্রমাবনতির পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী এক সহায়ক, মূলতঃ দুইটি কারণে। প্রথমতঃ তাপের তারতম্য প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব ভৌতিক ধর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, দ্বিতীয়তঃ প্রায় প্রতিটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি তাপমাত্রায় পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল।

তাপ একধরণের শক্তি (energy)। এই শক্তি এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে কিংবা একই বস্তুর এক অংশ থেকে অন্য অংশে সঞ্চালনে সক্ষম। তাপ সঞ্চালন তিনভাবে হতে পারে, যথা—পরিচলন (convection), পরিবহন (conduction), বিকিরণ (radiation)। যখন কোন তপ্ত মাধ্যমের দ্বারা বাহিত হয়ে তাপ এক জায়গা থেকে অন্যত্র যায় তাকে পরিচলন, যখন একই বস্তুর অণুর মাধ্যমে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে বাহিত হয় তখন তাকে পরিবহন ; এবং যখন কোন তপ্ত বস্তু থেকে তাপ মাধ্যম ছাড়াই অপেক্ষাকৃত কম তাপের দিকে ধাবিত হয় তাকে বিকিরণ বলা হয়। যেভাবেই তাপ প্রবাহিত হোক না কেন সেটি এককভাবে ক্রমাবনতি বড় একটা ঘটায় না। যেসব ক্রমাবনতি তাপের প্রভাবে আমরা হতে দেখি, তার প্রায় সবগুলিই অন্য কোন এক বা একাধিক ক্রমাবনতিকারক উপাদানের সঙ্গে যুক্তভাবে ঘটে থাকে। ঐ ধরণের উপাদানের মধ্যে আর্দ্রতা, সূর্যরশ্মি, বায়ুদূষণ ইত্যাদি আছে। তাপমাত্রার বৃদ্ধি রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্রুততর করে—সাধারণভাবে বলা হয় প্রতি ১০° সেঃ তাপ বৃদ্ধি রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি দ্বিগুণ করে। সেলুলোজের ক্ষেত্রে ৫° সেঃ বৃদ্ধিতেই বিক্রিয়ার গতি দ্বিগুণ হয়।

যদিও আজ আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে অপেক্ষাকৃত নীচু তাপমাত্রায়

গ্রন্থাগার সংগ্রহগুলি বেশী ভালভাবে সংরক্ষিত হয়, তবু গ্রন্থাগারের ভিতরের তাপমাত্রা খুব বেশী নীচে নামানো বাস্তব দিক থেকে সম্ভব নয়।

অত্যধিক তাপের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরী। যেখানে শীতাতপনিয়ন্ত্রক যন্ত্রের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, সেখানে অন্যভাবে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে; যথা ঘরের যেদিকে সরাসরি রোদ পড়ে সেদিক থেকে তাকগুলো যতটা সম্ভব সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সরাসরি রোদ ঘরে যাতে না ঢুকতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে, জানালায় পর্দা অথবা রৌদ্র নিরোধক ব্যবস্থা বা রঙ্গীন কাচের (হলুদ অথবা সবুজ) ব্যবহারের মাধ্যমে। বাড়ীর নক্সা যদি এমনভাবে করা হয় যাতে ঘরে রোদ না ঢুকতে পারে, তবে সেটা সবচেয়ে ভাল। ঘরে বাতাস চলাচল যাতে ভালভাবে করে তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে, দরকার হলে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবহারের মাধ্যমে। বাইরের গরম বাতাস যাতে গ্রন্থাগারের মধ্যে না ঢুকে পড়ে তারও চেষ্টা করতে হবে। গ্রন্থাগারের ভেতরের তাপমাত্রা ২২° থেকে ২৩° সেঃ কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করা উচিত।

আর্দ্রতা

বাতাসে বাষ্পরূপে উপস্থিত জলই হচ্ছে আর্দ্রতার কারণ। বাতাসের প্রতি একক পরিমাপে উপস্থিত জলীয় বাষ্পকে নিরপেক্ষ আর্দ্রতা (absolute humidity) বলে। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা (relative humidity) নির্ধারণ করা হয় এইভাবে—

$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা} = \frac{\text{বিশেষ তাপমাত্রায় বাতাসে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ}}{\text{ঐ তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প বাতাসে থাকতে পারে}} \times ১০০$$

বাতাসের তাপমাত্রা যত বেশী হবে তার জলীয়বাষ্প ধারণের ক্ষমতা ততই বাড়বে। আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা দুইটি মিলিতভাবে সংগ্রহের দ্রুত ক্রমাবনতি ঘটায়।

বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ অত্যন্ত কম হলে কাগজ, পার্চমেণ্ট, ভেলাম, চামড়া সবই শুকিয়ে ভঙ্গুর হয়ে যায়। আবার এর পরিমাণ অত্যধিক হলে গ্রন্থাগারের আবহাওয়া সেঁতসেঁতে হয়ে পড়ে বোর্ড ফুলে ওঠে, ছত্রাক জন্মাবার

অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়। আর্দ্রতাজনিত ক্ষতি মোটামুটি তিনভাবে হয়, (১) জীবাণু / ছত্রাকের জন্ম এবং প্রসারের সহায়তার মাধ্যমে ; (২) সংগ্রহের কাপড় ইত্যাদির রং নষ্ট হয়ে (fading) যাওয়ার মাধ্যমে ; (৩) বাতাসে, কাগজে এবং অন্যান্য উপকরণে যে সব রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে তার সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে অম্লতাজনিত এবং অন্যান্য ক্ষতি করে। আর্দ্রতার ক্ষতিসাধনের ক্ষমতাগুলোতে তাপমাত্রার (পরিবেশের এবং ক্ষতিগ্রস্থ বস্তুর দুইয়েরই) এক বিশেষ অবদান আছে। আর্দ্রতা অত্যাধিক হলে আরো যে সব ক্ষতি ঘটতে পারে তার মধ্যে একটি হচ্ছে আর্ট কাগজ বা ক্যালেণ্ডার করা কাগজ অতিরিক্ত আর্দ্রতা শুষে নেওয়ায় এর উপরকার আস্তরণ (coating) নরম হয়ে গিয়ে পাশের পৃষ্ঠার সাথে জুড়ে যেতে পারে যেগুলো পরবর্তীকালে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। আর্দ্রতা বাঁধাই বা অন্য কাজে ব্যবহৃত আঠাকে নরম করে দিতে পারে, যার ফলে বাঁধন আলাদা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। দেওয়াল অথবা মেঝে যদি অত্যাধিক সেঁতসেঁতে হয়ে যায় তবে কাগজপত্র তার থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা ভাল। আরও নজর রাখতে হবে যাতে ছত্রাকের আক্রমণ সুরু না হয়।

আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণই এর প্রতিকারের শ্রেষ্ঠ উপায়। শীতাতপনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫0% থেকে ৫৫% এর মধ্যে রাখতে পারলে সবচেয়ে ভাল। কিন্তু যেসব জায়গাতে এ ব্যবস্থা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে ঘরের নানা জায়গাতে আর্দ্রতা নিরোধক রাসায়নিক পদার্থ যেমন জলবিহীন (anhydrous) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, সিলিকা জেল, অ্যাকটিভেটেড্ অ্যালুমিনা, অ্যাক্টিভেটেড্ বক্সাইড ইত্যাদি ছিটিয়ে করে রেখে দিলে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত হবে। আজকাল যান্ত্রিক উপায় আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিও চালু হয়েছে। অত্যাধিক আর্দ্রতাজনিত ঘরের (বিশেষভাবে দেওয়াল এবং মেঝের) সেঁতসেঁতে ভাব কাটাবার জন্য ঘরে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবহারের মাধ্যমে যথেষ্ট বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আলো

আলো সম্বন্ধে আলোচনায় সুরুতেই সূর্যরশ্মি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে নেওয়া দরকার। রাসায়নিক এবং ভৌতিক ক্রমাবনতি সহায়ক বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সূর্যরশ্মির (যাকে সাধারণভাবে আমরা

রোদ বলে থাকি) ক্ষমতা সুদূরপ্রসারী। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এই যে সাধারণত গ্রন্থাগারের ভেতরে সরাসরি সূর্যরশ্মি খুব কমই আসতে পারে। সূর্যালোকের মধ্যে থাকলে রঙ্গীন বস্তুর (কাপড় বা কাগজ ইত্যাদি) রং নষ্ট হয়ে যায়। রোদের সঙ্গে তাপও থাকে, সেকারণে কাগজ, চামড়া, পার্চমেন্ট ইত্যাদির উপর তাপেরই অনুরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—সেগুলো দুর্বল এবং ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। প্রতিফলিত সূর্যালোকেও ক্ষতি হয় তবে সরাসরি রোদের তুলনায় অনেক কম। আগেই বলা হয়েছে গ্রন্থাগার ভবনের নক্সা এমন হওয়া উচিত যাতে রোদ কখনই সরাসরি ঘরের মধ্যে ঢুকতে না পারে। যেসব ঘরে রোদ ঢোকে সেখানে জানালায় পর্দা বা রোদ নিরোধক রঙ্গীন কাচের (হলুদ বা সবুজ) অথবা অনুরূপ অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

রাসায়নিক এবং ভৌত ক্ষতি যেসব কারণে ঘটে তারমধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হ'ল আলো। এখানে আলো বলতে আলোক তরঙ্গসমষ্টির সম্পূর্ণটাই বোঝানো হয়েছে—যার মাঝের খুব অল্প অংশই দৃশ্যমান আলো এবং তার একদিকে আছে অতিবেগুনী রশ্মি (ultra-violate ray) আর অন্যদিকে অবলোহিত (infra-red ray) রশ্মি। এর সব অংশই গ্রন্থাগারের ভিতরে থাকলে সংগ্রহের ক্ষতি করতে পারে। এর প্রতিটি অংশের তরঙ্গ দৈর্ঘ ভিন্ন। তরঙ্গ দৈর্ঘ যত কম হবে ক্ষতিকরার ক্ষমতা ততই বেশী—সেকারণে অতিবেগুনী রশ্মির ক্ষতিকারক ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী, অন্যদিকে অবলোহিত রশ্মির অপেক্ষাকৃত কম। সৌভাগ্যবশতঃ পৃথিবীর চারিদিকের ওজোন (Ozone) গ্যাসের যে স্তর (Ozone belt) রয়েছে সেটি অতিবেগুনী রশ্মি থেকেও ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকে পৃথিবীতে পৌঁছোতে দেয় না। এমন কি সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির একটা অংশ ঐ স্তরে এবং তারপরের বাতাসের স্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হারিয়ে যায়। জানলার রঙ্গীন কাচ রোদের শতকরা ২৫ ভাগ অতিবেগুনী রশ্মিকে আটকে দেয়। সেই সঙ্গে অবলোহিত রশ্মির একটা বড় অংশও এখানে আটকা পড়ে।

আলো একধরণের শক্তি। এর প্রভাবে গ্রন্থাগার সংগ্রহের উপর রাসায়নিক ক্ষতি হয়। যে কোনো ধরণের ক্ষতি বা ক্রমাবনতির জন্য বাইরের কোন সক্রিয় শক্তির দরকার হয়। এই সক্রিয় শক্তি বিভিন্ন মাধ্যমের জন্য ভিন্ন হয়ে থাকে। গ্রন্থাগার সংগ্রহের মধ্যে কাগজ, চামড়া, কালি, কাপড় ইত্যাদির ক্ষেত্রে আলো এধরণেরই একটি সক্রিয় শক্তি।

আলোর উপস্থিতিতে রাসায়নিক ক্ষতির (যাকে আলোক-রাসায়নিক (photo-chemical) ক্রমাবনতি বলা চলে) ফলে ফিকে হয়ে যায়, শুকিয়ে ভঙ্গুর হয়ে যায়। এই ক্রমাবনতি ঘটে এইভাবে—আলোর উপস্থিতিতে বাতাসের অক্সিজেন কাগজ, চামড়া ইত্যাদির অণুর সাথে বিক্রিয়া সুরু করে। একবার এই বিক্রিয়া সুরু হবার পর, যদি আলো থেকে জিনিষগুলো সরিয়ে রাখা যায়, তবু কিন্তু বিক্রিয়া থামবে না। এইজন্য মনে রাখা দরকার আলো বিক্রিয়া শুরু হবার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু বিক্রিয়া চলা না চলা এই শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়।

আলোব ফলে ক্রমাবনতি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নজরে আসে না। প্রথমে কাগজ ইত্যাদি আলোতে থাকার ফলে আস্তে আস্তে সক্রিয় হয়ে উঠে—এই অবস্থা পর্যন্ত মাধ্যমের উপর কোন পরিবর্তনই দেখা যায় না। যখন মাধ্যম সম্পূর্ণ সক্রিয় হযে ওঠে একমাত্র তখনই রাসায়নিক বিক্রিয়া সুরু হয়। কোন মাধ্যম কতক্ষণ আলোতে থাকলে সেটি বিক্রিয়ার পক্ষে সক্রিয় হবে, সেটা নির্ভব করে মাধ্যমের চরিত্রের উপর।

গ্রন্থাগার সংগ্রহেব পক্ষে আলো যতই ক্ষতিকর হোক না কেন—আমাদের পক্ষে অন্ধকারে গ্রন্থাগার চালানো সম্ভব নয়। সুতরাং আলোজনিত কিছুটা ক্ষতি সব গ্রন্থাগারকেই মেনে নিতে হবে। কিন্তু এই ক্ষতি যেন একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম না করে। সেটা করা সম্ভব আলোর প্রকৃতি এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং দরকার মত জিনিষপত্র (বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্লভ সংগ্রহ) আলো থেকে সরিয়ে রেখে। এই ব্যাপারটা আরো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে গ্রন্থাগারের দুর্লভ সংগ্রহের প্রদর্শনীর সময। কারণ মোটামুটিভাবে বলা চলে—

মোট আলোক সম্পাতকরণ = সময় × আলোর পরিমাণ

. গ্রন্থাগারের ভিতরের আলোর উৎস মোটামুটি তিনটি—সূর্যের অর্থাৎ দিনের আলো, ফ্লুরোসেন্ট টিউবলাইট, ইনক্যানডেসেন্ট বালব। এর মধ্যে সূর্যের আলো সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। ইনক্যানডেসেন্ট বালবের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের সাহায্যে টাঙস্টেন তারের কুণ্ডলিকে উত্তপ্ত করে তার থেকে আলো উৎপাদান করা হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তির অধিকাংশই তাপে রূপান্তরিত হয় (১০০ ওয়াটের বালবের ক্ষেত্রে প্রায় ৯৪%), বাকীটা আলোতে। কিন্তু এই আলোর মধ্যে ক্ষতিকারক অতিবেগুনী বা ঐ ধরণের রশ্মির পরিমাণ নগন্য।

টিউবলাইটের ক্ষেত্রে টিউবের মধ্যেকার পারদ বাষ্পের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালিত করে অতিবেগুনী রশ্মি উৎপাদন করা হয়। টিউবের ভেতরের দিকে ফসফরের (Phosphor) যে আস্তরণ আছে, সেটা ঐ রশ্মি শুষে নিয়ে দীর্ঘতর তরঙ্গের দৃশ্যমান আলো বিকিরণ করে। এই আলোর ক্ষেত্রে টিউব ছাড়া একটি নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করা হয়। যদিও টিউবে তেমন তাপের সৃষ্টি হয় না, তবু নিয়ন্ত্রকে কিছু তাপের সৃষ্টি নিশ্চয়ই হয়। টিউবের ভেতরের ফসফরের চরিত্রের উপর টিউবলাইটের আলোর রং এবং তার মধ্যে অতিবেগুনী রশ্মির পরিমাণ নির্ভর করে। এই আলোতে অতিবেগুনী রশ্মি থাকে। কিন্তু তার পরিমাণ দিনের আলোয় যে পরিমাণ অতিবেগুনী রশ্মি থাকে তার তুলনায় অনেক কম। অতএব গ্রন্থাগার সংগ্রহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকারক থেকে সুরু করে সবচেয়ে কম ক্ষতিকারক আলোগুলিকে যদি সাজানো যায়, তবে সেটা হবে এরকম — সরাসরি সূর্যালোকে—প্রতিফলিত সূর্যালোক—সরাসরি দিনের আলো—প্রতিফলিত দিনের আলো– ঠাণ্ডা সাদা ফ্লুরোসেণ্ট টিউবলাইট—সাদা ফ্লুরোসেণ্ট টিউবলাইট—ইন্‌ক্যানডেসেণ্ট বালব। যদি সরাসরি সূর্যালোকের ক্ষতির ক্ষমতাকে ১০০ ধরা যায়, তবে কোন আলোর কতটা ক্ষতিকারক ক্ষমতা, সেটা বোঝা যাবে নীচের সারণী থেকে যেখানে পরিস্রুত আলোর (filtered light) ক্ষতিকারক ক্ষমতাও সূচিত হয়েছে।

বিভিন্ন আলোর ক্ষতিকারক ক্ষমতাসূচক সারণী

আলো	অপরিস্রুত	পরিস্রুত
সরাসরি সূর্যরশ্মি	১০০	৮·৫
সরাসরি দিনের আলো (মেঘলা দিনে)	৩১·৭	৫·১
ঠাণ্ডা টিউব লাইট	১১·৫	৩ ১
টিউব লাইট	৯·২	১·৮
ইন্‌ক্যানডেসেণ্ট বালব	২·৮	১·৩

যদিও সংরক্ষণের পক্ষে নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকারই সবচেয়ে অনুকূল, কিন্তু সেটার ব্যবস্থা করা কার্যক্ষেত্রে সম্ভব বা সমীচীন হয়। অতএব আলো আর অন্ধকারের মধ্যেই একটা পথ আমাদের বেছে নিতে হবে, যা ব্যবহারিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে সুবিধাজনক—গ্রন্থাগারের ভেতরের আলোর

পরিকল্পনা করার সময় এটা মনে রাখা দরকার। দৃশ্যমান আলোর নির্বাচন এমন ভাবে করতে হবে যাতে সেটা সবচেয়ে কম ক্ষতিকারক হয় এবং ঘরের আলো সর্বত্র সমান পরিমাণে ছড়ায়। সাধারণভাবে গ্রন্থাগারের ভিতরের আলো যাতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী না হয় (৩৫ ফুটক্যান্ডাল (foot candle) সেটাও দেখতে হবে।

পরিবেশ দূষণজনিত নানাবিধ ক্ষতিকারক গ্যাস, ধোঁয়া

গত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে নানা পর্যায়ে নানা পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ দূষণের কথা শোনা যাচ্ছে। ঘটনাটা নতুন নয়, কিন্তু আস্তে আস্তে এর ব্যাপকতা বেড়ে এখন এটি বেশ কিছুটা বিপজ্জনক অবস্থায় পেঁাছেছে। বেশ অনেকদিন আগে থেকেই গ্রন্থাগারিকরা, বিশেষ করে যাঁরা সংরক্ষণের সঙ্গে জড়িত, এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ও ভাবিত। যদিও পরিবেশ দূষণের ঘটনা বহু পুরানো, কিন্তু শিল্পবিপ্লবের আগে পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল নগণ্য। তারপর থেকে দ্রুত কলকারখানা স্থাপনের মাধ্যমে এর পরিমাণ বেড়ে গেছে অনেকখানি, প্রসারও ঘটেছে প্রায় অপ্রতিরোধ্য দ্রুতগতিতে।

সাধারণভাবে বাতাসের উপাদানগুলি হ'ল নাইট্রোজেন (৭৮%), অক্সিজেন (২০·৯৫°/。), আর্গন (০·৯৪°/。), কার্বন ডাই-অক্সাইড (০·০৩°/。), অন্যান্য গ্যাস (নিয়ন, হিলিয়াম, মিথেইন, ক্রিপটন, নাইট্রাস অক্সাইড, হাই-ড্রোজেন, জেনন, ওজোন ইত্যাদি) (০·০৮°/。)। কিন্তু পরিবেশ দূষণজনিত দূষিত বাতাসে উপরের উপকরণগুলি ছাড়াও যেসব পদার্থ থাকতে পারে সেগুলো হচ্ছে—গ্যাসীয় অবস্থায় কার্বন মোনোক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ওলেফিন, অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বণ গোষ্ঠী, অ্যালডিহাইড, প্যারাফিনস্, হাইড্রোজেন সালফাইড, হ্যালোজেন যৌগ, ইত্যাদি, কঠিন পদার্থ অথবা পদার্থের কণা হিসাবে—ধুলো, ধোঁয়া, ময়লা, কয়লার গুঁড়ো, ছাই, ক্যালসিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং নাইট্রেট, ক্লোরাইড, কয়েক ধরণের অক্সাইড, আলকাতরা, ভুষো-কালি, ছত্রাকের বীজ (spores), বীজাণু ইত্যাদি। এই সবই হচ্ছে দূষণের উপকরণ। বাতাসে এর পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হলেও ক্ষতিকারক ক্ষমতায় এরা যথেষ্ট। সাধারণভাবে বলা যায় যানবাহন, উৎপাদনশীল শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (বিশেষ করে তাপবিদ্যুৎ), ফেলে দেওয়া আবর্জনা ইত্যাদিই

মুখ্যতঃ এই দূষণের কারণ। প্রাচীনতম দূষণকারক পদার্থ হচ্ছে রান্নার জন্য ব্যবহৃত কাঠ বা কয়লা। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই কয়লার দূষণকারক ক্ষমতার কথা জানা ছিল—যথাযথভাবে না জ্বললে কয়লা থেকে সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বণ মোনোক্সাইড এবং কয়েক ধরণের হাইড্রোকার্বণের উৎপত্তি হয়।

আনুপাতিক হিসাবে বাতাসে পরিবেশ দূষণজনিত পদার্থের পরিমাণ খুবই অল্প—শহরাঞ্চলে অথবা শিল্পাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে এর পবিমাণ কিছুটা বেশী। ১৯৬৫ সাল নাগাদ এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে সারা বছরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বায়ুদূষণ ঘটিত পদার্থের মোট ওজন ১২৫০ লক্ষ টন।* নীচের হিসাব থেকে অবস্থা খানিকটা বোঝা যাবে—

আমেরিকায় বায়ুদূষণের পরিমাণ

দূষিত পাদার্থ	লক্ষ টন প্রতিবছর	%
কার্বণ মোনোক্সাইড	৬৫০	৫২%
সালফার ঘটিত অক্সাইড	২৩০	১৮%
হাইড্রোকার্বণ গোষ্ঠীর পদার্থ	১৫০	১২%
নানাধরণের কঠিন পদার্থের কণা	১২০	১০%
নাইট্রোজেন ঘটিত অক্সাইড	৮০	৬%
অন্যান্য ধোঁয়া এবং গ্যাস	২০	২%
	১২৫০	১০০%

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে আমাদের শহর এবং শিল্পাঞ্চলে বায়ুদূষণের অবস্থা আমেরিকার তুলনায় বেশী খারাপ। কারণ ঐদেশে দূষণনিরোধক যেসব আইনকানুন চালু আছে তার বেশীরভাগই আমাদের দেশে প্রচলিত নেই, অল্প যে কয়েকটা আছে, সেগুলোও খুব কম ক্ষেত্রে যথাযথভাবে মেনে চলা হয়।

১৯৩০ সালে ইউরোপ এবং আমেরিকার ১৫টি শহরে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা যায় যে প্রতি বছর প্রতি বর্গ মাইল অঞ্চলে গড়ে ১১ থেকে ১৯০ টন সালফিউরিক অ্যাসিড থিতিয়ে পড়ে। ১৯৮২ সালে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারার

* Hanks. James J. and Kube, Harold D. Industry : action to control pollution. *Harvard Business Review* V 44, Sept-Oct 1966. 49-62.

আমেরিকার বায়ুদূষণের উৎস*

বিবিধ উৎস	লক্ষ টন প্রতিবছর	%
যানবাহন	৭৪৮	৫৯ ৯%
উৎপাদনধর্মী শিল্প	২৩৪	১৮.৭%
বিদ্যুৎ উৎপাদন	১৫৭	১২.৫%
নানাধরণের গরম রাখার ব্যবস্থা	৭৮	৬ ৩%
জঞ্জাল ফেলার ব্যবস্থা	৩৩	২.৬%
	১২৫০	১০০%

এক সমীক্ষায় জানা যায় যে প্রতি বর্গমিটারে ৫২০ মিলিগ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড এবং ১৪১ মিলিগ্রাম কার্বণ মোনোক্সাইড গ্যাস রয়েছে। অনুরূপভাবে কলিকাতার পরিবেশ সম্বন্ধে এক সাম্প্রতিক অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে যে বাতাসে ৪০০ টন কার্বণ মোনোক্সাইড, ১২২ টন সালফার ডাইঅক্সাইড, ১০২ টন হাইড্রোকার্বণ গোষ্ঠীর পদার্থ, ৭০ টন নাইট্রোজেন অক্সাইড ঘুরে বেড়ায়।

পরিবেশদূষণের একটা দিক হল আবহাওয়ায় অম্লতা বৃদ্ধি। পরিসংখ্যান থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে আমাদের চারদিকের পরিবেশে ছড়ানো রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অম্লতা সৃষ্টির উপকরণ, যা গ্রন্থাগার সংগ্রহের ক্রমাবনতি তথা ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। এই দূষণ এমন এক স্তরে পৌঁছেছে এবং এখনও এমন গতিতে বেড়ে চলেছে যে মানুষ আর তার সভ্যতার সব নিদর্শন আজ প্রচণ্ড বিপদের সম্মুখীন। কলিকাতার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সাদা মার্বেল ক্রমশ হলদেটে হয়ে যাচ্ছে, পাথরের গা থেকে পাতলা আস্তরণ খসে যাচ্ছে, সূক্ষ্ম ফাটল ধরছে। এটা শুধু কলিকাতার ছবি বা ঘটনা নয়। একই ঘটনা ঘটে চলেছে পৃথিবীর সর্বত্র, কোথাও একটু কম আবার কোথাও কিছুটা বেশী। একই সমস্যায় ভুগছে আগ্রার তাজমহলও। এতো হচ্ছে পাথরের সৌধের চিত্র। কিন্তু গ্রন্থাগার সংগ্রহের অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর, তার মুখ্য কারণ গ্রন্থাগার সংগ্রহের প্রধান উপাদান ভেষজ এবং জৈব পদার্থ। এই পরিস্থিতির যথাযথভাবে সম্মুখীন হবার ব্যবস্থা

* Committee on Pollution. Waste management and control. Washington, National Academy of Science, 1966. (National Academy of Science Publication 1400)

দেওয়া একমাত্র গ্রন্থাগারিকের পক্ষেই সম্ভব পরিপূর্ণ সচেতনতার এবং সচেষ্ট প্রয়াসের মাধ্যমে—সংরক্ষণবিদ্যার উপযুক্ত প্রয়োগে।

গ্রন্থাগার সংগ্রহের পক্ষে পরিবেশদূষণের সবচেয়ে ক্ষতিকারক বিক্রিয়া—অম্লতার দিকেই সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে ভাল করে নজর দিতে হবে। বাতাসে উপস্থিত নানাবিধ গ্যাসজনিত অম্লতার ক্ষতিকারক ক্ষমতা সম্বন্ধে গত শতাব্দীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেও, সচেতনভাবে এর হাত থেকে গ্রন্থাগার সংগ্রহকে রক্ষার ব্যাপক প্রয়াস নিতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গিয়েছিল।

বড় বড় শহর এবং শিল্পাঞ্চলগুলিতে বাতাসে যথেষ্ট পরিমানে সালফার ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায়—যেটা বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় সালফার-ট্রাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। এবারে বাতাসে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের সঙ্গে সালফার ট্রাই-অক্সাইডের বিক্রিয়ার ফলে তৈরী হয় সালফিউরিক অ্যাসিড।

নাইট্রোজেন বা তার যৌগ সাধারণভাবে ক্ষতিকারক নয় তবে নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্সাইড বাতাসের অক্সিজেন এবং আর্দ্রতার সংস্পর্শে এসে নাইট্রিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হতে পারে যেটি কাগজ, চামড়া, কাপড় ইত্যাদি এমনকি ছাপার কালিরও ক্ষতি করতে পারে।

আজকাল নানাভাবে পলিভিনাইল ক্লোরাইড বা পি. ভি সিব ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। আলো এবং তাপের প্রতিক্রিয়ায় এটি থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড তৈরী হতে পারে, যেটি বাতাসের আর্দ্রতার সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়।

গ্রান্থাগার সংগ্রহের প্রায় প্রত্যেকটি জিনিষের উপরই এই সব অ্যাসিডের ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়—কাগজের যখন অম্লতা বৃদ্ধি পায়—সাদা রং হলদেটে হয়ে শেষ পর্যন্ত বাদামী রংএ পরিবর্তিত হয় এবং কাগজ দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যায়, কালি ঝাপসা হয়ে আসে, চামড়া ক্রমাবনতির ফলে দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে লালচে গুঁড়ো গুঁড়ো অবস্থায় পরিণত হয়।

সালফার-ডাই-অক্সাইড সালফিউরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত না হয়েও, কাপড় এবং কাগজের সেলুলোজের ক্ষতি করতে পারে।

শহরের বাতাসে যথেষ্ট পরিমাণে ওজোন (Ozone) গ্যাস থাকে যেটি জৈব পদার্থের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ এটি ঐসব বস্তুর মধ্যেকার কার্বনের বন্ধন (carbon bond) ভেঙ্গে দেয়। ওজোজনিত এধরণের সমস্যা শীত-

প্রধান এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তুলনায় গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে বেশী পরিমাণে দেখা যায়।

আধুনিকতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আজকাল জ্বালানী হিসাবে কেরোসিন, কয়লা, রান্নার তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস ইত্যাদির ব্যবহার হচ্ছে বহুল পরিমাণে। ফলে বাতাসের দূষণ হচ্ছে ব্যাপকভাবে। সৌভাগ্যবশতঃ বাইরের পরিবেশে যতটা দূষিত গ্যাস থাকে গ্রন্থাগারের ভিতরে তার পরিমাণ অর্ধেকের চেয়েও কম—কিন্তু সেই পরিমাণই সংগ্রহের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করতে পারে।

যদিও ঘরের বাইরে থেকে নানা ধরণের দূষণ গ্রন্থাগারকে আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু অনেক সময় গ্রন্থাগারের মধ্যেই বিভিন্ন ধরণের দূষণের উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে। ঘরের ইলেকট্রিক লাইনের বা ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির দোষের জন্য কখনো কখনো যে স্ফুলিঙ্গের (spark) সৃষ্টি হয়, তার ফলে ওজোন গ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে। ঘরের পুরানো কাঠামো বা আসবাব থেকেও জৈব গ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে, যদিও বাইরের দূষণের তুলনায় এসবের পরিমাণ অত্যন্ত নগন্য।

দূষণের ক্ষতিকারক ক্ষমতা দু'ভাবে কাজ করে। প্রথমটি এর ক্ষতিকারক অক্সিজেন যোগ প্রস্তুতি বিক্রিয়া বা অক্সিডাইজিং (oxidizing) এবং অপরটি নানাধরণের অ্যাসিড তৈরীর মাধ্যমে অম্লতা সৃষ্টি।

ধোঁয়া ঃ কাঠ, কয়লা ইত্যাদি জ্বালালে তা থেকে যে সাদা, বাদামী বা কালচে বাষ্প ও গ্যাস বের হয়, তাকেই সাধারণভাবে আমরা ধোঁয়া বলি। এতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রধান উপকরণ হলেও, অন্য কয়েকধরণের পদার্থ এর মধ্যে থাকে। দেখতে পাওয়া যাক আর নাই যাক, কিছুটা ধোঁয়া সব সময়ই বাতাসে রয়েছে। একমাত্র যখন এটি অত্যন্ত বেশী পরিমাণে বা অত্যন্ত স্থুলভাবে বাতাসে থাকে তখনই এটি দৃশ্যমান হয়। কখনও কখনও রাস্তার বাস, ট্রাক ইত্যাদিকেও চলবার সময় সাইলেন্সার পাইপ থেকে কালো ধোঁয়া ছাড়তে দেখা যায়, যেটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায়, এর কারণ (১) শুরুতে পরিমানে এটি থাকে অনেকটা, (২) এই ধোঁয়া গরম হওয়ায় বাতাসের চেয়ে হাল্কা, (৩) এটি সহজে বাতাসের সঙ্গে কোন বিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, (৪) এর নিজস্ব কোন রং নেই। ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যে আশেপাশের বাতাসে মিশে যায়। একই জায়গায় যদি অনেক ধোঁয়া থাকে, তবে দেওয়ালে

প্রথমে হাল্কা এবং পরে গাঢ় কালচে ছোপ ধরে। গ্রন্থাগার সংগ্রহের উপরেও এই ধরণের স্থায়ী দাগ ধরে যেতে পারে। ধোঁয়ার মধ্যে উপস্থিত সালফার-ডাই-অক্সাইড কিভাবে সংগ্রহের ক্ষতি করতে পারে সেটা আগেই আলোচিত হয়েছে।

ধোঁয়াশা : কলিকাতা এবং আরো কয়েকটি শহরে শীতকালে আরেকধরণের পরিবেশ দূষণের সন্ধান পাই যেটা সাধারণভাবে ধোঁয়াসা বা স্মগ (Smog) নামে পরিচিত। এটি আসলে সাধারণ শীতের কুয়াসার সঙ্গে কয়লার উনুনের ধোঁয়ার সম্মিলিত ফল। কুয়াসার উপস্থিতির ফলে ঐ ধোঁয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রায় স্থির অবস্থায় মাটির কাছাকাছি অবস্থান করে।

লবণ : সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত শহরের বাতাসে লবণ অত্যন্ত ছোট কণারূপে বা বাতাসে লবণাক্ত আর্দ্রতা হিসাবে উপস্থিত থাকে। বাতাসের সঙ্গে বাহিত হয়ে এটি গ্রন্থাগার সংগ্রহের উপর জমতে পারে এবং পরে বাতাসের আর্দ্রতার সংস্পর্শে গলে গিয়ে কাগজ ইত্যাদির ক্ষতি করতে পারে। এর ফলে কাগজ নষ্ট হয়ে, তাতে গর্তের সৃষ্টি হয়।

ভুষোকালি : বাতাসে বেশী পরিমাণে ভুষোকালি বা ঐ ধরণের পদার্থ থাকলে সেটা গ্রন্থাগার সংগ্রহের উপর জমে দাগ সৃষ্টি করে, কাগজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে—প্রথমে দুর্বল এবং পরে ভঙ্গুর করে ফেলে।

ছাই : বাতাসে উপস্থিত ছাই সংগ্রহের উপর জমে, যার ফলে সাদাটে বা ছাই রংএর ছোপ ধরে। এ ছাড়াও রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কাগজ, কাপড় ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করে, যাতে এদের স্থায়িত্বকাল হ্রাস পায়।

দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিকারের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে গ্রন্থাগারে কেন্দ্রীয় শীতাতপ-নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার প্রবর্তন, কারণ এর ফলে মাত্র একটি নির্দিষ্ট পথেই ঘরের মধ্যে বাইরের বাতাস ঢুকতে পারে এবং যে বাতাসটুকু ঢুকছে সেটা বিজ্ঞান-ভিত্তিক ক্ষারধৌতিপ্রক্রিয়ায় (alkaline wash) শোধন করে নেওয়া হয়। যেসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে চেষ্টা করতে হবে যাতে বাইরের দূষিত বাতাস সহজে গ্রন্থাগারের মধ্যে ঢুকতে না পারে।

ধুলো, বালি, ময়লা

বাতাসে নানাধরণের কঠিন পদার্থের কণা ভেসে বেড়ায় — এরাই সাধারণ-ভাবে ধুলো বালি হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। এধরণের কণাকে দুটি নির্দিষ্ট

ভাগে ভাগ করা চলে—প্রথমটিতে যেসব পদার্থ থাকে সেগুলি সরাসরি সংগ্রহের ক্ষতি করতে সক্ষম—এর মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম সালফেট (Calcium Sulphate), অ্যামোনিয়াম সালফেট (Ammonium Sulphate), নাইট্রেট (Nitrate), ক্লোরাইড (Chloride), কয়েকধরণের অক্সাইড (Oxide) ইত্যাদি। এরা যেসব ক্ষতি করে সেগুলি বায়ুদূষণজনিত ক্ষতির অনুরূপ। দ্বিতীয়টিতে যেসব পদার্থ থাকে সেগুলি সরাসরি গ্রন্থাগার সংগ্রহের কোন ক্ষতি করতে পারে না—এর মধ্যে আছে ধুলো, কয়লার গুঁড়ো, কাঠের গুঁড়ো, ছাই ইত্যাদি।

গ্রন্থাগারে ধুলো, বালি, ময়লার উপস্থিতি যদি বেশী হয় তবে অন্যান্য নানা পদার্থের সংস্পর্শে ক্ষতি, পরিমাণে এবং গতিতে অনেক দ্রুত হওয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে অত্যধিক ধুলো, ময়লা থাকলে বাতাসের আর্দ্রতা তারমধ্যে জমে ছত্রাকের প্রসার ঘটাতে পারে। ধুলো, বালির সঙ্গেও অনেক দূষণজনিত কণিকাও থাকতে পারে। ধুলোর সঙ্গে সবসময়ই সিলিকন কণিকা থাকে। জোরে ধুলো মিশ্রিত বাতাস বইলে বা ধুলোর ঝড় উঠলে সেই ধুলো গ্রন্থাগার সংগ্রহের নানা জিনিসের মসৃণ তলের ওপর পড়ে ঘর্ষণজনিত ক্ষতি ঘটাতে পারে।

ধুলো, বালি, ময়লার হাত থেকে গ্রন্থাগার সংগ্রহকে বাঁচাতে হলে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারের ভিতরে ঝাড়পোঁছ একান্ত প্রয়োজন। শুকনো কাপড় দিয়ে ঝাড়লে ধুলো, বালি অপসারণ সম্ভব কিন্তু যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে কাজ না করলে এতে কেবলমাত্র ধুলোর স্থানান্তরই ঘটে এবং সাময়িকভাবে অপসারিত হলেও স্থায়ী অপসারণ ঘটে না। বেশ কিছু পরিমাণ ধুলো এই প্রক্রিয়ার হাওয়ার সাথে মিশে উর্ধ্বমুখী হলেও, স্বভাবধর্মেই আবার সংগ্রহের উপর স্থাপিত হয়। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার (vaccuum cleaner) যন্ত্রের সাহায্য নিলে এই অসুবিধা থাকে না। ময়লা বলতে সাধারণত যেটা বোঝায় সেটা শুকনো কাপড়ে মুছলে সহজে যাবে না, এজন্য দরকার সাবান জল অথবা সোডা মেশানো জলের ব্যবহার। কোন কোন ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইডও (Hydrogen Peroxide) ব্যবহার করা চলে। কিন্তু এই ধরণের জল বা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করার আগে ভালভাবে দেখে নিতে হবে যে ঐ ধরণের জিনিষের ব্যবহারে সংগ্রহের কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে কিনা।

সাধারণভাবে নিয়মিত ঝাড়পোঁছ ছাড়াও এই সমস্যার সবচেয়ে ভাল সমাধান শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োগ। কারণ সেক্ষেত্রে ঘরের মধ্যে বাইরের ধুলো

বাইরে ঢোকা সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা সম্ভব না হলে জানালা দরজায় সম্ভবমত আগ লাগিয়ে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। দরকারমত দরজা জানালার পর্দাও ব্যবহার করতে হবে।

ছত্রাক, ভাইরাস, বীজাণু

বাতাসে সবসময়ই ছত্রাকের বীজ বা স্পোর (spore) ভেসে বেড়ায় এটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং হাল্কা হওয়ায় বাতাসে বাহিত হয়ে সহজেই গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে। ছত্রাক অনেক ধরণের হয়ে থাকে, তবে তার মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই আমাদের গ্রন্থাগার সংগ্রহের পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি করে। যে ধরণের ছত্রাক আমাদের সমস্যার কারণ তাদের মধ্যে কোনটাই পরজীবী ছত্রাক নয়। এদের জৈবিক ক্ষতিকারক হিসাবে গণ্য করা হয়। অনুকূল আবহাওয়ায় ছত্রাক কাগজ, কাপড়, চামড়া ইত্যাদির উপর জন্মায় এবং বিস্তারলাভ করে। তাপ এবং অত্যধিক আর্দ্রতা এর আক্রমণ ও বিস্তারের পক্ষে অনুকূল। সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যেও এরা বেঁচে থাকতে পারে। কড়া রোদ বা আলো (যাতে অতিবেগুনী রশ্মির পরিমাণ যথেষ্ট) এদের বিস্তারের পক্ষে প্রতিকূল, এবং এই অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকলে ছত্রাক মরে যায়। ১৫° থেকে ৩০° সেঃ এবং ৮০% থেকে ১০০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা এদের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল এবং এই পরিবেশে এদের বিস্তার ঘটে অত্যন্ত দ্রুত। প্রতিকূল অবস্থায় ছত্রাকের বীজ দীর্ঘ সময়, প্রায় পঁচিশ বছর, সুপ্ত অবস্থায় থেকে যেতে পারে।

ছত্রাকের পুষ্টির জন্য কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি ছাড়াও কিন্তু লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদির অত্যন্ত অল্প পরিমাণে দরকার হতে পারে। এই খাদ্য-সূচী গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অনুধাবনযোগ্য। কিছু ছত্রাক তার পুষ্টির জন্য গ্রন্থাগার সংগ্রহের সেলুলোজের উপর নির্ভর করায় গ্রন্থাগারের অপরিসীম ক্ষতি হতে পারে। কিছু চামড়া, বাঁধাইয়ের আঠা ইত্যাদি এদের আক্রমণে সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এই সমস্যার সমাধানের জন্যও শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে কারণ এর মাধ্যমে বাতাসের আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা দুইয়েরই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এছাড়াও ঘরে প্রবেশকারী বাতাস থেকে ছত্রাকের বীজের অপসারণ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব। যদি এর আক্রমণ কোনভাবে সুরু হয়ে

থাকে তবে মেথিলেটেড স্পিরিটে ১০% থাইমল-এর মিশ্রণ ঘরের মধ্যে স্প্রে (spray) করলে ছত্রাক নিবারণ সম্ভব। আক্রান্ত বইগুলো নরম কাপড় বা তুলো দিয়ে প্রথমে পরিষ্কার করার পর কোন ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। যদি গ্রন্থাগারে অনেক বই একসাথে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তবে বাতাস-নিরোধক কক্ষে থাইমল ধূপনের (ফিউমিগেশন) মাধ্যমে ছত্রাক ধ্বংস করতে হবে। এসবের সাথে গ্রন্থাগারের ভিতরটা যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যথাযথ ঝাড়পোঁছ অত্যন্ত জরুরী।

বাতাসবাহিত কয়েক ধরণের ভাইরাস এবং ব্যাক্‌টেরিয়া বা বীজানু কাগজের মধ্যেকার লোহজ যৌগকে আক্রমণ করে, ফলে কাগজের ওপরে বাদামী ছোপ ধরে যাকে ফক্সিং (Foxing) বলে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে কাগজের ঐ বাদামী অংশে অম্লতা বেড়ে গেছে। বাতাসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই এর একমাত্র প্রতিকার।

কীটপতঙ্গ

সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে যদি গ্রন্থাগারিক যথেষ্ট সচেতনভাবে গ্রন্থাগারের ভেতরের আবহাওয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা না করেন, তাহলে নানা-ধরণের কীটপতঙ্গের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। এদের আক্রমণে গ্রন্থাগার সংগ্রহের নানাধরণের ক্ষতি হতে পারে। নীচের তালিকা থেকে গ্রন্থাগার সংগ্রহের কি ধরণের ক্ষতি কোন কোন কীটপতঙ্গের দ্বারা হতে পারে জানা যাবে।

কীটপতঙ্গ	আক্রান্ত বস্তু	ক্ষতির প্রকৃতি
আরশোলা	কাগজ, বোর্ড, বাঁধাইয়ের জিনিষপত্র, কাপড়, পার্চ-মেণ্ট, চামড়া, ইত্যাদি	খেয়ে নষ্ট করে, ময়লা কালো কালো দাগ সৃষ্টি করে।
উইপোকা	কাগজ, বোর্ড, কাপড়, কাঠ ইত্যাদি	খেয়ে নষ্ট করে ফেলে
ফায়ার ব্রাটস্, ফিস্‌মথ, ব্রিস্টলটেল, সিলভারফিস, স্লিকার্স	বইয়ের আঠা, বাঁধাই, ফটোগ্রাফ ও কাগজের উপরের আস্তরণ, কাগজ, ষ্টার্চ সম্বলিত জিনিষপত্র ইত্যাদি।	খেয়ে নষ্ট করে ফেলে

বুক ওয়ার্ম	কাগজ, বোর্ড, আঠা, বাঁধাইয়ের জিনিষপত্র, কাপড়, মলাট	সরু সরু সুড়ঙ্গ কেটে নষ্ট করে দেয়
বুকলাইস	বাঁধাইয়ের আঠা, ষ্টার্চের ওপর জন্মান ছত্রাক	খেয়ে ফেলে
বোলতা জাতীয় পোকা	বাঁধাইয়ের কাপড়, চামড়া, বইয়ের কাগজ	বাসার লালা মিশ্রিত মাটি অপসারণের সময় ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।
মথ (লার্ভা অবস্থায়)	বাঁধাইয়ের চামড়া, কাপড়, কাগজ, আঠা এবং বাঁধাইয়ের অন্যান্য সামগ্রী	খেয়ে নষ্ট করে

আরশোলা

এদের নতুন করে পরিচয় করাবার কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না। মোটামুটি আটটি প্রজাতির আরশোলা আছে, যথা জার্মান (ছোট্ট, মেরুন রংএর), অস্ট্রেলিয়ান, আমেরিকান, সুরিনামের, প্রাচ্যের, কালচে বাদামী মাথাওলা এবং কাঠের মধ্যে বসবাসকারী। আমরা আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই ধরণের আরশোলা দেখতে পাই—একটা একটু ছোট আকারের আধ থেকে এক ইঞ্চির (১.৫ থেকে ২.৫ সেমি) চেয়ে এরা বড় হয় না (জার্মান, **Blattella germanica**), অন্যটা দেড় থেকে দুই ইঞ্চি (৩.৭ থেকে ৫ সেমি) পর্যন্ত বড় হয় (আমেরিকান, **Periplaneta americana**)। আরশোলা সাধারণত অন্ধকার জায়গাই বসবাসের জন্য পছন্দ করে। রাতে অথবা অন্ধকারেই এরা বেশী কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। আরশোলা একসাথে ১৪ থেকে ৩০টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে (বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে)। এই ডিমগুলো একেকটি ক্যাপসুল অথবা আবরণের মধ্যে থাকে। সাধারণত ৩৫ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে ডিম থেকে যে বাচ্চা বের হয়, সেগুলো ৬ থেকে ১০ মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। ছোট আরশোলা ৫/৬ মাস এবং বড় আরশোলা প্রায় আড়াই বছর বাঁচে।

সাধারণত দেখতে পাওয়া আরশোলার দুটি প্রজাতি
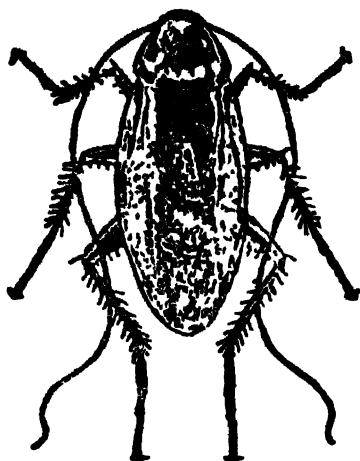
আমেরিকান জার্মান

বইয়ের মলাট, কাপড়, কাগজ, বোর্ড, আঠা, জিলেটিন, স্টার্চ জাতীয় সব জিনিস এরা নষ্ট করে। কখনও কখনও কাগজ খেয়ে ফেলে। পড়ে থাকা খাবারের অংশ, মিষ্টি এদের বেশী পছন্দ। গ্রন্থাগারের সংগ্রহের মধ্যে বইয়ের বাঁধাইয়ের ব্যবহৃত আঠাই এদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে অন্ধকার তাকে, যেখানে বড় একটা নাড়াচাড়া পড়ে না, সেখানে রাখা বইয়ের পুটএর (spine) পুরো অংশটাই খেয়ে ফেলেছে। এরা বাঁধানো বইয়ের ভেতরে ঢুকে বইয়ের কাগজের ক্ষতি সাধারণত করে না। এদের দেহনিঃসৃত কালচে এক ধরণের তরল পদার্থ কাগজপত্রের উপর বিশ্রী দাগের সৃষ্টি করে—রঙ্গীন কাপড় বা কাগজের রং নষ্ট করে দেয়। শীতপ্রধান অঞ্চলের তুলনায় গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার পরিবেশে যেখানে সাধারণত নাড়াচাড়া পড়ে না সেখানে এদের আক্রমণ এবং বিস্তার বেশী।

উইপোকা

গ্রন্থাগার ভবন, গ্রন্থাগার সংগ্রহ এবং আসবাবপত্রের পক্ষে এরা সব চেয়ে ক্ষতিকারক কীট। এরা প্রাচীনতম কীটদের মধ্যে অন্যতম—প্রায় দু'শো কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে এরা বিচরণ করছে। এদের সবচেয়ে বেশী আফ্রিকায় দেখা গেলেও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই এদের দেখা পাওয়া

যায়। এরা সমাজবদ্ধ জীব—এদের একেকটা উপনিবেশের (কলোনী) মধ্যে মোট সংখ্যার ৯৫% কর্মী, প্রায় ৫% সৈনিক। পুরুষের সংখ্যা খুবই নগন্য এবং একটিমাত্র স্ত্রী অথবা রাণী থাকে, যদিও তাদের উপরই এদের বংশবিস্তার নির্ভরশীল। কোন কোন রাণী (এই নামেই স্ত্রী উইপোকা বেশী পরিচিত) দিনে ১৫/২০ থেকে কয়েক শত পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে। কোন কোন কলোনীতে একসঙ্গে দশলক্ষের মত উইপোকা থাকে—যারা সাধারণত একটি মাত্র রাজকীয় দম্পতিরই সন্তান। কয়েক ধরণের উইপোকা এদের কলোনীতে একধরণের ছত্রাকের চাষ করে এবং একধরণের কীট পালনও করে।

উইপোকার জীবনে মাত্র তিনটি স্তর আছে—ডিম, অপরিণত এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। আরেকটি বিষয়ে কিছু বলা দরকার—পূর্ণাঙ্গ উইপোকা আবার চারটি বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়—কর্মী, সৈনিক, পুরুষ এবং স্ত্রী। কর্মী এবং সৈনিকদের কখনও ডানা থাকে না এবং এরা কখনও বংশ বিস্তার করে না। কর্মী এবং অপরিণত অবস্থায় উইপোকার ধ্বংসকারী ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। স্ত্রী এবং পুরুষ উইপোকার ডানা গজায় এবং বছরের কোন বিশেষ সময় (সাধারণতঃ বর্ষার সুরুতে অথবা বর্ষার শেষে) এরা কলোনী থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং ঝাক বেধে উড়ে নতুন কলোনী গড়ার উপযুক্ত কোন স্থান নির্বাচন করে সেখানেই থেকে যায় এবং নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলে। এই পুরুষ এবং স্ত্রী উইপোকা, ডানাহীন, অন্ধ, নরম, আপেক্ষাকৃত ছোট দেহধারী কর্মী এবং সৈনিক উইপোকার থেকে চেহারায় কিছুটা আলাদা। এদের রং অপেক্ষাকৃত গাঢ় কিছুটা কালচে, সরু শরীর এবং লম্বা অথচ ভঙ্গুর ডানা থাকে। নতুন কলোনীর উপযুক্ত জায়গা নির্বাচনের পর এদের ডানা প্রায় গোড়া থেকে ভেঙ্গে যায়। এরপর স্ত্রী উইপোকার দেহ আয়তনে আরো বড় হয়ে যায়। একমাত্র যখন ডানা গজায় শুধুমাত্র সেই সময়ই স্ত্রী এবং পুরুষ উইপোকা আলোয় বের হয় এবং আলো সহ্য করতে পারে—অন্য সময় এরা এবং কর্মী অথবা সৈনিক কেউই আলোতে বের হয় না। আগে মনে করা হ'ত এরা আলো সহ্য করতে পরে না, কিন্তু এখন জানা গেছে যে এদের বাইরে না আসার মুখ্য কারণ এদের বাসস্থানের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত আর্দ্রতা যেটি এদের স্বাভাবিকভাবে বাঁচার পক্ষে অপরিহার্য।

উইপোকার খাদ্য কি সেটা হিসাব না করে, যদি খোঁজ করা যায় যে এরা কি খায় না বোধহয় সেটা সহজ হবে। ঘাস, শুকনো পাতা, খড়, কাঠ,

কাগজ, বোর্ড, চামড়া ইত্যাদি সবকিছুই এদের খাদ্য তালিকার মধ্যে পড়ে। এরা যদি একবার গ্রন্থাগারের ভালভাবে অনুপ্রবেশ করতে পারে তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে দিতে পারে। তাই একবার যদি উইপোকার আক্রমণের লক্ষণ দেখা যায় তবে নিয়মিত ভাবে, সম্ভব হলে দৈনিক কড়া নজর রাখতে হবে যাতে আচমকা অনুপ্রবেশ না ঘটে। কাঠের তাক, পুরনো সেঁতসেঁতে দেওয়ালে সহজেই এদের আক্রমণ সুরু হতে পারে, সেজন্য এদিকে একটু বেশী নজর রাখা দরকার। যে সব জায়গাতে সাধারণত নাড়াচাড়া পড়ে না, যে দিকটা চোখের আড়ালে থাকে সেদিকেই সাধারণত এদের আক্রমণ সুরু হয়। এত নিঃশব্দে চোখের আড়ালে এরা কাজ করে যে

পূর্ণাঙ্গ উইপোকার বিভিন্ন রূপ
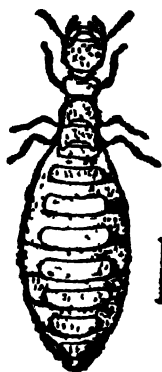
রাণী কর্মী পুরুষ
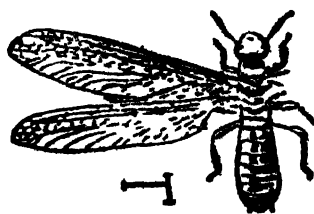
(প্রায় পাঁচগুণ বড় আকারে দেখানো হয়েছে)

খুব সাবধানতা অবলম্বন না করা হলে, যখন এদের আক্রমণের ব্যাপারটা নজরে আসে, ততক্ষণে প্রচুর ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

উইপোকাকে প্রধানতঃ বাসস্থানভিত্তিকভাবে, দুভাগে ভাগ করা চলে—যারা মাটিতে বাসা বানায় এবং যারা কাঠের মধ্যে বাসা বানায়। দু'দলের মধ্যে প্রথমটাই বেশী ক্ষতিকারক। এরা মাটিতে বাসা বানায় বা সরু সরু সুড়ঙ্গের মাধ্যমে মাটির সাথে যোগাযোগ রাখে। বইপত্রে একবার আক্রমণ সুরু হলে কাঠ, কাগজ, কাপড় ইত্যাদির সেলুলোজ এরা খেয়ে উইয়ের ঢিবিতে রূপান্তরিত করে ফেলে। উইপোকা দ্বারা গ্রন্থাগারের যত ক্ষতি হয় তার শতকরা পঁচানব্বই ভাগই এই মাটিতে বাসা বানাবার কারিগরদের কাজ।

কাঠের বাসিন্দা উইপোকারা সাধারণত বাড়ীর ফাটল অথবা কাঠের

কাঠামোর মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এদের খাদ্যতালিকা বা ক্ষতি করার ক্ষমতা অন্যজন্তুরই মত কিন্তু এরা ক্ষতিসাধন করে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে।

সিলভারফিস

সিলভারফিস (Lepisma saccharina), ফায়ারব্রাটস (Themobia domestica), ফিসমথ, স্লিকারস্ এরা সবাই থাইসানুরা গোত্রের (Order Thysanura) অন্তর্ভুক্ত। এই গোত্রে প্রায় ৭০০টি প্রজাতি আছে। কীটপতঙ্গের আদিমতম গোষ্ঠীর মধ্যে এটি একটি। এই গোত্রের সকলেই ডানাহীন, নিশাচর এবং এর আদিম প্রজাতিগুলির ক্ষেত্রে চোখের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না।

সিলভারফিস এক / দেড় ইঞ্চি (২·৫/৩·৭ সেমি) লম্বা ডানাহীন, নিশাচর কীট। এদের নরম শরীর ছোট ছোট ছাই অথবা ধূসর রংএর আঁশে ঢাকা। এদের মাথার সামনে লম্বা দু'টো শুড় এবং দেহের শেষ প্রান্তে তিনটি সরু লেজের মত প্রত্যঙ্গ থাকে। কয়েক ধরণের সিলভারফিসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের ছোট ছোট চোখ আছে। এদের পছন্দ ঠাণ্ডা সেঁতসেঁতে অন্ধকার আবহাওয়া। এদের খাদ্য কাগজের উপরের জিলেটিন বা ষ্টার্চ জাতীয় পদার্থ,
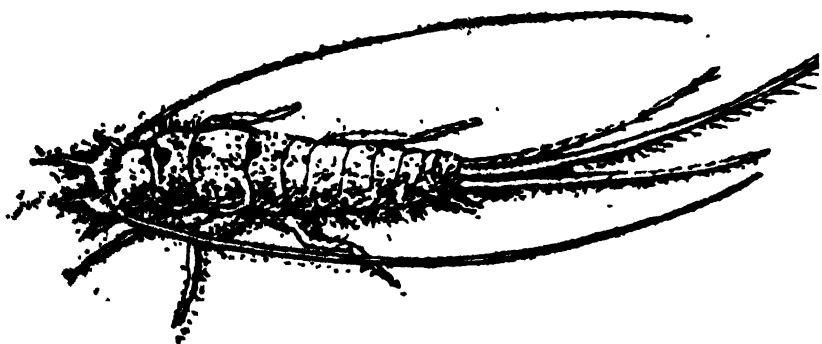
(প্রায় চারগুণ বড় আকারে দেখানো হয়েছে)

আঠা ইত্যাদি—এক কথায় বলা চলে এরা শর্করা, ষ্টার্চ এবং প্রটিনজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে। বাঁধাইয়ে ব্যবহৃত আঠা, সুতো, কাগজ, চামড়া, সুতোর কাপড়, রেশমী কাপড় ইত্যাদির ক্ষতি করে। বইয়ের কাগজ, বোর্ড, ফটো সব কিছুর উপরের আস্তরণ খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। তাকের যেদিকটা অন্ধকার, দেরাজের পিছনে, কাগজের নীচে যেখানে সচরাচর নাড়াচাড়া পড়ে না—অন্ধকার

ও সেঁতসেঁতে, সেখানে এরা কয়েকটি ছোট ছোট ডিম পাড়ে। গরমের সময় ২ সপ্তাহে—শীতের সময় ৪ সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় বেগুলো হুবহু পূর্ণাঙ্গের মতই দেখতে, শুধু আকারে ছোট। এরা ছয় মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রাত ছাড়াও দিনের বেলাতেও অন্ধকার জায়গায় এরা একইভাবে কাগজ পত্রের ক্ষতি করে—গ্রন্থাগারের সংগ্রহের পক্ষে উই-পোকার পরই এরা সবচেয়ে ক্ষতিকারক কীট। সিলভারফিস সম্বন্ধে আরেকটি খবর জেনে রাখা ভাল, সেটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এরা কয়েক মাস অবধি না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

ফায়াররাটস

চেহারায় এরা অনেকটা সিলভারফিসেরই মত। শুধু রংটা কিছুটা গাঢ়—একটু কালচে। এরাও অন্ধকারে থাকে—নিশাচর। এদের পছন্দ অপেক্ষাকৃত গরম পরিবেশ। ঘরের যেদিকটা অপেক্ষাকৃত গরম অথচ অন্ধকার সেদিকটায় এদের বেশী দেখা যায়। খাদ্যাভ্যাসের দিক থেকেও এর সিলভার-ফিসের সাথে খুবই মিল আছে—অর্থাৎ জিলেটিন, আঠা ইত্যাদি মূলতঃ শর্করা, ষ্টার্চ এবং প্রটিন জাতীয় খাদ্যই এরা খায়। সৌভাগ্য এই যে গ্রীষ্ম-প্রধান অঞ্চলেও সাধারণত ঘরের মধ্যে এদের উপযোগী উষ্ণতা খুবই কম পাওয়া যায়—সেজন্য আমাদের দেশের গ্রন্থাগারে সাধারণত এদের অস্তিত্ব অথবা উপদ্রব খুবই সীমাবন্ধ' এরা ৩৮°-৩৯° সেঃ (৯৮°-১০২° ফা) তাপমাত্রায় ডিম পাড়ে অতএব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে গ্রন্থাগার ভবনের মধ্যে যথেষ্ট গরম কোন অংশ না থাকলে এদের আক্রমণ ও বিস্তার সম্ভব নয়।

ব্রিস্টলটেল

ব্রিষ্টলটেল (Campodea) এটিও সিলভারফিসের মতই আদিম কীট এবং চেহারার দিক থেকে এদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। এদের চোখ থাকে না। এটি ডিপ্লুড়া গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। (কোন কোন প্রাণীতত্ত্ববিদ্ অবশ্য ব্রিষ্টলটেলকে থাইসানুরা গোষ্ঠীর মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত করেছেন)। থাইসানুরা গোষ্ঠী থেকে এই গোষ্ঠীর মূল তফাৎ হচ্ছে, এদের মুখ একটা খাঁজের মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু অন্যান্য কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের মুখ কোন খাঁজের মধ্যে থাকে না।

এরাও নিশাচর। আকারে মোটামুটি প্রায় ১ ইঞ্চ (২·৫ সেমি) লম্বা, ডানাহীন, নরম দেহধারী কীট। মাথার সামনে দুটি শুঁড় এবং শরীরের

(প্রায় তিনগুণ বড় আকারে দেখানো হয়েছে)

শেষপ্রান্তে দুটি লেজের মত প্রত্যঙ্গ থাকে। অন্ধকার সেঁতসেঁতে জায়গাতে এরা থাকতে ভালবাসে। এদের খাদ্য আঠা, জিলেটিন অথবা ষ্টার্চজাতীয় পদার্থ। ফলে এদের দ্বারা কাগজ, কাপড়, সুতো, আঠা (বাঁধাইয়ের) ইত্যাদির যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়।

ফিসমথ, স্লিকার্স ইত্যাদিও সিলভারফিসেরই অনুরূপ, নিশাচর এবং সেঁতসেঁতে আবহাওয়ায় থাকে। এরাও একইভাবে বই, কাগজ, কাপড় ইত্যাদির ক্ষতি করে।

বুকওয়ার্ম

বুকওয়ার্ম বলতে কোন বিশেষ একধরণের কীটকে বোঝায় না। সারা পৃথিবীতে প্রায় পোনে তিন লাখ বিভিন্ন প্রজাতির গুবরে পোকার দেখা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে মাত্র দু'শত রকমের পোকা আছে যাদের সবারই লার্ভাকে সাধারণভাবে বুকওয়ার্ম বলা হয়। এখানে মনে রাখা দরকার পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এইসব গুবরে জাতীয় পোকা কিন্তু সাধারণত গ্রন্থাগারের বই বা অন্য সংগ্রহের কোন ক্ষতি করে না। অধিকাংশ বুকওয়ার্মই কোলিওপটেরা গোষ্ঠীর (Order Coleoptera) অন্তর্গত টাইনীডি পরিবারের (Family Ptinidae) সদস্য। এই ধরণের গুবরে জাতীয় পোকারা বইয়ের মলাটের পাশে বা ভেতরে অথবা পুটের পাশে ডিম পাড়ে— অবশ্য বইয়ের নীচের দিকে, যেদিকটা তাকের সংস্পর্শে আছে, সেদিকটাই এরা ডিম পাড়ার জন্য বেশী পছন্দ করে। ডিম ফুটে বের হবার পর, এই লার্ভাগুলো নিজেদের পুষ্টির জন্য বইয়ের কাগজের, মলাটের

কাপড়ের, বোর্ডের মধ্য দিয়ে সরু সরু সুড়ঙ্গ কেটে চলে। ব্যাপক আক্রমণের ক্ষেত্রে কখনও কখনও এরা এত বেশী সংখ্যক সুড়ঙ্গ কাটে যে ছাপা বা লেখা প্রায় পাঠের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এইসব সুড়ঙ্গের গায়ে একধরণের শুকনো লালা জাতীয় পদার্থের আস্তরণ থাকে (বোঁট এদের দেহনিঃসৃত) যার ফলে কখনও কখনও পৃষ্ঠাগুলো একে অপরের সাথে আটকে যায়। জোর করে খুলবার চেষ্টা করলে পৃষ্ঠার ক্ষতি হয়, কারণ সুড়ঙ্গ কাটার ফলে কাগজ এমনিতেই অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। সব বুকওয়ার্মই (অর্থাৎ গুবরে জাতীয় পোকার লার্ভা) বই, কাগজের পক্ষে সমান ক্ষতিকারক নয়। যে সব বুকওয়ার্ম বেশী ক্ষতিকারক তাদের মধ্যে আছে ড্রাগস্টোর বিটল, বা স্টেগোবিয়াম প্যানিসেয়াম (Stegobium paniceum)। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এদের দেখা পাওয়া যাবে। এদের একটি স্ত্রী পোকা একেকবারে প্রায় ১০০ টি

ড্রাগস্টোর বিটল

লার্ভা পিউপা পূর্ণাঙ্গ
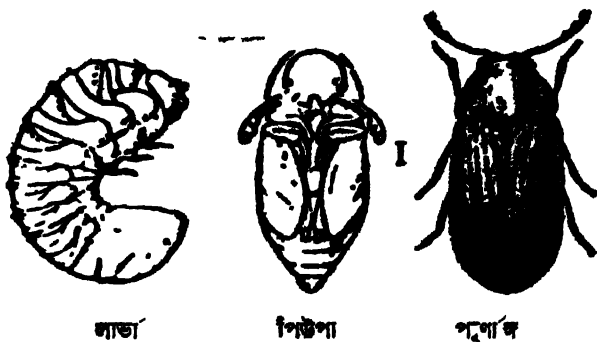
(প্রায় বারোগুণ বড় আকারে দেখানো হয়েছে)

মত সাদা ছোট ছোট (½ মিমি অর্থাৎ $\frac{1}{50}$ ইঞ্চি) ডিম পাড়ে, যা থেকে গরমের সময় ৬ থেকে ১০ দিনের মধ্যে হলদেটে সাদা রংএর লার্ভা জন্মায়। জন্মের প্রায় সাথে সাথেই আশেপাশের খাদ্য, যেমন বইয়ের কাগজ, কাপড়, আঠা ইত্যাদি, খাওয়া সুরু করে দেয়। ৩০/৪০ দিনের মধ্যে এই লার্ভা পূর্ণাঙ্গে রূপান্তরিত হয়। এর মধ্যে ৮/১০ দিন এরা পিউপা অবস্থায় কাটায়। এদের ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পুরো জীবন কাটাতে ৬০/৭৫ দিন লাগে।

আরেকধরণের খুবই ছোট গুবরে পোকা যাদের গোলচে দেহ, ছোট্ট চোখ ও ছোট্ট শরীরের তুলনায় যথেষ্ট বড় শুঁড় ও পায়ের জন্য চট্ করে মাকড়সার সঙ্গে চেহারায় যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। সাধারণভাবে এরা স্পাইডার বিটল

বা টিওনাস ফার (Prionus fur) নামে পরিচিত। এরা কাগজ, বোর্ড, চামড়া, কাপড় ইত্যাদির যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে।

১ সেমি বা ½ ইঞ্চি থেকে কম লম্বা গাঢ় বাদামী রংএর গায়ের উপর হলদেটে দাগ দেওয়া একধরণের গুবরে পোকা সাধারণভাবে লারডার বিটল বা ডারমেসটাস লারডারিয়াস (Darmestes lardarius) নামে পরিচিত। কাগজ, কাপড়ের তুলনায় এরা গ্রন্থাগারের প্রাণীজ নানা জিনিষপত্র যথা চামড়া, পার্চমেন্ট ইত্যাদির বেশী ক্ষতি করে। বইয়ের বাঁধাইয়ের উপর এরা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বের হবার পর লার্ভা তাড়াতাড়ি চামড়া খেয়ে নষ্ট করে ফেলে এবং চেহারায় অনেক বড় হয়ে যায়। পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হবার পর এরা সাধারণত গ্রন্থাগারের বাইরে চলে যায়।

গ্রন্থাগারের কাঠের আসবাবপত্র, তালপাতার পুঁথি, কাঠের পুঁথি ইত্যাদির পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হচ্ছে ঘুনপোকা যা সাধারণভাবে পাউডার পোস্ট বিটল নামেই বেশী পরিচিত। এদের মধ্যে আছে অ্যানোবিয়াম পানকটেটাম (Anobium panctatum) এবং লিকটাস ব্রুনেয়াস (Lyctus brunneus) ডেথওয়াচ বিটল বা জেস্টোবিয়াম রুফোভিলোসাম (Xestobium rufovillosum) ইত্যাদি। কাঠের পক্ষে ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের মধ্যে এরা একমাত্র উইপোকার পরই উল্লেখ্য। এরা কাঠের সরু গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বেরুনোর পর লার্ভা কাঠের মধ্যে সরু সরু সুড়ঙ্গ কেটে কাঠ খেয়ে নষ্ট করে। এদের কাটা সুড়ঙ্গের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম গুঁড়ো গুঁড়ো আটার মত

কার্পেট বিটল
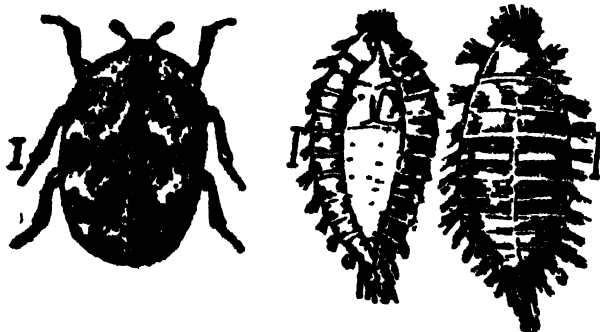
পূর্ণাঙ্গ পিউপা লার্ভা

(প্রায় সাতগুণ বড় আকারে দেখানো হয়েছে)

পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরণের গুঁড়ো দেখতে পেলেই এদের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এরা ভেতরে ভেতরে কাঠের যথেষ্ট

ক্ষতিসাধন করলেও আপাতদৃষ্টিতে প্রথমে বাইরে তার কোন ছাপ পড়ে না, হঠাৎই একদিন কাঠের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে।

একইভাবে সিগারেট বিটল বা ল্যাসিওডারমা সেরিকোরন (Lasioderma serricorne), কার্পেট বিটল বা অ্যানথ্রেনাস স্ক্রোফুলারিয়া (Anthrenus scrophulariae), ফার্নিচার বিটল বা অ্যানথ্রেনাস ফ্ল্যাভিপেস (Anthrenus flavipes), অ্যাটাজেনাস পিকাস (Attagenus piccus) ইত্যাদি গ্রন্থাগারের বাঁধাইয়ের কাপড়, চামড়া, রেশমী কাপড় ইত্যাদির প্রভূত ক্ষতি করে।

এইসব গুবরেই আকারে যথেষ্ট ছোট এবং খোলা জানালা অথবা দরজার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারে ঢোকে এবং ডিম পাড়ে, কখনও কখনও বাসা বাঁধে। যদি এদের ব্যাপক আক্রমণ ঘটে, তবে গ্রন্থাগারের কোন সংগ্রহই এদের হাত থেকে রেহাই পায়না, তা সে তালপাতার পুঁথিই হোক আর বাঁধানো বই-ই হোক।

বুকলাইস

অনেকসময় সেঁতসেঁতে একটা অন্ধকার জায়গায় রাখা দীর্ঘ অব্যবহৃত বই বা কাগজ হঠাৎ খুললে খুব ছোট ছোট একধরণের হলদেটে সাদা পোকাদের পালিয়ে যেতে দেখা যায়—এরাই হচ্ছে বুকলাইস বা লিপোসেলিস ডিভিনাটোরিয়াস (Liposcelis divinatorius) অথবা অ্যাট্রোপোস পালসেটোরিয়া (Atropos pulsatoria)। এরা কোরোডেনশিয়া গোষ্ঠীর (Order Corrodentia) অন্তর্ভুক্ত। এদের ডানাহীন নরম দেহের মধ্যে মাথার অংশ অপেক্ষাকৃত বড় এবং মুখের অংশ চিবানোর উপযোগীভাবে গঠিত। ছোট

বুকলাইস
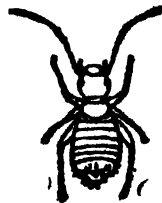
(প্রায় আঠারোগুণ বড় আকারে দেখানো হয়েছে)

পুঞ্জাক্ষি এবং এদের শুঁড় প্রায় দেহের সমান লম্বা এবং পাগুলোও বড়। এদের মধ্যে অধিকাংশই বই / কাগজ ইত্যাদির মধ্যেই থাকলেও সরাসরি কাগজের সেলুলোজ, আঠা বা জিলেটিন খায় না। এদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ছত্রাক। (অবশ্য কয়েকটি প্রজাতি কাগজের উপরের আস্তরণেরও ক্ষতিসাধন করে)।

গ্রন্থাগার সংগ্রহের বড় ধরণের ক্ষতি এরা না করলেও, এদের উপস্থিতি বৃহত্তর ক্ষতির বার্তাবহ—যদি না অবিলম্বে গ্রন্থাগার ভবনের ভিতরের আবহাওয়ার উন্নতি ঘটাবার ব্যবস্থা করা হয়।

বোলতা / ভীমরুল জাতীয় পোকা

এই জাতীয় পোকারা গ্রন্থাগার সংগ্রহের সরাসরি কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু এদের মধ্যে কয়েকটি প্রজাতি আছে (সংখ্যায় ৩৫/৪০ টি) যারা ঘরের মধ্যে বাসা বানায় (সাধারণত মুখের লালার সাথে মাটি মিশিয়ে) যার মধ্যে এরা ডিম পাড়ে। শুকোবার পর লালা মিশ্রিত এই মাটি সিমেণ্টের মত শক্ত হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, এরা গ্রন্থাগারে তাকের কোণায় বা বইয়ের গায়ে এই ধরণের ঘর বানিয়েছে যেগুলো পরিষ্কার করার সময় প্রায়ই তাকের অথবা বইয়ের ক্ষতি হয়ে থাকে। এরা সবাই হাইমেনোপটেরা গোষ্ঠীর (Order Hymenoptera) এবং ইউম্যানিডি পরিবারের (Family Eumenidae) অন্তর্ভূক্ত। এদের মধ্যে ইউমেনেস ফ্রাটারণা (Eumenes fraterna) উল্লেখযোগ্য।

মথ

মথ লেপিডোপটেরা গোষ্ঠীর (Order Lepidoptera) অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে অল্প কয়েকধরণের মথকে আমরা গ্রন্থাগারের মধ্যে দেখতে পাই, যাদের লার্ভা গ্রন্থাগারের বইপত্রের বাঁধাইয়ের কাপড়, চামড়া ইত্যাদির ক্ষতি করে। এই ধরণের ক্ষতিকারক মথ টিনেইডি পরিবারের (Family Tineidae) অন্তর্ভুক্ত। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এই মথেরা অত্যন্ত নিরীহ এবং কোনভাবেই গ্রন্থাগারের ক্ষতি করে না। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এরা কোন খাদ্য গ্রহণ করেনা। এরা সাধারণত এমন জায়গায় ডিম পাড়ে (বাঁধাইয়ের চামড়া বা কাপড়ের উপর) যেখানে ডিম ফুটে বার হবার পর লার্ভার জন্য যথেষ্ট খাবার কাছাকাছি মজুত থাকে। একেকটি স্ত্রী মথ ১০০ থেকে ১৫০টি ছোট্ট ছোট্ট ডিম পাড়ে, দেওয়ালের বা তাকের ফাটলে বা ফাঁকে অথবা বইয়ের আড়ালে বা খাঁজে। এর দিন পাঁচেকের মধ্যে ডিম ফুটে সাদা ছোট, ছোট লার্ভা বেরিয়ে আসে। এরা কতদিন লার্ভা অবস্থায় থাকবে সেটা নির্ভর করে এদের খাদ্য সরবরাহের ওপর, যেটা সাধারণত ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মত হয়। কিন্তু যথাযথ খাদ্য সরবরাহের অভাবে এই অবস্থায় এরা প্রায় ৪ বছরও থেকে যেতে পারে। খাদ্য সরবরাহ ছাড়া আরেকটি যে জিনিষ এদের জীবনের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রন করে,

সেটা হচ্ছে বাতাসের আর্দ্রতা। সাধারণত ঘরের তাপমাত্রায় ৭৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় এদের জীবনের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে সীমিত হয়ে পরে। কালো মাথাওলা রোমহীন লার্ভা অবস্থায় এরা বইয়ের বাধাইয়ের চামড়া, কাপড় খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। এখানে একটা ব্যাপার উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সাধারণত মথ ছাগলের চামড়ার কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু এর পিছনে ঠিক কি কারণ আছে সেটা আমাদের জানা নেই। পিউপা অবস্থায় এরা ১ থেকে ৪ সপ্তাহ কাটায়, তারপর পূর্ণাঙ্গ অবস্থা লাভ করার পর আরো ১/২ সপ্তাহ বাঁচে। যদিও এদের পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া যায়, তবু এদের উপদ্রব

ক্লথ মথ
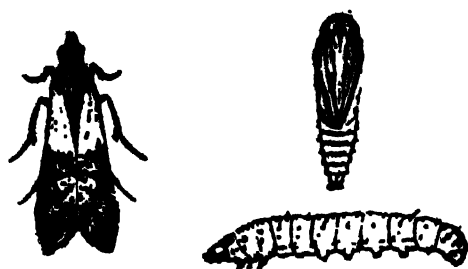
পূর্ণাঙ্গ পিউপা (উপরে), লার্ভা (নীচে)

(প্রায় আড়াইগুণ বড় আকারে দেখানো হয়েছে)

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কার্পেট মথ বা ট্রাইকোফ্যাগা ট্যাপেজেলা (Trichophaga tapetzella); ক্লথ মথ বা টিনিয়া পেলিওনেলা (Tinea pellionella) এবং টিনিওলা বিসেলিলা (Tineola bissellielia)।

কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে গ্রন্থাগার সংগ্রহকে বাঁচাবার ব্যবস্থা

প্রথমেই যে কয়েকটি ব্যবস্থার দরকার সেগুলি হচ্ছে (১) গ্রন্থাগারের ভিতরের এবং আশপাশের পরিবেশকে অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে (২) কীটপতঙ্গের আক্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে খুব সচেতন থাকতে হবে এবং (৩) গ্রন্থাগারের প্রতিটি অংশে নিয়মিতভাবে নজরদারি (inspection) করতে হবে। এই তিনটি ব্যবস্থা যদি ভালভাবে নেওয়া যায়, তবে কীটপতঙ্গের আক্রমণের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমিয়ে ফেলা সম্ভব। শুধুমাত্র গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীই নয়—গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদেরও এ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। খাবারের মোড়ক, খাবারের অবশিষ্ট

অংশ ইত্যাদি গ্রন্থাগারের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ এগুলির লোভে কীটপতঙ্গ গ্রন্থাগারে ঢুকতে পারে। যে সব সংগ্রহ দীর্ঘদিন অন্ধকার সেঁতসেঁতে পরিবেশে অনেকদিন আলাদাভাবে ছিল, সেগুলো পুরোপুরি ভালকরে পরীক্ষা না করে গ্রন্থাগারের অন্য সংগ্রহের সঙ্গে মেশানো উচিত নয়। গ্রন্থাগারে নতুন কোন প্রাচীন, দুর্লভ সংগ্রহ সংযোজিত হলে, প্রথমে তাকে ভাল ভাবে পরিশোধিত করে, তবে অন্য সংগ্রহের সঙ্গে রাখতে হবে। প্রয়োজনবোধে ধূপন পদ্ধতি (fumigation chamber) ব্যবহার করা যেতে পারে।

শীতাতপনিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিকারের ব্যাপারে কিছুটা ভাল ফল পাওয়া যায়, কারণ ঐ ব্যবস্থায় জানলা বা দরজার মাধ্যমে গ্রন্থাগারে সাধারণভাবে কীটপতঙ্গের ঢোকার সম্ভাবনা অনেক কমে যায় এবং কয়েক ধরণের কীটপতঙ্গের বসবাসের অনুপোযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

প্রাচীন ভারতে পুঁথিপত্র লাল বা হলুদ কাপড়ে মুড়ে রাখা হ'ত পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ঐ রংগুলো পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেনা। তবে সেকালে ঐসব কাপড় রংকরা এবং ব্যবহারের জন্য তৈরী করার সময় কয়েকধরণের ভেষজের ব্যবহার করা হ'ত, যেগুলো পোকামাকড়কে দূরে সরিয়ে রাখার পক্ষে উপযোগী ছিল।

আগে কীটপতঙ্গের লার্ভা এবং ডিম ধ্বংস করার জন্য বইপত্র সরাসরি রোদে রেখে দেবার ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। কিন্তু সরাসরি রোদে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ কখনই রাখা উচিত নয়, কারণ তারফলে সংগ্রহের অন্য অনেকক্ষতি হতে পারে যেগুলো সম্বন্ধে আমরা আলোর ক্ষতিকারক ক্ষমতার ব্যাপারে অলোচনা করার সময় দেখেছি। (১০৯-১১৩ পৃ)

কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নানা ধরণের রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার যেমন ন্যাপথালিন, ওডোনিল, প্যারাডাইক্লোরো বেনজিন ক্রিসট্যাল, কর্পূর, বার্চের শিকড়ের গুড়ো বা তেল, ক্রিয়োজট অয়েল, লবঙ্গের তেল (clove oil), ইত্যাদির ব্যবহার করা চলে। সাধারণভাবে ফিনিট, বেগন, ফ্লিট ইত্যাদির ব্যবহার নিয়মিতভাবে কয়েকদিন পর পর করা উচিত, কারণ এই রাসায়নিকগুলি একবার ছিটিয়ে স্প্রে (spray) করে দিলে কয়েকদিনের মধ্যেই উবে যাওয়ায়, এর কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্যই এটির নিয়মিত প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী।

এ হল সাধারণভাবে কীট পতঙ্গের প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এবার বিশেষ ধরণের কীটপতঙ্গের জন্য যেসব বিশেষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা চলে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

সিলভারফিস, ফায়ারব্রাটস এবং ঐ জাতীয় কীটের জন্য ময়দার সাথে বোরিক অ্যাসিড্ মিশিয়ে এদের বিচরণ ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিলে কিংবা ১৬ ভাগ সোডিয়াম ফ্লোরাইড ১০ ভাগ গুড়ো চিনি এবং ৫ ভাগ গুড়ো লবণ ২০০ ভাগ ময়দার সঙ্গে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু দ্বিতীয় মিশ্রণ ব্যবহারের সময় সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন, কারণ সোডিয়াম ফ্লোরাইড একটি মারাত্মক বিষ। এই ধরণের প্রয়োগে একটা বড় অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এতে গ্রন্থাগারের ভেতরের পরিচ্ছন্নতা ব্যাহত হতে পারে। এর বিকল্প হিসাবে বিশেষ ধরণের কাচের পাত্রে করে অল্প পরিমান ময়দা (এক চামচ) কিছু দূরে দূরে (তিন/চার ফুট অর্থাৎ ১ মিটার) গ্রন্থাগারের মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে ঢাকা অবস্থায় রাখা হবে যাতে সিলভারফিস এবং ঐ জাতীয় কীটেরা ময়দা খাবার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে ঐ পাত্রে ঢুকবে অথচ ওখান থেকে আর বের হতে পারবে না। এছাড়াও ৫% ডিডিটি, ২.৫% ক্লোরডেন (Chlordane), ১% লিনডেন (Lindane) বা 0·5% ডাইএলড্রিন (Dieldrin) অথবা ১% পাইরেথ্রিনস (Pyrethrins) ছিটিয়ে অর্থাৎ স্প্রে করো ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। যেসব অঞ্চলে এদের আক্রমণ বেশী সেখানে ভাল ভাবে স্প্রে করা উচিত।

বুকওয়ার্ম, বুকলাইস ইত্যাদির ক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত কীটনাশক স্প্রে করাই সবচেয়ে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা। এছাড়াও ডি ডি টি, সোডিয়াম ফ্লুরাইড, হোয়াইট আর্সেনিক ইত্যাদিও ছড়ানো চলে। কিন্তু যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে সেগুলি প্রয়োগ করা দরকার, কারণ এগুলি সবই যথেষ্ট বিষাক্ত রাসায়নিক। হোয়াইট আর্সেনিক ব্যবহারের সময় জল দিয়ে এটি ভিজিয়ে দিতে হবে যাতে এটি সহজে দলাপাকা অবস্থায় থাকে। ডালাখোলা কার্ডবোর্ডের বাক্সে এটি রাখতে পারলে ভাল হয় কারণ তাতে গ্রন্থাগারের ভিতরের পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন হবার সম্ভাবনা কম থাকে। যেসব বইপত্রে আক্রমণ সুরু হয়ে গেছে সেগুলো আলাদা করে সরিয়ে রাখতে হবে, যাতে অন্যান্য সংগ্রহে হামলা না ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত সংগ্রহের যথোপযুক্ত ধূপণের (Fumigation) ব্যবস্থা করা দরকার।

আরশোলার জন্য কীটনাশক স্প্রে করা ছাড়াও বেগন বেট্ (Baygon Bait)

ব্যবহার করা চলে—যেটি ২% ২-আইসোপ্রোপোক্সিফেনাইল মিথাইল কার্বোমেট (2-isopropoxyphenyl methyl carbomet) থেকে প্রস্তুত। তবে বড় আরশোলার (আমেরিকান) ক্ষেত্রেই এটি বেশী ফলপ্রসূ। ছোট আরশোলার (জার্মান) মধ্যে কয়েকটি প্রজাতি সাধারণ কীটনাশক সহ্য করার ক্ষমতা লাভ করায় সেগুলোতে এদের কোন ক্ষতি হয় না। সেক্ষেত্রে ১%—৫% ম্যালাথিয়ন (Malathion), ০'৫% ডায়াজিনন অথবা ১% ডিক্যাপথন (Dicapthon) স্প্রে করে সুফল পাওয়া যাবে। অন্ধকার সেঁতসেঁতে জায়গাগুলোতে যেখানে এদের বাসা বানাবার অনুকূল পরিবেশ আছে সেখানে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। জার্মান আরশোলার জন্য ১০% বোরিক অ্যাসিড, ৯০% গুঁড়ো চিনির সাথে মিশিয়ে খাবার টোপ হিসাবে ব্যবহার করেও ভাল ফল পাওয়া সম্ভব।

উইপোকার আক্রমণের প্রতিরোধের ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার ভবন তৈরীর সময় থেকেই, বাড়ীর জন্য নির্বাচিত মাটিতে বিশেষধরণের রাসায়নিক প্রয়োগ করে সুরু করা উচিত। (১) ০ ৫% এলড্রিন বা ডাইএলড্রিন, (২) ০ ৮% লিনডেন (৩) ১% ক্লোরডেন তেলে অথবা জলে মিশ্রণ করে মাটিতে খুব ভাল ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও (৪) ৮% ডিডিটি (৫) ২৫% ট্রাই-ক্লোরোবেনজিন (৬) ৫% পেণ্টাক্লোরোফেনলের তেলে মিশ্রণ প্রয়োগেও ভাল ফল পাওয়া যায়। (৭) ১০% সোডিয়াম আরসেনেট জলে মিশ্রণও প্রয়োগ করা চলে। এখানে মনে রাখা দরকার তেলে মিশ্রণের পরিবর্তে জলে মিশ্রণই সম্ভব হলে ব্যবহার করা উচিত। কারণ তার ফলে অগ্নিকাণ্ডজনিত ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যায়। এখন আরো অনেক নতুন নতুন রাসায়নিকের ব্যবহার করা হচ্ছে—যার ফলে আপত্তিকর গন্ধ এবং অন্যান্য কিছু অসুবিধার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। উইপোকার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বাড়ী তৈরীর সময় দেখতে হবে কাঠের কাঠামো যেন মাটির সংস্পর্শে না আসে। বাড়ীর কাঠের কাঠামোতে রং লাগাবার সময় রংএ বিশেষ কীটনাশক রসায়ন (যেমন টারমেক্স (Termex) মিশিয়ে দিতে হবে। কাঠের তাক (shelf) ব্যবহার করা হলে দেখতে হবে তাকের কাঠামো যেন মাটি না ছুঁয়ে থাকে। প্রয়োজন হলে তাকের পা'গুলো বাটির মধ্যে কেরাসিন রেখে তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে। যেসব কাঠের অংশ মাটির কাছাকাছি রয়েছে অথবা যেখানে উইপোকার আক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, সেগুলোকে আলকাতরা-ক্রিয়োজট মিশ্রণ, জিংক ক্লোরাইড, মারকিউরিক ক্লোরাইড, সোডিয়াম ফ্লুরোসিলিকেট ইত্যাদির যে কোনটিতে

ভালভাবে সিক্ত করে নিতে হবে অথবা অত্যন্ত উচ্চচাপে কাঠে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে রাসায়নিক পদার্থ কাঠের ভিতরে ভালভাবে ঢুকে যায়। বাড়ীতে যদি উইপোকার উৎপাত থেকে থাকে তবে সম্ভব হলে কাঠের আলমারী, মঞ্চ ইত্যাদির বদলে স্টীলের আসবাবপত্রই ব্যবহার করা উচিত। আক্রান্ত বইপত্রের মধ্যে যেগুলো সংরক্ষণেরযোগ্য সেগুলো বেছে নিয়ে ঝাড়পোঁছ করে উপযুক্ত ভাবে ধুপন করে নেওয়া দরকার।

ঘুনপোকার আক্রমণের প্রতিকারে মিথাইল ব্রোমাইড ধুপন অত্যন্ত কার্যকরী উপায়। এছাড়া (১) ৫% ডিডিটি অথবা ২% ক্লোরডেন বা ০'৫% লিনডেন কেরাসিনে মিশিয়ে, (২) ৫% পেন্টাক্লোরোফেনল তেলে মিশিয়ে, (৩) ১০ ভাগ বোরাক্স, ১00 ভাগ জলে, ১২৫ গ্রাম সোডিয়াম লাউরিল সালফেটের (Sodium Lauryl Sulphate) মিশ্রণের প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

গুবরেজাতীয় পোকার লার্ভার প্রতিকারের পক্ষে সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি ধুপন প্রক্রিয়া। সাধারণভাবে ৫% ডিডিটি অথবা ২% পাইরেথিন কেরাসিনে মিশ্রণ প্রয়োগ করে এদের বিরুদ্ধে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। আধুনিক আলোর ফাঁদের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ পোকাকে সেদিকে আকৃষ্ট করে ধ্বংস করা সম্ভব। এই ধরণের আলোর ফাঁদ ব্যবহারের সময় ঘরের অন্য সব আলো নিভানো থাকলে বেশী ভাল ফল পাওয়া সম্ভব।

মথের প্রতিরোধে গুবরে পোকার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ব্যবস্থাই সুফল দেবে।

ইঁদুর জাতীয় প্রাণী

ইঁদুর, কাঠবেড়ালী জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে ইঁদুরই গ্রন্থাগারে ঢুকে বাসা বাঁধতে পারলে, সংগ্রহের যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। এদের খাদ্যের মধ্যে কাগজ, কাপড়, চামড়া, বোর্ড ইত্যাদি সবকিছুই আছে। অপরিচ্ছন্ন গ্রন্থাগার এবং মেঝে, দেওয়ালে অথবা অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকার মত অন্ধকার গর্ত বা ঘুপচি জায়গা ইত্যাদি ইঁদুরকে আকর্ষণ করে। যদি এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় যেখানে এই ধরণের সুবিধা নেই, তবে সে গ্রন্থাগারে এরা বাসা বানাতে পারেনা। গ্রন্থাগারের মধ্যে খাবারের মোড়ক বা খাবারের অবশিষ্টাংশ থাকলেও সেটা এদের আক্রমণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

একবার এদের আক্রমণ সুরু হলে নানারকমের ফাঁদ ব্যবহার করা হয়, এদের

ধরার জন্য। কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখা যাবে যে ইঁদুর আর কলে ধরা পড়ছে না। টোপ সম্বন্ধে এরা সাবধান হয়ে যায়। টোপে ব্যবহৃত খাবারের রদবদল করে বা স্থানপরিবর্তন করে, নানাধরণের কল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করলে এই ধরণের সমস্যা কিছুটা সমাধান হতে পারে। টোপের মধ্যে মাংস, মাছ, নারিকেল তেলের গন্ধ যুক্ত খাবার ইত্যাদির ব্যবহার করা চলে কারণ

এগুলো এদের খুবই পছন্দ। উগ্র গন্ধযুক্ত ন্যাপথালিন, প্যারাডাইক্লোরো-বেনজিন, কর্পূর ইত্যাদি এরা সহ্য করতে পারে না। এ ছাড়া এদের যাতায়াতের পথে কষ্টিক সোডা ছড়িয়ে রাখলে তার ওপর দিয়ে যাতায়াতের ফলে এদের পায়ে ঘা হয়ে যায়, যেটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে গিয়ে মুখে এবং জিবে ঘা হয়ে যায়, ফলে এরা ভয়ে সেই অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু এই ধরণের ব্যবস্থা করার সময় মনে রাখা দরকার যে কষ্টিক সোডা আমাদের ত্বকের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকারক এবং গ্রন্থাগারের পরিচ্ছন্নতার পথে এই পদ্ধতি বাধা সৃষ্টি করে।

ইঁদুর মারার জন্য নানা ধরণের বিষের ব্যবহার চালু আছে, যেমন আরসেনিক ট্রাইঅক্সাইড, বেরিয়াম কারবোনেট, ফসফরাস, জিঙ্ক ফসফাইড, মারকিউরিক ক্লোরাইড, সোডিয়াম ফ্লুরাইড ইত্যাদি। এগুলি প্রত্যেকটি মারাত্মক বিষ, অতএব ব্যবহারের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এধরণের বিষ সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষ

শুনতে একটু অদ্ভুত ঠেকলেও নিঃসংকোচে বলা চলে গ্রন্থাগার সংগ্রহের প্রধান শত্রুদের মধ্যে মানুষের নাম প্রথম সারিতেই। ক্ষতিকারক মানুষের

আলোচনায় প্রথমেই গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীর কথা এসে পড়ে, তারপর আসে ব্যবহারকারীদের কথা।

গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বের মধ্যে প্রথমেই যেটা পড়ে সেটা হচ্ছে সংগ্রহের যথাযথ সংরক্ষণ এবং ব্যবহার সুনিশ্চিত করা। সংগ্রহের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে স্থির করা উচিত বিশেষ কোন দুর্লভ সংগ্রহ ব্যবহারের সুযোগ কি সার্বজনীন হবে, না শুধুমাত্র গবেষক বা বিদ্বৎমণ্ডলীর জন্য থাকবে অথবা মূল সংগ্রহ ব্যবহারের সুযোগ কাউকেই দেওয়া হবে না। ইচ্ছুক ব্যবহারকারী প্রতিলিপি বা ফটোকপিই দেখতে পারেন। কিন্তু সবসময়েই এই ধরণের বিধি নিষেধ আরোপ করার আগে নিশ্চিতভাবে বুঝে নিতে হবে যে এই ধরণের একটা ব্যবস্থা অপরিহার্য কিনা। অকারণ এ ধরণের কড়াকড়ি করাটা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মৌল ভাবাদর্শের পরিপন্থী। দুর্লভ সংগ্রহ ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন যাচাই করে, যথাযথ সাবধানতা অবলম্বনের পর এবং সংরক্ষণের অনুকূলে উপযুক্ত বলে মেনে নিলে, পাঠক/ব্যবহারকারীকে পূর্ণ/সীমিত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার হেতু থাকে না।

গ্রন্থাগার সংগ্রহ, তার রক্ষা ও বৃদ্ধি একটি সামাজিক দায়িত্ব—প্রাথমিকভাবে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং প্রকৃত বিচারে ভবিষ্যৎ ব্যবহারকারীদের প্রতিভূ হিসাবে বর্তমান ব্যবহারকারীদেরও। শ্রদ্ধেয় এস আর. রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের একটি হচ্ছে "বই—ব্যবহারের জন্য"। (যে গ্রন্থ ব্যবহৃত হয় না বা হতে পারছে না, তার স্থান—সাময়িকভাবে কোন স্বীকৃত গুদাম ঘরে, এবং অবশেষে আরো অন্যত্র বা অন্য ব্যবহারে।) অতএব বই বার বার ব্যবহৃত হবে—এবং তার অবস্থার পরিবর্তন হবেই—যেমন বাঁধাই ঢিলে হয়ে যেতে পারে, পাতা খুলে আসতে পারে, পৃষ্ঠার অংশ বিশেষ দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এদিকে গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টি থাকা উচিত যাতে যথাসময় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

অবশ্য গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদেরও সহযোগীতার মনোভাব নিয়ে বুঝতে হবে এবং এবিষয়ে গ্রন্থাগার কর্মীদেরও ক্ষেত্রবিশেষে একটু দায়িত্ব থাকে ব্যবহারকারীদের বুঝিয়ে দেওয়ার, যে ব্যবহারের সময়ে সামান্য ত্রুটিগুলি নিজের/অন্যের অনেক বড় ক্ষতি/অসুবিধার কারণ হয়ে উঠতে পারে; যথা—

(১) বইয়ের পৃষ্ঠার কোনাটা মুড়ে রাখা (কতটা পড়া হয়েছে মনে রাখার জন্য)

(২) বইয়ের মধ্যে কলম, পেন্সিল রেখে বই বন্ধ করে রাখা (যাতে পরেরবার খুলবার সময় সহজেই নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাটা বের করা চলে)

(৩) বইকে খুলে উল্টো করে (পুট উপরের দিকে) টেবিলে রেখে উঠে যাওয়া।

(৪) বইয়ের পুট ধরে টেনে তাক থেকে নামানো (পুট এবং বাঁধাই এতে ছিঁড়ে যেতে পারে)।

(৫) বইয়ের পৃষ্ঠার পেন, পেন্সিল দিয়ে দাগ কাটা/মন্তব্য লেখা।

(৬) বইয়ের পৃষ্ঠা অসাবধানে উল্টানো (বইয়ের পৃষ্ঠা উপরের দিক থেকে ধরে আস্তে করে উল্টাতে হয়, নতুবা কাগজের উপর চাপ পড়ে এবং ছিড়ে যেতে পারে)

(৭) বিছানায় শুয়ে বই পড়া (শুয়ে বা আধশোয়া অবস্থায় বই পড়লে, যেহেতু এক হাতে বই ধরতে হয়, সেজন্য একটু মোটা বই হলে বাঁধাইয়ে এবং কাগজের উপর চাপ পাড়ে) ইত্যাদি।

এছাড়াও কিছু ব্যবহারকারীকে বইয়ের আরো মারাত্মক ক্ষতি করতে দেখা যায় যেমন—পাতা কাটা, চুরি করা ইত্যাদি। এই সব ব্যবহারকারীরা নিঃসন্দেহে নৈতিক দিক থেকে খুবই অধঃপতিত। কিন্তু যেহেতু সাধারণত এদের সহজে চেনা সম্ভব নয়, সেহেতু চোখ কান খোলা রেখে গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজ করে যেতে হবে। যতদিন পর্যন্ত না শিক্ষা ও সমাজ সচেতনার মান উন্নীত হচ্ছে, গ্রন্থাগার সংগ্রহের ক্ষতি / অপচয় ঘটবেই, নজরদারীর অভাব বা ঘাটতি ঘটলেই। উচ্চবিত্ত সমাজে এই বই চুরির ব্যাপারটাকে ইদানিং একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং গুরুতর ক্ষতির কারণ না হলে, এটিকে ব্যক্তিবিশেষের তথা পুস্তকপ্রেমীবিশেষের স্বার্থপরতার বাড়াবাড়ি বলে গণ্য করা হয়। পাঠকের নৈতিক চরিত্র সংশোধন বা হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার জাতীয় ধারণাগুলি অন্ততঃ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে—এখন বাতিল হতে চলেছে। পরিহাস ছলে এমনও বলা হয়, অপহৃত পুস্তকটির রক্ষণাবেক্ষনের ভার সমজদার ব্যক্তি নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন।

বই চুরি বা বইয়ের পাতা কাটা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে গেলে দরকার অত্যন্ত সতর্ক নজরদারী ব্যবস্থা এবং এই ধরণের কোন ঘটনা নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ থেকে সেই ব্যবহারকারীকে অপসারণ এবং ঘটনা সম্বন্ধে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়

বন্যা

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে জলই গ্রন্থাগারের বেশী ক্ষতিকারক। আমাদের দেশে অতিবৃষ্টিজনিত জল জমা (water logging) বা বন্যার সমস্যা খুবই সাধারণ এবং প্রতি বছরই দেশের কোন না কোন অঞ্চল এর দ্বারা বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হচ্ছে। অতি বৃষ্টি ছাড়াও কর্মীদের অসাবধানতার জন্য অথবা অন্যকারণেও জলজনিত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, যেমন জলের পাইপ ফেটে, জলনিষ্কাশনের নলে ময়লাজমাজনিত জল জমা ইত্যাদি।

গ্রন্থাগারের ভেতরে তো বটেই তার আশেপাশে যাতে জল না জমে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে, কারণ আশেপাশে জল জমে থাকলে গ্রন্থাগারের ভিতরে সেঁতসেঁতে অবস্থার সৃষ্টি হয়, যেটা সংরক্ষণের পরিপন্থী। অতিবৃষ্টি জনিত জল জমার বা বন্যার ঘটনা যদি মাঝে মাঝে ঘটার সম্ভাবনা থাকে তবে গ্রন্থাগারের নীচের তলায় বই রাখার ব্যবস্থা না রাখাই ভাল। কিন্তু যদি অন্য কোন উপায় না থাকে তবে তাকগুলোকে জলের সাম্ভাব্য উচ্চতা থেকে উঁচুতে রাখার চেষ্টা করতে হবে। সম্ভব হলে তাক রাখার জায়গাগুলো কিছুটা উঁচু করে নিতে হবে। সেটা যদি সম্ভব না হয় তবে নীচের তাকে বই রাখা চলবে না।

বিদেশে উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে জলজনিত বিপদ জ্ঞাপক ব্যবস্থার ব্যবহার করা হয়, যার মাধ্যমে গ্রন্থাগারে জল ঢুকলে বা ঢুকবার উপক্রম হলেই গ্রন্থাগারের নিরাপত্তা বিভাগের অধিকর্তা এবং গ্রন্থাগারিকের কাছে বিপদজ্ঞাপক সংকেত পৌঁছে যায়, যাতে সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। আমাদের দেশে এ ধরণের ব্যবস্থা নেবার মত আর্থিক সামর্থ খুব কম গ্রন্থাগারেরই আছে। সেজন্য আমাদের সাধারণ সাবধানতার ওপরেই বেশী নির্ভর করতে হবে। যেমন ঘরের কোন অংশের ওপর দিয়ে যদি জলের পাইপ যায় তার ঠিক নীচে তাক না বসানোই ভাল, কারণ যদি কখনও জল চুঁইয়ে পড়তে সুরু করে বা পাইপ ফেটে যায় তবে নীচের তাকে বইগুলোর ক্ষতি ঘটবে।

সাধারণ সাবধানতা এবং সচেতন পরিকল্পনা জলের ক্ষতি থেকে গ্রন্থাগারকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু হঠাৎ ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পুরোপুরি রক্ষা পেতে হলে কিছুটা ভাগ্যের দরকার। ঐ ধরণের কোন দুর্যোগ ঘটলে গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রথমে চেষ্টা করতে হবে যেগুলো দুর্লভ

এবং যা সহজে আবার সংগ্রহ করা যাবে না, সে ধরণের জিনিষ পত্র আগে রক্ষার ব্যবস্থা করা।

বড় ধরণের বন্যা বা জল জমাজনিত ক্ষতির সম্মুখিন হবার জন্য যে সব ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন সেগুলো হল—

(১) ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার অতিরিক্ত সাবধানতার ব্যবস্থা করা, যাতে অবস্থার আরো অবনতি না ঘটে।

(২) পরিবেশ স্থিতিশীল করার সম্ভাব্য সব চেষ্টা করতে হবে। তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা যতটা সম্ভব কমাতে হবে। এটা যত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হবে, সেটা গ্রন্থাগার ভবন এবং গ্রন্থাগার সংগ্রহ দুইয়ের পক্ষেই বেশী ভাল। তাপমাত্রা ২১° সে এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০% (যদি বাতাসের আর্দ্রতা খুব কম থাকে) ছত্রাকের বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ। সাধারণত ভেজা জিনিষপত্রের ওপর ছত্রাকের বৃদ্ধি সুরু হয়, ৪৮ ঘণ্টা অর্থাৎ দুইদিন পর।

(৩) উদ্ধারকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিষপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

(৪) উদ্ধারকার্যে নিযুক্ত কর্মীদের একত্রিত করতে হবে।

(৫) জল ক্ষতিগ্রস্থ বইপত্র ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে সরিয়ে নিতে হবে—

(ক) 'রিলে' ব্যবস্থার মাধ্যমে ভেজা বই সরাতে হবে।

(খ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কাছাকাছি অথচ সম্পূর্ণ নিরাপদ জায়গাতে জিনিষগুলো রাখতে হবে।

(গ) সবচেয়ে বেশী ভেজা জিনিষপত্রগুলো সবার আগে সরানো হবে।

(ঘ) ভেজা জিনিসগুলো ক্ষতির পরিমান অনুসারে আলাদা আলাদা ভাবে (সম্ভব হলে প্লাষ্টিকের মুখ খোলা মাদার ডেয়ারীর দুধের বাক্সে) রাখতে হবে। গায়ে লেবেল লাগাতে হবে যা থেকে বোঝা যাবে—ক্ষতির পরিমাণ (অর্থাৎ বেশী ক্ষতিগ্রস্থ, মাঝারি ক্ষতিগ্রস্থ অথবা কম ক্ষতিগ্রস্থ ইত্যাদি), বা কোন বিভাগে বা কোন ঘরে যাবে ইত্যাদি।

(ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত জিনিষ পত্র যথাযথ বিভাগে পৌঁছে দিতে হবে।

(চ) সম্ভব হলে বায়ুশূন্য অবস্থায় শুকোবার ব্যবস্থা (Vacuum drying) করতে হবে।—শুকোবার পর প্রয়োজনীয় ধূপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) ফটোগ্রাফ এবং ঐ জাতীয় ভেজা জিনিষ ভেজা অবস্থাতেই রাখতে হবে তারপর সেটা হিমাঙ্কের নীচে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রাবিশিষ্ট গাড়ীতে (refrigerated car) করে গবেষণাগারে পাঠাতে হবে, যেখানে এই ধরণের ক্ষতিগ্রস্থ জিনিষপত্রের সারানোর ব্যবস্থা আছে।

(৭) যেসব জিনিষ বাতাসে শুকোতে হবে সেগুলো আলাদা করে শুকোবার জন্য পাঠাতে হবে। (কোটেড্ পেপার/আর্ট পেপারের বই বাতাসে শুকোনো যাবে না, কারণ তাহলে ওগুলোর একটা পৃষ্ঠা অন্যটার সাথে জুড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে, যাকে ব্লকিং (blocking) বলে।

(ক) ভেজা জিনিষপত্র বাতাসে শুকোবার জন্য একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে সেখানে সব সরাতে হবে—যদি দেখা যায় যে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জল / তাপমাত্রা / আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হচ্ছে না।

(খ) বড় বড় টানা টেবিলে সাদা নিউজপ্রিন্ট কাগজ বিছিয়ে, তার ওপর ভেজা জিনিষপত্র রাখতে হবে। এরপর বৈদ্যুতিক পাখা এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রনের অন্যান্য ব্যবস্থাও করতে হবে।

(গ) ভেজা বইপত্রের সরাবার জন্য বুকট্রলি (book trolly) ব্যবহার করা যায়।

(ঘ) ভেজা .বইগুলো দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে মলাটগুলো একটু ফাঁক করে। পাখা যাতে খুব জোরে না চলে, কারণ সেক্ষেত্রে পৃষ্ঠা বাতাসে উল্টে যাবার এবং কাগজ ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। পাশের থেকে বইগুলোকে একটু ঠেকা দিয়ে দিতে (support) হবে যাতে ভেতরের পৃষ্ঠা ঝুলে গিয়ে বাঁধাইয়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে—অন্যথায় বাঁধাই নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে এবং বইয়ের আকৃতিও (shapte) নষ্ট হতে পারে।

(ঙ) প্রায় শুকনো হয়ে গেলে বইগুলো বাঁধাইয়ের মলাটের ওপর ভর করে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। দুদিক থেকে ঠেকা দিতে হবে, কাগজে মোড়া ইট দিয়ে, যাতে বইগুলো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

(চ) সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে ধূপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ভালভাবে পরিষ্কার করে ছত্রাক এবং কীটনাশক প্রয়োগ করে পরিশোধিত করতে হবে।

(৯) শুকানো ও ধূপন হয়ে যাবার পর প্রয়োজন মত সারানো / বাঁধাই ইত্যাদি সেরে নিতে হবে।

(১০) যেসব বই বাতাসহীন অবস্থায় শুকানো হয়েছে (vacuum drying) সেগুলো ছয় মাস বিশেষ অবস্থায় আলাদাভাবে রাখতে হবে, যাতে ওর মধ্যেকার আর্দ্রতা স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে আসে। ঐ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার পর সেগুলোর প্রয়োজনীয় সারানো / বাঁধানোর ইত্যাদি করতে হবে।

আগুন

সাধারণভাবে আগুন অন্যান্য ব্যাপারে যতটা—গ্রন্থাগারের পক্ষে তার চেয়েও অনেক বেশী ক্ষতিকারক। আগুনের আক্রমণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যে—

(১) কোনরকম প্রস্তুতির সময় না দিয়েই এই বিপর্যয় এসে পড়ে।

(২) গ্রন্থাগারের সংগ্রহের সবই কমবেশী দাহ্য।

(৩) কোন আনাচেকানাচে এর সূরু হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের নজরে চট করে নাও আসতে পারে — নজরে পড়ার আগেই এর বিস্তার ঘটে যায় অনেকখানি।

(৪) আগুন নেভাবার জন্য সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত বস্তুটি হচ্ছে জল— কিন্তু আগুন নেভাবার জন্য নল (হোস) থেকে জোরে জল ছিটালে তার ফলে বইপত্রের নতুন করে আরো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে—কাপড়ের রং নষ্ট হতে পারে, চামড়া ফুলে ওঠে, একটা পৃষ্ঠা আরেকটার সাথে জুড়ে যেতে পারে, কাগজ নরম ও দুর্বল হয়ে যায়।

(৫) বড় আকারের আগুনের ক্ষেত্রে, সেটি সম্পূর্ণ আয়ত্বে না আসা পর্যন্ত ভিতরে ঢুকে উদ্ধারকার্য সুরু করা প্রায় অসম্ভব।

আগুনের তাপ থেকে কাগজপত্রের স্বাভাবিক আর্দ্রতা নষ্ট হয়ে ক্ষতি সুরু হয়। বেশী আগুনের আক্রমণে কাগজ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আগুনের ক্ষতি থেকে প্রতিরক্ষার সুবিধার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেগুলো হল—

(১) গ্রন্থাগার ভবনের পরিকল্পনার পর্যায় থেকেই অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থার কথা ভেবে নক্‌সা তৈরী করতে হবে।

(২) গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের বিন্যাসের ব্যাপারেও অগ্নিনিরোধক বিষয়ের চিন্তাটা সামনে রাখতে হবে।

(৩) অগ্নিনিরূপণের (detection) ব্যবস্থা রাখতে হবে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে, কারণ এটির সামান্য ত্রুটি বৃহত্তর ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

(৪) সবশেষে অগ্নিনির্বাপনের যথেষ্ট এবং যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

আগুনের ক্ষতির সম্ভাবনার কথা মনে রেখে, উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্বলিত গ্রন্থাগারভবন পরিকল্পনা হয়ে থাকলে অনেকক্ষেত্রে আগুনলাগার ঘটনা ঘটতেই দেয় না, অথবা ঘটলেও তার বিস্তার সীমিত করে।

গ্রন্থাগার ভবন পরিকল্পনার স্তরে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা

যদি গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণে অগ্নিনিরোধক উপাদান ব্যবহার করা হয় তবে সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এধরণের গ্রন্থাগারে আগুনজনিত কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না। হয়ত এভাবে বানানো বাড়ীতে আগুনের ফলে দেখা গেল, ভেতরের সব সংগ্রহ ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হল, অথচ বাড়ীটা যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেজন্য বাড়ীটা এমনভাবে তৈরী হওয়া উচিত যাতে আগুন নেভানোর কাজেও সুবিধা হয়। আরো সুবিধা হয় যদি নিকটতম অগ্নি-নির্বাপক অফিসে (Fire Brigade) গ্রন্থাগার ভবনের পূর্ণ মানচিত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয় (যেটা বিদেশে সব বড় বড় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে), যে মানচিত্রে দেখানো থাকবে কোথায় মূল সংগ্রহের অবস্থান (stack), সিঁড়ি, ঢুকবার রাস্তা, জানালা, মূল্যবান দুর্লভ সংগ্রহ কোন দিকে রয়েছে, বেশী দাহ্য পদার্থ কি কি এবং কোথায় আছে, ক্যাটালগ এবং অন্যান্য নথি কোন দিকে ইত্যাদি ইত্যাদি। আগুনের সম্ভাবনা দিনরাত সব সময়ই থাকে অতএব যদি সঠিক মানচিত্র অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের হাতের কাছে না থাকে, তবে যখন গ্রন্থাগারে কাজ বন্ধ, কোন কর্মী কাছাকাছি নেই, সেসময় যদি আগুন লাগে তখন এসব খুঁজতে খুঁজতে মূল্যবান অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে।

যদিও সবসময়ই চেষ্টা করতে হবে যাতে সংগ্রহের ক্ষতি না হয়, কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই গ্রন্থাগার কর্মী বা পাঠকদের জীবনের বিনিময়ে নয়। সেজন্য হঠাৎ

আগুন লাগলে গ্রন্থাগার থেকে বেরুবার জন্য জরুরীঅবস্থাকালীন পথের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

গ্রন্থাগারকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করার সবচেয়ে বড় দরকার আগুনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য। আগেকার দিনের লম্বা একের উপর এক পুস্তক মঞ্চের (stack) ব্যবস্থা আগুন ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে। কিন্তু আলাদা আলাদা ভাগে সংগ্রহ রাখা হলে কোন একটা অঞ্চলে আগুন লাগলে সরাসরি তার প্রভাব অন্য অংশে পড়বে না—যদি বা পড়ে তাহলে সেখানে আগুন পৌঁছাতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে। একটা পুস্তক মঞ্চ (stack) থেকে তার উপরের মঞ্চ যদি অগ্নিনিরোধক মেঝে দিয়ে আলাদা করা থাকে তবে আগুন ছড়াতে অনেক বেশী সময় লাগবে। সিঁড়ি, পাইপ, লিফট্ (lift) ইত্যাদি ঢাকা অর্থাৎ আবৃত (enclosed) হলে ঐ পথে আগুন ছড়াতে সহজে পারবে না। কাজের জায়গা (work space), পুস্তক মঞ্চ (stack) থেকে আলাদা হওয়া দরকার, কারণ সাধারণত গ্রন্থাগারের অধিকাংশ আগুনের সূত্রপাত অসাবধনাতার জন্য কাজের জায়গা থেকেই হয়ে থাকে। অগ্নিপ্রতিরোধক ব্যবস্থা পুস্তক মঞ্চের (stack) জন্যই সবচেয়ে জোরালো রাখতে হবে।

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম এমন জায়গায় এবং এমন ভাবে রাখতে হবে, যাতে সেটা আগুনের আক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে না তোলে। গ্রন্থাগারের যদি নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র (generator) থাকে, তবে সেটা মূলভবনের বাইরে দূরে কোথাও রাখতে হবে, কারণ সেখানে দাহ্য পদার্থ (ডিজেল ইত্যাদির) মজুত থাকা সম্ভব। ইলেকট্রিক লাইনের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা অনেক অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা অংকুরেই বিনাশ করে দেয়। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এগুলো পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

বিদেশে স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনিরূপণ এবং অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা চালু আছে। যত ভালভাবে এবং সচেতনভাবে আগুনের ক্ষতি এড়াবার চেষ্টা করা হোক না কেন, তার সঙ্গে যদি ঐ দুটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হয় তবে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এই ব্যবস্থায় ঘরের তাপমাত্রার হঠাৎ কোন ঊর্ধ্বগতি, কোন আলোর ঝলকানি, ধোঁয়ার আবির্ভাব, অদৃশ্য কয়েক প্রকারের গ্যাস যেগুলো আগুনে পোড়া থেকে উৎপন্ন হয়—সেগুলো বিশেষ ধরনের নিরূপকের (sensor) মাধ্যমে আগুনের সূত্রপাতের সংবাদ সংকেতে

দিতে পারে। বিশেষ ব্যবস্থা মারফৎ এই সংকেত একই সাথে গ্রন্থাগারে এবং অগ্নিনির্বাপক প্রতিষ্ঠানে সূচিত হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রন্থাগারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিপদসূচক ঘণ্টা বাজতে সুরু করে, আক্রান্ত জায়গাটি নির্দেশ করে, আক্রান্ত অঞ্চলে বাতাসের অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ করে দেয় এবং ঐ অঞ্চলে পৌঁছাইবার জন্য সব লিফ্‌ট নীচে এসে অপেক্ষা করে।

স্বয়ংক্রিয় নির্বাপণ ব্যবস্থায়, প্রথমে আগুনকে সীমিত করে এবং তারপর নিবিয়ে দেয়। এই কাজে জল অথবা গ্যাসের ব্যবহার করা হয়। যদিও জল গ্রন্থাগার সংগ্রহের অপরিসীম ক্ষতি করতে পারে, তবু এটা এখন প্রমাণিত সত্য যে স্বয়ংক্রিয় জল ছিটানোর ব্যবস্থায়, বইয়ের খুব সীমিত ক্ষতি করেও যথেষ্ট কার্যকরীভাবে আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় শুধুমাত্র যেখানে প্রয়োজন সেখানেই জল ছিটানোর ব্যবস্থা চালু হয়। জল ভেজা বইয়ের সংরক্ষণের আধুনিকতম ব্যবস্থাগুলির ফলে জলের ব্যবহারের পথে অনেক বাধা দূর হয়েছে।

গ্যাসের সাহায্যে আগুন নেভাবার ব্যবস্থায় কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon Dioxide) অথবা হ্যালোন (Halon) (একধরণের হ্যালোজেনেটেড্‌ হাইড্রোকার্বন) ব্যবহৃত হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড সহজেই আগুন নেবাতে পারলেও মানুষের উপর এর বিরূপক্রিয়ার কথা মনে রেখে, এটি ব্যবহার না করাই ভাল। হ্যালোন গ্যাস উচ্চচাপে তরলীভূত অবস্থায় রাখা হয় (compressed gas)। এটি আগুন জ্বলবার অনুকূল পরিবেশ নষ্ট করে দেয়। এটি বই অথবা অন্যরকমের পাণ্ডুলিপির কোন ক্ষতি করে না, তাই এটা গ্রন্থাগারে ব্যবহারের পক্ষে খুবই উপযোগী। কিন্তু জল ব্যবহারের ব্যবস্থার তুলনায় এটি অনেক বেশী খরচ সাপেক্ষ। যান্ত্রিক গোলযোগ বা ভুল সঙ্কেতের জন্য এই গ্যাসনির্বাপণ ব্যবস্থা যদি একবার চালু হয়ে যায়, তবে ৩ লাখ টাকা খরচ হয়ে যাবে। সেকারণে স্বয়ংক্রিয় বিপদ জ্ঞাপক ব্যবস্থার সাথে এটিকে চালু করার ব্যবস্থা সরাসরি যুক্ত না করে আলাদা রাখা ভাল। অনেক ক্ষেত্রে দুটি আলাদা অগ্নিনিরূপক যন্ত্রের ব্যবহার করা হয় গ্রন্থাগারে, যাতে যান্ত্রিক গোলযোগের ফলে ভুল সঙ্কেত প্রচারিত না হয়—সে ক্ষেত্রে এই অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা তার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব। সব যান্ত্রিক ব্যবস্থাই চালু রাখার জন্য নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে সেটি পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনবোধে মেরামত করা দরকার, একথাটা মনে রেখে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

যান্ত্রিক ব্যবস্থা যতই ভাল এবং উপযোগী হোক না কেন আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারের পক্ষেই আর্থিক ও অন্যান্য কারণে তার প্রয়োগ সম্ভব নয়। আমাদের তাই নির্ভর করতে হবে সাবেকী ব্যবস্থায়, কিন্তু তার জন্যও প্রস্তুতির দরকার আছে। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (fire extinguisher), শুষ্ক এবং তরল দুরকমেই, এমনভাবে রাখতে হবে যাতে প্রয়োজনের সময় চট্‌ করে হাতের কাছে পাওয়া যায়। কয়েকটিকে চাকা লাগানো ট্রলিতে (ঠেলাতে) রাখা উচিত কারণ তাড়াতাড়ি ওগুলো ঠেলে দরকারমত জায়গাতে নিয়ে যাওয়া সুবিধাজনক। এছাড়াও কয়েকটি বালতি দেওয়ালের হুকে আটকে রাখা ভাল, তার মধ্যে কয়েকটিতে বালি এবং কয়েকটিতে জল রাখা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক তার অথবা যন্ত্রের আগুনে জল ব্যবহার করা চলে না, সেক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য বালি কাজে লাগে। নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে সমস্ত ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখা ছাড়াও বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলির ভিতরের রাসায়নিক পদার্থ পুনর্নবীকরণের ব্যবস্থার দিকেও নজর রাখা উচিত। লোহার বালতির সঙ্গে ছোট লোহার গাঁইতি, কোদাল এবং শক্ত কিছুটা দড়িও রাখা ভাল। কারণ দুর্যোগের সময় এগুলো কাজে লাগতে পারে।

ধূপন কি এবং কেন

কয়েক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ আছে যেগুলো সাধারণ তাপমাত্রায় অথবা খুব অল্প তাপ প্রয়োগেই বাষ্পীভূত হয় এবং ঐ বাষ্প ছত্রাক এবং কীটপতঙ্গের পক্ষে বিষাক্ত হওয়ায় এটির প্রয়োগে ঐ ধরণের শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে গ্রন্থাগার সংগ্রহকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিকে ধূপন বা ফিউমিগেশন (fumigation) বলা হয়। ধূপন প্রক্রিয়ায় যে সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে কয়েকটি সাধারণ তাপমাত্রায় তরল এবং অন্যগুলো কঠিন অবস্থায় থাকে। কিন্তু এদের সবগুলোরই দু'টি ব্যাপারে মিল আছে। সেগুলো হচ্ছে এই যে, খুব অল্প-তাপ প্রয়োগে (কোন কোন রাসায়নিকের ক্ষেত্রে তাপ প্রয়োগেরও দরকার হয় না) এগুলো বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং ঐ বাষ্প ছাত্রাক এবং কীটপতঙ্গের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক বিষাক্ত। যে সব গ্রন্থাগারে ছত্রাক এবং কীটপতঙ্গের আক্রমণে মাঝারি থেকে বেশী সংখ্যক সংগ্রহ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অথবা হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, সেক্ষেত্রে ধূপন অত্যন্ত ফলপ্রসূ পদ্ধতি।

আমাদের মত বর্ষাবহুল দেশের গ্রন্থাগারগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় যে সংগ্রহ অথবা সংগ্রহাংশ ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বা হবার উপক্রম হয়েছে। ছত্রাকের আক্রমণের লক্ষণ থেকেই বোঝা যায় যে গ্রন্থাগারের মধ্যে সংরক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ নেই—আবহাওয়া অত্যধিক সেঁতসেঁতে অর্থাৎ আপেক্ষিক আদ্রর্তা নির্ধারিত ন্যূনতম মাত্রার তুলনায় বেশী, আলো বাতাস চলাচল যথাযথ নয়। এর প্রতিকার করা যেতে পারে বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে। কিন্তু ইতিপূর্বেই যে আক্রমণ সুরু হয়েছে, তার প্রতিকারের জন্য ধূপন প্রক্রিয়ার প্রয়োগের প্রয়োজন, কারণ সংগ্রহের মধ্যে উপস্থিত ছত্রাক এবং কীট পতঙ্গকে উৎখাতের ব্যাপারে এই পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর।

ধূপন পদ্ধতিকে আমরা মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি—একটি সাধারণ ধূপন, অন্যটি বায়ুহীন প্রকোষ্ঠে ধূপন (vacuum fumigation)।

বায়ুহীন প্রকোষ্ঠে ধূপনের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ভাবে ছত্রাক এবং কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব। কিন্তু এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এর জন্য যে যন্ত্রপাতির দরকার সেগুলো অত্যন্ত মূল্যবান হওয়ায় আমাদের মত দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলির আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে। বছর বারো তেরো আগেও এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দাম এক লাখ টাকার কাছাকাছি ছিল। অবশ্য তার পর কয়েকটি ছোট অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্র বাজারে বের হয়েছে, যেগুলোর দাম মোটামুটি ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকার মধ্যে। বায়ুহীন প্রকোষ্ঠে ধূপনের জন্য কয়েকটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা যায় যেমন ইথোক্সাইড গ্যাস। সব ধরণের ধূপন পদ্ধতির মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহার এবং জনপ্রিয়তার দিক থেকে প্রথমেই যেটার নাম করতে হয় সেটা হচ্ছে থাইমল ধূপন (Thymol)। বিভিন্ন ধূপন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার আগে ধূপনের জন্য সাধারণত কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে করা যেতে পারে সেটা জানা দরকার। সেগুলো হচ্ছে—

(১) ইথিলিন অক্সাইড (১ ভাগ) এবং কার্বণ ডাই-অক্সাইড (৯ ভাগ) এর মিশ্রণ (বায়ুহীন প্রকোষ্ঠে ধূপনে ব্যবহৃত)

(২) থাইমল

(৩) ফরম্যালডিহাইড

(৪) প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন

(৫) কার্বনটেট্রাক্লোরাইড (১ ভাগ) এবং ইথিলিন-ডাই-ক্লোরাইড (৩ ভাগ) এর মিশ্রণ

অথবা কার্বনটেট্রাক্লোরাইড (৮ ভাগ) এবং কার্বণ ডাইসালফেট (২০ ভাগ) এর মিশ্রণ

(৬) মিথাইল ব্রোমাইড

(৭) কার্বন ডাইসালফাইড

(৮) হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড গ্যাস

ভ্যাকুয়াম ফিউমিগেশন বা বায়ুহীন প্রকোষ্ঠে ধূপন

সবচেয়ে কার্যকরী ধূপন পদ্ধতি হিসাবে এটি স্বীকৃত। এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরণের ষ্টীলের তৈরী ধূপন প্রকোষ্ঠের। সাধারণত এর আয়তন মোটা-মুটি ১০ কিউবিক মিটার (অর্থাৎ ৩৫৩'২ কিউবিক ফিট) হয়ে থাকে। এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে হয় বইয়ের ট্রলিতে অথবা তাকে বই বা অন্যান্য সংগ্রহ, যেগুলোর ধূপন প্রয়োজন, রাখা হয়। এবার প্রকোষ্ঠের দরজা ভালকরে বন্ধ করে দেবার পর ভেতরের সব বাতাস বের করে দিতে হবে। সব বাতাস বেরিয়ে যাবার পর ৪—৫ কেজি পরিমান ইথোক্সাইড গ্যাস বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। ওজনে ১ ভাগ ইথিলিন অক্সাইডএর সঙ্গে ৯ ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড মিশিয়ে ইথোক্সাইড গ্যাস তৈরী হয়। এই গ্যাস খুব অল্প সময়ের মধ্যে ছত্রাক এবং কীটপতঙ্গ নিশ্চিতভাবে ধ্বংস করে। এই গ্যাস সহজেই বইয়ের সব অংশেব মধ্যে ঢুকে যায়, এমন কি খুব শক্ত করে ঠেসে বাধা কাগজের গাদার মধ্যেও অবলীলাক্রমে ঢুকে কাজ করে। এর আরেকটি সুবিধা হচ্ছে এই যে এটি শুধুমাত্র পূর্ণাঙ্গ কীট পতঙ্গবেই ধ্বংস করে না, এর প্রতিক্রিয়ার ফলে কীট পতঙ্গের ডিমও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। এই ধরণের সুবিধা অন্য অনেক ধূপন পদ্ধতিতেই পাওয়া যায় না। ব্যবহৃত ইথোক্সাইড গ্যাস গ্রন্থাগার সংগ্রহের উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে মোটামুটি তিন ঘন্টার মত। গ্যাস তিন ঘন্টা প্রকোষ্ঠের থাকার পর পাম্প করে সেটা বের করে নেওয়ার পর কক্ষে বাতাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ধূপিত সংগ্রহ কক্ষ থেকে বের করে নেওয়া হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে এই ধূপন পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল এর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষধরণের প্রকোষ্ঠসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতির উচ্চমূল্য, যেটি সাধারণ গ্রন্থাগারের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে। বিদেশেও উচ্চমূল্যের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার মিলিতভাবে সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে। এই ধূপন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত গ্যাস সম্পূর্ণ অদাহ্য এবং মানুষের পক্ষে এর কোন বিষাক্ত বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই।

থাইমল ধূপন

ব্যবহারের ব্যাপকতা এবং জনপ্রিয়তার দিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধূপন প্রক্রিয়া এইটিই। থাইমল একধরণের গন্ধযুক্ত সাদা কেলাস। এটি অদাহ্য এবং অতি অল্প তাপ প্রয়োগেই বাষ্পীভূত হয়ে যায়। এটি সংরক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট কার্যকর অথচ ব্যবহার করাও সহজ।

এই ধূপন প্রক্রিয়ায় একটি ধূপন প্রকোষ্ঠের প্রয়োজন। সাধারণভাবে এটি ১৮০ × ৭৫ × ১৩৫ সেমি (৬' × ২½' × ৪½' ফুট) আকারের একটি কাঠের আলমারী। আলমারীর ভিতরটা বার্নিশ বা রং করা হলে চলবে না। আলমারীর দরজা রবারের গ্যাসকেট লাগিয়ে এমন ভাবে তৈরী করা হয়, যাতে সেটি বন্ধ করার পর কক্ষটি সম্পূর্ণ বায়ুনিরোধক হয়ে ওঠে। কক্ষের মধ্যে নীচের দিক থেকে ১৫ সেমি (৬") ওপরে জালের তৈরী তাক লাগানো

থাইমল ধূপন প্রকোষ্ঠ
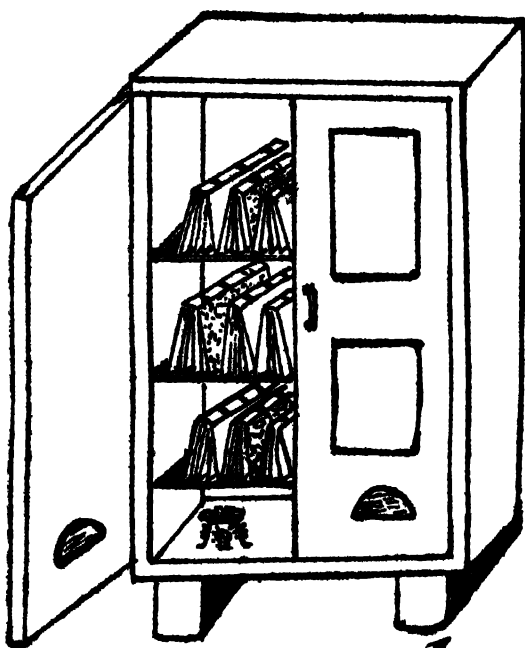
থাকে যেটি প্রয়োজনে অপসারণযোগ্য। প্রথম তাকের ওপর প্রায় ৪৫ সেমি (১৮") ব্যবধানে আরো দুটো একই ধরণের তাক লাগানো থাকে। নীচের তাকের নীচের ১৫ সেমি ফাঁকা জায়গাতে ৪০ ওয়াটের বালব লাগানোর ব্যবস্থা থাকে যার উপরে খোলা পোর্সেলিন/কাচের পাত্রে থাইমল কেলাস রাখা হয়।

জালের তাকের উপর ধূপনের জন্যে বইগুলি খুলে উল্টো 'V'র মত করে রাখতে হবে, যাতে বইয়ের সেলাইয়ের দিকটা উপরের দিকে থাকে। প্রকোষ্ঠটি বায়ুনিরোধক হওয়ায় বৈদ্যুতিক আলো জেবলে দেবার পর থাইমল তাপে বাষ্পীভূত হয়ে ভিতরের বাতাসে মিশে যায় এবং সংগ্রহের ভেতরে উপস্থিত ছত্রাক এবং কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে। প্রতি কিউবিক মিটারের প্রয়োগের জন্য ১২০ গ্রাম থাইমলই যথেষ্ট। থাইমলকে বাষ্পীভূত করার জন্য সারাদিনে ১ ঘন্টা বৈদ্যুতিক আলোটি জ্বালিয়ে রাখা দরকার। কখনও কখনও ভাল ফল পাবার জন্যে সকালে ৪৫ মিনিট আর বিকালে ৪৫ মিনিট বালবটি জ্বালানো হয়। পাত্রে যথেষ্ট থাইমল রাখা ছাড়াও দরকার মত ধূপন চলাকালীন পাত্রে থাইমল সরবরাহ করতে হবে। এই অবস্থায় সংগ্রহ ক'দিন ধূপিত করা হবে সেটা নির্ভর করে আক্রান্ত বস্তুর অবস্থা এবং আক্রমণের ব্যাপকতার উপর। যেহেতু থাইমল বাষ্প অত্যন্ত আস্তে আস্তে কাজ করে, সেজন্য এই ধূপনে সাধারণত ৮ থেকে ১০ দিন সময় লাগে। ধূপন শেষ হয়ে যাবার পর সংগ্রহগুলি নরম কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে মুছে পরিষ্কার করতে হবে, যাতে সংগ্রহের কোন ক্ষতি না হয়। আরেকটি ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা দরকার, সেটা হচ্ছে পরিষ্কার করার সময় ছত্রাকের বীজ (spore) যেন না ছড়িয়ে পড়ে। কারণ তাহলে অন্যান্য বইপত্রেও আক্রমণ নতুন করে সুরু হতে পারে, যেহেতু থাইমল ধূপনে ঐ বীজের কোন ক্ষতি হয় না।

থাইমল বাষ্প মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, কিন্তু এটি ব্যবহারে কয়েকটি সাবধানতা অবলম্বন দরকার। থাইমল বাষ্প কয়েকধরণের কালি, তেলরঙে আঁকা ছবি অথবা অন্যান্য কয়েকটি জিনিষ যাতে কয়েকটি বিশেষ ধরণের বার্ণিশ ব্যবহার করা থাকে সেগুলোর ক্ষতিসাধন করতে পারে। সেজন্য ঐ ধরণের জিনিষ ধূপনে থাইমল ব্যবহার করা উচিত নয়। তালপাতার পুঁথি ধূপনের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা চলে না।

থাইমল বাষ্প ছত্রাকের বীজের অথবা কীট-পতঙ্গের ডিমের কোন ক্ষতি করে না। পরিবেশ থেকে নতুন আক্রমণের সব সম্ভাবনা দূরে করা হলেও ধূপনের পরে কিছুদিনের মধ্যে ঐ সব সংগ্রহে থেকে যাওয়া বীজ/ডিম থেকে নূতন আক্রমণের সূত্রপাত ঘটতে পারে। সেজন্য বলা চলে যে থাইমল ধূপনের ব্যবস্থায় কিছুদিন অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে অথবা প্রথমবার করার ২/৩ মাস পরে আবার ধূপন করা উচিত। সহজে বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়ায় ধূপিত বস্তুতে এর রেশ

থাকে না, ফলে কোন স্থায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই ধূপন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভব নয়।

যদিও থাইমল ধূপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকোষ্ঠের কথা বলা হয়েছে, তবু দরকার মত সাধারণ আলমারী বা বাক্সকেও প্রয়োজন অনুসারে কিছুটা রদবদল করে ব্যবহার উপযোগী করে নেওয়া সম্ভব। অত্যন্ত কার্যকর ধূপন ব্যবস্থা হলেও এটির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সাধারণ ছোট গ্রন্থাগারের আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে এবং সেগুলো অল্প আয়াসেই জোগাড় করা সম্ভব এবং পদ্ধতিটির ব্যবহার অত্যন্ত সহজ।

ফরম্যালডিহাইড ধূপন

নানাধরণের ধূপন পদ্ধতির মধ্যে বহুল ব্যবহারের দিক থেকে থাইমল ধূপনের পরই এটির স্থান। এই ধূপনে যে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার করা হয় সেটি হচ্ছে ফরম্যালডিহাইড (Formaldehyde)। ফরম্যালডিহাইড অত্যন্ত হাল্কা বাদামী রংএর মিষ্টিগন্ধযুক্ত তরল পদার্থ।

ফরম্যালডিহাইড ধূপনের জন্য একটি ধূপন প্রকোষ্ঠের প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে প্রকোষ্ঠটি ১৮০×৭৫×১৩৫ সেমি (৬′×২½′×৪½′ ফুট) আকারের কাঠের বাক্স বা আলমারী যার ডালা বা দরজা রবারের গ্যাসকেট অথবা ফেল্টএর মাধ্যমে বায়ুনিরোধক করে নেওয়া হয়। আলমারীর নীচের দিক থেকে ১৫ সেমি (৬″) ওপরে জালের তৈরী তাক লাগানো থাকে যেটি প্রয়োজন অনুসারে অপসারণযোগ্য। প্রথম তাকের উপর ৪৫ সেমি (১½′) ব্যবধানে আরো দুটো একই ধরণের তাক লাগানো থাকে। নীচের তাকের নীচে ১৫ সেমি ফাঁকা অংশে কাচ বা পোরসেলিনের পাত্রে ৪০% ফরম্যালডিহাইড (২০ আউন্স জলে ২ আউন্স ফরম্যালডিহাইডের মিশ্রণ) রাখার ব্যবস্থা থাকে। প্রকোষ্ঠের নীচে থেকে ঐ পাত্র গরম করার জন্য স্পিরিট ল্যাম্প বা ঐ ধরণের কোন ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য কয়েকক্ষেত্রে প্রকোষ্ঠের মধ্যে ফরম্যালডিহাইড না রেখে সেটি পাশে একটি পাত্রে রাখা হয় এবং গরম করে বাষ্পায়িত গ্যাস ধূপন প্রকোষ্ঠে চালিত করা হয়। বৈদ্যুতিক উপায়ে বা অন্য কোন উপযুক্ত উপায়ে আলমারীর মধ্যের তাপমাত্রা মোটামুটি ৩০° সেঃ স্থিতিশীল করা হয়। এক্ষেত্রেও তাকের উপর বই সাজিয়ে রাখা হয় এমনভাবে যাতে সহজেই ভেতরে বাষ্পীভূত গ্যাস ঢুকতে পারে (বইগুলো থাইমল প্রকোষ্ঠের

মতই উল্টো 'V'র অবস্থায় অথবা খোলা অবস্থায় রাখা হয়)। এইভাবে ধূপনের জন্য এক থেকে দু'দিনই যথেষ্ট। কতক্ষণ ধরে ধূপন চালানো হবে সেটা নির্ভর করবে ধূপিত বস্তুর অবস্থা এবং আক্রমণ কতটা সাংঘাতিক হয়েছিল তার উপর।

ফরম্যালডিহাইড ধূপন প্রকোষ্ঠে রাসায়নিক গরম করার ব্যবস্থা
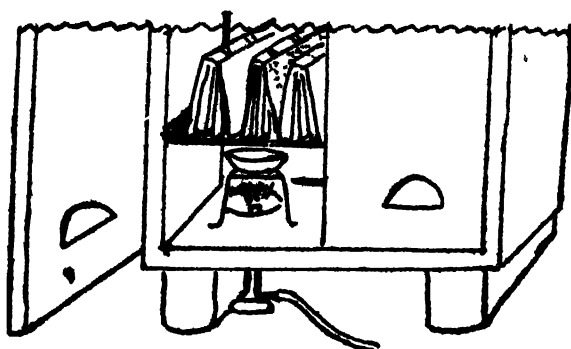
ফরম্যালডিহাইড ধূপন ছত্রাক, কীটপতঙ্গে আক্রান্ত বইপত্রের পক্ষে খুবই উপকারী—কিন্তু এর অসুবিধা হল এই যে এটি বইয়ের বাঁধাইয়ে ব্যবহৃত কয়েকধরণের আঠা এবং চামড়ার উপর ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—কোন কোন কালির পিগমেণ্টও এতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। চামড়া, ভেলাম, পার্চ-মেণ্টের জিনিষ এইভাবে ধূপিত করা উচিত নয়, কারণ এই রাসায়নিক পদার্থ ঐগুলির পক্ষে ক্ষতিকারক। এই ধূপন প্রক্রিয়ায় ছত্রাকের বীজের এবং কীটপতঙ্গের ডিমের কোন ক্ষতি হয় না। ফলে প্রথমবার করার কিছুদিন (তিন মাস) পরে এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করা দরকার।

কার্বন ডাইসালফাইড ধূপন

এই ধূপনে যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় সেটি কার্বন ডাই-সালফাইড (Carbon Disulphide)। এটি কার্বনবাইসালফাইড নামেও পরিচিত। এটি একটি বিশ্রী গন্ধযুক্ত বর্ণহীন তরল পদার্থ, যেটি বাতাসের সংস্পর্শে এলেই বাষ্পীভূত হয়ে যায়। এই গ্যাস অত্যন্ত দাহ্য, জ্বলন্ত সিগারেট বা অন্য কোন জ্বলন্ত জিনিষের সংস্পর্শে সহজে জ্বলে উঠে।

[illegible] ধূপনের জন্যও একটি ধূপন প্রকোষ্ঠের প্রয়োজন, যেটি থাইমল ধূপন প্রকোষ্ঠের অনুরূপ হলেই চলে অর্থাৎ ১৮০ × ৭৫ × ১৩৫ সেমি (৬'×২½'×৪½' ফুট) আকারের একটি কাঠের বাক্স বা আলমারী যার ডালা বা দরজা রবারের গ্যাসকেট্ লাগিয়ে সম্পূর্ণ বায়ুনিরোধক করে নেওয়া হয়। প্রকোষ্ঠের নীচের দিক থেকে ১৫ সেমি (৬") উপরে জালের তৈরী প্রয়োজনে অপসারণযোগ্য তাক লাগানো থাকে। নির্দিষ্ট ব্যবধানে তিন অথবা ততোধিক জালের তাক লাগানো থাকে। নীচের দিক থেকে প্রথম তাকের নীচে তিনটি কাচের অথবা পোর্সেলিনের বাটিতে প্রতিটিতে ২ আউন্স পরিমাণ কার্বন ডাই-সালফাইড রাখা হয়। বাটিগুলো একটি কাল্পনিক ত্রিভূজের তিন কোণে

কার্বন ডাই-সালফাইড ভর্তি পোর্সেলিন
পাত্রের অবস্থান
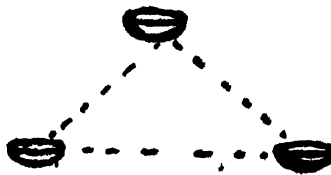
অবস্থান করে। আক্রান্ত বইপত্র তাকের উপরে খুলে অথবা উল্টো 'V'র মত অবস্থায় রাখা হয়, তারপর প্রকোষ্ঠটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এইভাবে সাতদিন রাখার পর প্রকোষ্ঠটি খুলে বাটিগুলোতে আবার ২ আউন্স করে কার্বন ডাইসালফাইড ঢেলে আবার প্রকোষ্ঠটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এভাবে আরো সাতদিন রাখা হয়। মোট দু'সপ্তাহ পরে ধূপন সম্পূর্ণ হয়ে যায়, ফলে ছত্রাক এবং পূর্ণাঙ্গ কীটপতঙ্গ ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু ডিম এবং ছত্রাকের বীজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না—সেজন্য কিছুদিন পর আরেকবার ধূপনের পুনরাবৃত্তির দরকার হবে। এভাবে ধূপনে সুবিধা হচ্ছে যে এই গ্যাস সহজেই বইয়ের মধ্যে ঢুকে কাজ করে। কিন্তু এর সহজ দাহ্যতা এর ব্যবহারের পক্ষে প্রধান অন্তরায়।

প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন ধূপন

প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন (Paradichlorobenzene) একধরণের সাদা কেলাসিত পদার্থ। ইথারের গন্ধযুক্ত এই পদার্থ সাধারণ আবহাওয়ায় খুব আস্তে আস্তে বাষ্পায়িত হয়ে অদাহ্য গ্যাসে পরিবর্তিত হয়।

সাধারণ ধূপন প্রকোষ্ঠই, যাতে থাইমল বা কার্বন-ডাই সালফাইড ধূপন করা হয়, এর জন্য ব্যবহার করা চলে। কাঁচের বাটিতে প্রকোষ্ঠের নীচের তাকে রাসায়নিক পদার্থ রেখে দেওয়া হয়। তাকের উপর আক্রান্ত বই খোলা অবস্থায় সাজিয়ে প্রকোষ্ঠ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতি ১ কিউবিক মিটার বাতাসের জন্য ১ কেজি প্যারাডাইক্লোরোবেনজিনই যথেষ্ট। এটি পূর্ণাঙ্গ কীট-পতঙ্গ এবং তার লার্ভাকে মেরে ফেললেও ডিমের কোন ক্ষতি করে না। এই ধূপনে মোট সময় লাগে ৭ থেকে ১০ দিন। ভাল ফল পাবার জন্য, অর্থাৎ ডিম থেকে পুনরাক্রমণ বন্ধ করার জন্য কিছুদিনের ব্যবধানে আরেকবার ধূপনের দরকার হবে। ছত্রাক এবং কীটপতঙ্গে আক্রান্ত তালপাতার পুঁথি/পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে ঐ পদ্ধতি বিশেষ সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা চলে। (৯১ পৃঃ)

কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এবং ইথিলিন ডাইক্লোরাইড ধূপন

কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (Carbon Tetrachloride) একটি বর্ণহীন তরল পদার্থ। এটি আস্তে আস্তে বাষ্পীভূত হয়ে ক্লোরফর্মের গন্ধযুক্ত অদাহ্য গ্যাসে পরিণত হয়। এটি অত্যন্ত ধীরে কাজ করে এবং কীটপতঙ্গের উপর এর প্রতিক্রিয়া কিছুটা মৃদু ধরণের হওয়ায় এককভাবে ধূপনে এর ব্যবহার হয় না। ইথিলিন ডাইক্লোরাইড (Ethylene Dichloride) একটি অত্যন্ত দাহ্য মিষ্টি-গন্ধযুক্ত ভারী তরল পদার্থ। ১ ভাগ কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ও ৩ ভাগ ইথিলিন ডাইক্লোরাইডের মিশ্রণ ধূপনের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। সাধারণ ঘরের তাপমাত্রায় এই মিশ্রণ বাতাসের সংস্পর্শে বাষ্পীভূত হয়, ফলে ধূপনের কাজ সহজতর হয়ে পড়ে। এটি অপেক্ষাকৃত দ্রুত কাজ করে এবং তুলনামূলকভাবে কম দাহ্য। ১ কিউবিক মিটার বাতাসের পক্ষে ½ লিটার মিশ্রণই যথেষ্ট। এইভাবে ধূপনে একদিন অথবা ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। ভাল ফল পাবার জন্য প্রকোষ্ঠের মধ্যের তাপমাত্রা ২৫° থেকে ৩০° সেঃ এর মধ্যে রাখতে

হবে। ধূপনের সময় মিশ্রণের ব্যবহারে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বনের দরকার।

৮ ভাগ কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের সাথে ২০ ভাগ কার্বন ডাইসালফেটের (যেটি যথেষ্ট দাহ্য) মিশ্রণে তৈরী তরল রাসায়নিক যেটি বাতাসের সংস্পর্শে সহজেই বাষ্পীভূত হয়, ধূপনের জন্য যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা চলে। এই ক্ষেত্রেও থাইমল ধূপনে ব্যবহৃত আলমারী অথবা বাক্সই ব্যবহার করা চলে। এই দুই পদ্ধতিতেই ছত্রাক এবং পূর্ণাঙ্গ অথবা লার্ভা অবস্থার কীটপতঙ্গ ধ্বংস হলেও ডিম বা ছত্রাকের বীজের কোন ক্ষতি না হওয়ায় দু'/তিন মাস পর এই ধূপনের পুনরাবৃত্তি করা দরকার।

মিথাইল ব্রোমাইড ধূপন

মিথাইল ব্রোমাইড বর্ণহীন এবং প্রায় গন্ধহীন অদাহ্য গ্যাস। এটিকে উচ্চচাপে সিলিন্ডারের মধ্যে তরল অবস্থায় রাখা হয়। গ্যাসীয় অবস্থায় এটি সহজেই বইপত্তরের ভেতরে ঢুকতে পারে। ধূপনের জন্য থাইমল ধূপনে ব্যবহৃত আলমারী বা প্রকোষ্ঠেরই ব্যবহার করা চলে। এইভাবে ধূপনে প্রায় ১২—১৬ ঘণ্টা সময় লাগে। কয়েকধরণের কীটপতঙ্গের উপর এর বিষক্রিয়া অপেক্ষাকৃত শ্লথ, অতএব ক্ষেত্রবিশেষে ২৪—২৮ ঘণ্টা ধূপনের দরকার হতে পারে। এই ধূপনের ব্যাপারে কিছুটা সাবধানতার প্রয়োজন, কারণ এটি মানুষের পক্ষেও ক্ষতিকারক। এটি কীটপতঙ্গের ডিমের এবং ছত্রাকের বীজের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারায়, দুই/তিন মাস পরে আরেকবার ধূপনের দরকার হয় না।

হাইড্রোজেন সায়ানাইড ধূপন

সাধারণ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন সায়ানাইড বর্ণহীন অত্যন্ত দাহ্য এবং হাল্কা (বাতাসের তুলনায়) গ্যাস, যেটি সহজেই বাতাসের সাথে মিশে যায়। এটিকে উচ্চচাপে সিলিন্ডারে তরল অবস্থায় রাখা হয়। গ্যাসীয় অবস্থায় এটি খুব সহজে বইপত্রের মধ্যে ঢুকে অত্যন্ত শক্তিশালী ধূপকের কাজ করে। এই ধূপনের জন্য থাইমল বা কার্বন ডাইসালফাইড ধূপনের বায়ুনিরোধক প্রকোষ্ঠ ব্যবহার করা চলে। কিন্তু এটি ব্যবহার করার সময় যথেষ্ট সাবধানতা

অবলম্বনের দরকার হয় কারণ অত্যন্ত দাহ্য ছাড়াও এটি অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস, যেটি মানুষ এবং পশুপাখির পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকারক।

এখানে ধূপন কিভাবে কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ধূপনের গ্যাস কীটপতঙ্গের শ্বাসনালী অথবা ত্বকের মধ্য দিয়ে ঢুকে শ্বাসপ্রক্রিয়া, স্নায়ুতন্ত্র অথবা দেহের কোষে অবস্থিত প্রটোপ্লাজমে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে, যার ফলে এগুলো মারা যায়। কয়েক-ধরণের কীটপতঙ্গ বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে এলে তাদের শ্বাসনালী সঙ্কোচনের মাধ্যমে বিষাক্ত গ্যাসের দেহে অনুপ্রবেশ বিলম্বিত করতে পারে—এসব ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় ধরে ধূপনের প্রয়োজন হয়।

এখানে যে আট ধরণের ধূপণের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সেগুলোর তুলনা-মূলক সারণী পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে দেওয়া হ'ল, অর্থাৎ ভ্যাকুয়াম / বায়ুহীন প্রকোষ্ঠে ধূপন, থাইমল ধূপন, ফরম্যালডিহাইড ধূপন এবং কার্বন ডাইসালফাইড ধূপনের তুলনা ১৬০—১৬৩ পৃষ্ঠায় এবং প্যারাডাইক্লোরো-বেনজিন ধূপন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এবং ইথিলিন ডাইক্লোরাইড মিশ্রণে ধূপন, মিথাইল ব্রোমাইড ধূপন এবং হাইড্রোজেন সায়ানাইড ধূপনের তুলনা ১৬৪—১৬৭ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত হ'ল।

বিভিন্ন ধূপন পদ্ধতি

	১	২
নাম	ভ্যাকুয়াম বা বায়ুহীন প্রকোষ্ঠে ধূপন	থাইমল ধূপন
প্রকোষ্ঠ	(১) ষ্টীলের তৈরী সম্পূর্ণ বায়ুনিরোধক প্রকোষ্ঠ, যেটিকে বায়ুশূন্য করা সম্ভব, (২) প্রকোষ্ঠ বায়ুহীন করার জন্য বৈদ্যুতিক পাম্প সংযুক্ত থাকে	(১) কাঠের তৈরী বায়ুরোধক প্রকোষ্ঠ (২) 40 ওয়াটের বৈদ্যুতিক বালব লাগাবার ব্যবস্থাযুক্ত
ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ	ইথিলিন অক্সাইড (১ ভাগ) এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড (৯ ভাগ) এর মিশ্রণ	থাইমল
গন্ধ	গন্ধহীন	মৃদু সুগন্ধ যুক্ত
তাপ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা	তাপ প্রয়োগের দরকার হয় না	তাপ প্রয়োগের দরকার হয়
বই রাখার ব্যবস্থা	ট্রলিতে বা তাকে বই বন্ধ অবস্থায় রাখা হয়	তাকের ওপর বইগুলো উল্টো 'V'র মত করে রাখতে হয়

[পরবর্তী অংশ ১৬২ পৃষ্ঠায়]

সম্বন্ধে তুলনামূলক ধারণা

৩	৪
ফরম্যালডিহাইড ধূপন	কার্বন ডাইসালফাইড ধূপন
(১) কাঠের তৈরী বায়ু-নিরোধক (২) পোর্সেলিন বা কাচের পাত্রে রাখা রাসায়নিক পদার্থ গরম করার জন্য স্পিরিট ল্যাম্প বা অন্য ব্যবস্থা থাকে	(১) কাঠের তৈরী বায়ু-নিরোধক (২) পোর্সেলিনের বা কাচের পাত্রে রাখা তরল রাসায়নিক পদার্থ ঘরের তাপমাত্রাতেই বাষ্পীভূত হয়
ফরম্যালডিহাইড	কার্বন ডাইসালফাইড
মাদকজাতীয় গন্ধযুক্ত তাপপ্রয়োগের দরকার হয়	দুর্গন্ধযুক্ত তাপপ্রয়োগের দরকার হয় না
তাকের উপর বইগুলো উল্টো 'V' মত করে খুলে রাখতে হয়	তাকের উপর বইগুলো উল্টো 'V'র মত করে খুলে রাখতে হয়

[পরবর্তী অংশ ১৬৩ পৃষ্ঠায়]

বিভিন্ন ধূপন পদ্ধতি

[১৬০ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ]

	১	২
ধূপনের ফলাফল	ছত্রাক এবং তার বীজ, কীটপতঙ্গ (লার্ভা, পূর্ণাঙ্গ এবং ডিম সবই) ধ্বংস করে	ছত্রাক, কীটপতঙ্গ (পূর্ণাঙ্গ ও লার্ভা) ধ্বংস করে। ডিম বা ছত্রাকের বীজের কোন ক্ষতি হয় না
সময়	৩ ঘণ্টা	৮—১০ দিন
ব্যবহৃত রসায়নিকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া	(১) গ্যাস অদাহ্য (২) সংগ্রহের কোন ক্ষতি করে না। (৩) মানুষের পক্ষে সাধারণ-ভাবে ক্ষতিকারক নয়	(১) গ্যাস অদাহ্য (২) কয়েক ধরণের কালি, তেল রঙে আঁকা ছবি, তাল-পাতার পাণ্ডুলিপির পক্ষে ক্ষতিকারক (৩) মানুষের পক্ষে ক্ষতি-কারক নয়
মন্তব্য	অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ, মূলতঃ বিশেষ প্রকোষ্ঠের এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জামের জন্য	আপেক্ষাকৃত কম খরচ সাপেক্ষ
ব্যবহারের ব্যাপকতা এবং পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা	একবার ধূপণের ফলে সম্পূর্ণভাবে সব ছত্রাক, কীটপতঙ্গ ধ্বংস হওয়ায় পুনরাবৃত্তির দরকার হয় না।	তিন মাস পরে আবার ধূপনে দরকার যাতে ডিম ফুটে বেরুনো লার্ভা ধ্বংস করা চলে। সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত ধূপন পদ্ধতি।

[illegible] তুলনামূলক সারণী

[১৬১ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ]

৩	৪
ছত্রাক, কীটপতঙ্গ (পূর্ণাঙ্গ ও লার্ভা) ধ্বংস করে। কিন্তু ডিমের কোন ক্ষতি করে না	ছত্রাক, কীটপতঙ্গ (পূর্ণাঙ্গ ও লার্ভা) ধ্বংস করে। কিন্তু ডিমের কোন ক্ষতি হয় না
১—২ দিন	১৪ দিন
(১) অদাহ্য (২) বাঁধাইয়ের আঠা, কোন কোন কালির পিগমেণ্ট, চামড়া, ভেলাম, পার্চমেণ্টের ক্ষতি করে। (৩) মানুষের পক্ষে ক্ষতি-কারক	(১) দাহ্য (২) সাধারণ অবস্থায় গ্রন্থাগার সংগ্রহের তেমন কোন ক্ষতিসাধন করে না। (৩) মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক
থাইমল অথবা কার্বন-ডাই সালফাইড ধূপনের চেয়েও কম খরচ সাপেক্ষ	অপেক্ষাকৃত কম খরচ সাপেক্ষ
দুই মাস পরে ডিম ফুটে বেরুনো লার্ভা ধ্বংসের জন্য ধূপনের দরকার। সর্বচেয়ে সস্তা ধূপন পদ্ধতি।	দুই মাস পরে আবার ধূপনের দরকার—ডিম থেকে বেরুনো নতুন লার্ভা ধ্বংস করার জন্য। দাহ্যতার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করলে বিপজ্জনক।

বিভিন্ন ধূপন পদ্ধতি

	৫	৬
নাম	প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন ধূপন	কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ও ইথিলিন ডাইক্লোরাইড ধূপন
প্রকোষ্ঠ	(১) কাঠের তৈরী বায়ু-নিরোধক প্রকোষ্ঠ (২) কাচের/পোরসেলিনের পাত্রে রাখা সাদা কেলাসিত রাসায়নিক পদার্থটি সাধারণ ঘরের তাপমাত্রায় বাষ্পায়িত হয়	(১) কাঠের তৈরী বায়ু-নিরোধক (২) পাত্রে রাখা রাসায়নিক পদার্থ সাধারণ তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়; ভেতরের তাপমাত্রা ২৫°—৩০° সেঃ রাখার জন্য বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা থাকে
ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ	প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন	কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (১ ভাগ), ইথিলিন ডাইক্লোরাইড (৩ ভাগ) এর মিশ্রণ
গন্ধ	ইথারের গন্ধযুক্ত	মৃদু সুগন্ধযুক্ত
তাপপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা	তাপপ্রয়োগের দরকার হয় না	ভাল ফললাভের জন্য প্রকোষ্ঠের মধ্যে ২৫°—৩০° সেঃ-তাপমাত্রা সুনিশ্চিত করার জন্য তাপনিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা থাকে।
বই রাখার ব্যবস্থা	তাকের উপর বইগুলো উল্টো 'V'র মত করে রাখতে হয়	তাকের উপর বইগুলো উল্টো 'V'র মত করে রাখা হয়

[পরবর্তী অংশ ১৬৬ পৃষ্ঠায়]

সংক্ষেপে তুলনামূলক সারণী

৭	৮
মিথিলিন ব্রোমাইড ধূপন	হাইড্রোজেন সায়ানাইড ধূপন
(১) কাঠের তৈরী বায়ু-নিরোধক প্রকোষ্ঠ	(১) কাঠের তৈরী বায়ু-নিরোধক প্রকোষ্ঠ
(২) সাধারণ তাপমাত্রায় ব্যবহৃত রাসায়নিকটি গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে	(২) সাধারণ তাপমাত্রায় রাসায়নিকটি গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে
মিথিলিন ব্রোমাইড	হাইড্রোজেন সায়ানাইড
নিজস্ব কোন গন্ধ নেই কিন্তু এর উপস্থিতি বোঝার জন্য এতে তীব্র গন্ধযুক্ত অন্য কোন রসায়ন মেশানো হয়ে থাকে	মৃদু সুগন্ধযুক্ত
তাপ প্রয়োগের দরকার হয় না	তাপ প্রয়োগের দরকার হয় না
তাকের উপর বইগুলো উল্টো 'V'র মত করে রাখলে ভাল হয়	তাকের উপর বইগুলো উল্টো 'V'র মত করে রাখা দরকার

[পরবর্তী অংশ ১৬৭ পৃষ্ঠায়]

বিভিন্ন ধূপন পদ্ধতি

[১৬৪ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ]

	৫	৬
ধূপনের ফলাফল	ছত্রাক, কীটপতঙ্গ (পূর্ণাঙ্গ, লার্ভা) ধ্বংস করে ডিমের কোন ক্ষতি হয় না	ছত্রাক, কীটপতঙ্গের পূর্ণাঙ্গ ও লার্ভা ধ্বংস হলেও ডিমের কোন ক্ষতি হয় না
সময়	৭—১০ দিন	১ দিন
ব্যবহৃত রাসায়নিকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া	(১) অদাহ্য	(১) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড—অদাহ্য ইথিলিন ডাইক্লোরাইড—অত্যন্ত দাহ্য মিশ্রণ অল্প দাহ্য, ব্যবহারে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বনের দরকার আছে
	(২) সাধারণ অবস্থায় গ্রন্থাগার সংগ্রহের তেমন কোন ক্ষতিসাধন করে না	(২) সাধারণ অবস্থায় গ্রন্থাগার সংগ্রহের কোন ক্ষতিসাধন করে না
	(৩) মানুষের পক্ষে বিষাক্ত নয়	(৩) মানুষের পক্ষে কিছুটা বিষাক্ত
মন্তব্য	অপেক্ষাকৃত কম খরচ সাপেক্ষ	অপেক্ষাকৃত কম খরচ সাপেক্ষ
ব্যবহারের ব্যাপকতা এবং পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা	দুইমাস ব্যবধানে আবার ধূপন করতে হবে যাতে ডিম ফুটে বেরুনো লার্ভাগুলিকে ধ্বংস করা যায়।	ডিম ফুটে বেরুনো লার্ভাগুলোকে ধ্বংস করার জন্য দুইমাস ব্যবধানে ধূপনের পুনরাবৃত্তির দরকার হয়।

সম্বন্ধে তুলনামূলক সারণী (শেষাংশ)

[১৬৫ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ]

৭	৮
ছত্রাক, কীটপতঙ্গ (পূর্ণাঙ্গ, লার্ভা ডিম), ধ্বংস করে	ছত্রাক, কীটপতঙ্গের পূর্ণাঙ্গ এবং লার্ভাকে ধ্বংস করে যদিও ডিমের কোন ক্ষতি করেনা
২৪—২৮ ঘণ্টা	২৪ ঘণ্টা
(১) অদাহ্য (২) সাধারণ অবস্থায় গ্রন্থা-গার সংগ্রহের তেমন কোন ক্ষতিসাধন করে না (৩) মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে	(১) অত্যন্ত দাহ্য (২) সাধারণ অবস্থায় গ্রন্থাগার সংগ্রহের তেমন কোন ক্ষতিসাধন করে না (৩) মানুষের পক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত
অপেক্ষাকৃত কম খরচ সাপেক্ষ	অপেক্ষাকৃত কম খরচ সাপেক্ষ
পুনরাক্রমণ না হলে ধূপনের পুনরাবৃত্তির দরকার হয় না।	ডিম ফুটে বেরুনো লার্ভা ধ্বংসের জন্য দুইমাস ব্যবধানে ধূপনের পুনরাবৃত্তির দরকার।

সংরক্ষণে ব্যবহৃত নানাধরণের বিষাক্ত পদার্থ এবং তার ব্যবহার

গ্রন্থাগার সংগ্রহের সংরক্ষণের পথে নানা ধরণের বাধা আছে। তার মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে সংগ্রহ নানা ধরণের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। এই ধরণের শত্রুদের বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এদের প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা মধ্যে একটি হচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিক প্রয়োগে এদের ধ্বংস করা। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিকের ব্যবহার করা হয়ে থাকে —সেগুলোকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা—যেগুলো (১) খাবার ফলে বিষক্রিয়া সুরু হয়, (২) স্পর্শে বিষক্রিয়া হয়, (৩) প্রশ্বাসের সাথে যেহে ঢুকলে বিষক্রিয়া করে, (৪) আরেক ধরণের পদার্থ আছে যেগুলো বসবাসের উপযোগী পরিবেশ নষ্ট করে দেয়—যাকে আমরা কীটপতঙ্গ বিতাড়ক (insect repellant) বলতে পারি। এখানে বলে রাখা ভাল যে একই বিষ একাধিকভাবে কাজ করতে পারে অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে বিষাক্ত খাদ্য, কোথাও বা স্পর্শবিষ ইত্যাদি।

বিষাক্ত খাদ্য : খাদ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী বিষের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মারকিউরিক ক্লোরাইড, আরসেনিক ট্রাইঅক্সাইড, জিঙ্ক আরসেনাইট, সোডিয়াম ফ্লুরাইড, লেড্ কার্বোনেট, বেরিয়াম কার্বোনেট ইত্যাদি। এই ধরণের বিষাক্ত পদার্থ আরশুলা, উইপোকা, গুবরে জাতীয় পোকা ইত্যাদির এবং ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী।

অ্যালড্রিন (Aldrin) ($C_{12}H_8C_6$) কেলাস পদার্থ। জল অদ্রবণীয়, কিন্তু অ্যালকোহল, ইথার, বেনজিন ইত্যাদিতে দ্রবণীয়। খাবারের সাথে মিশিয়ে ইঁদুর জাতীয় প্রাণী মারার জন্যে ব্যবহৃত হয়। কীটনাশক হিসাবে যথেষ্ট ফলপ্রসূ।

আরসেনিক ট্রাইঅক্সাইড (Arsenic Trioxide) (As_2O_3) এটি সাদা স্বচ্ছ পদার্থ—জলে অল্প দ্রবণীয়। সব প্রাণীর পক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত। উপযুক্ত কোন খাবারের সাথে মিশিয়ে এটি ইঁদুর ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাদা

আরসেনিক অথবা হোয়াইট আরসেনিক (White Arsenic) নামেও পরিচিত।

কিউপ্রিক আরসেনাইট (Cupric Arsenite) ($CuHAsO_3$) হলদেটে সবুজ গুঁড়ো। এটি প্যারীস গ্রীন নামেও পরিচিত। জল অদ্রবণীয়। কাঠে ঘুনপোকা/উইপোকা ইত্যাদির আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এর ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। ছত্রাক নাশক হিসাবেও উপকারী। ইঁদুরনাশক হিসাবে খাবারের সাথে মিশিয়ে এর ব্যবহার করা চলে।

ক্যালসিয়াম আরসেনেট (Calcium Arsenate) ($As_2Ca_3O_8$) সস্তা অত্যন্ত বিষাক্ত দানাদার পাউডার। জলে অল্প দ্রবণীয়। সাধারণভাবে ছড়িয়ে অথবা স্প্রের মাধ্যমে এর ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ৮ ভাগ চুনের সঙ্গে ১ ভাগ ক্যালসিয়াম আরসেনেট মিশিয়ে ছড়ানো হয়। নজর রাখতে হবে যাতে প্রশ্বাসের সঙ্গে অথবা হাত থেকে কোনভাবে প্রয়োগের সময় মুখের মধ্যে এই বিষ না চলে যায়। এটি তুলনামূলকভাবে অস্থায়ী বিষ।

ক্লোরডেন (Chlordane) ($C_{10}H_6Cl_8$) বর্ণযুক্ত তরল পদার্থ। জলে অদ্রবণীয়। কেরাসিন ও অন্যান্য পেট্রোরসায়নে দ্রবণীয়। খাবারের সাথে ইঁদুরনাশক হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। কীটনাশক হিসাবে স্প্রে করে ব্যবহার করা চলে। ধূপণের কাজেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উইপোকা নিয়ন্ত্রণে মাটিতে প্রয়োগ করে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। কোন কোন দেশে একমাত্র উইপোকার জন্য মাটির নীচে প্রয়োগ ছাড়া এর ব্যবহার পরিবেশ দূষণের কারণে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

জিংক অর্থো-আরসেনেট (Zinc Ortho-arsenate) ($As_2O_8Zn_3$) জিংকের এই আরসেনিক যোগ সাদা গন্ধহীন অত্যন্ত বিষাক্ত গুঁড়ো। জলে অদ্রবনীয়। অ্যামোনিয়া, অ্যাসিড, ক্ষারে দ্রবণীয়। বিশেষতঃ খাদ্য নালীতে এর প্রতিক্রিয়া ব্যাপক। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের কমবয়সীদের উপর এর বিষক্রিয়া বয়স্কদের তুলনায় বেশী।

জিংক ক্লোরাইড (Zinc Chloride) ($ZnCl_2$) সাদা গন্ধহীন দানাদার পদার্থ। জলে দ্রবণীয়। বাতাসের আর্দ্রতা সহজেই শুষে নেয়। সেলুলোজের ক্ষতি করতে পারে। ইঁদুরনাশক হিসাবে খাবারের সাথে প্রয়োগ করা হয়।

জিংক ফসফাইড (Zinc Phosphite) (Zn_3P_2) ফসফরাসের গন্ধযুক্ত গাঢ় ধূসর অথবা কালো রংএর দানাদার পদার্থ। জলে অদ্রবণীয়। অধিকাংশ প্রাণীর কাছে এর গন্ধ আপত্তিকর হলেও ইঁদুরের কাছে এই গন্ধ আকর্ষক। শতকরা ১ ভাগ হিসাবে খাবারের সাথে মিশিয়ে এর ব্যবহার করা হয়। খোলা অবস্থায় থাকলে বাতাসের আর্দ্রতার সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে এর বিষাক্ত চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়।

ট্রাইক্লোরোবেনজিন (Trichlorobenzene) ($C_6H_3Cl_3$) এটি দানাদার পদার্থ, জল অদ্রবণীয়। অ্যালকোহলে স্বল্প দ্রবণীয়, কিন্তু কার্বন ডাইসালফাইড এবং বেনজিনে দ্রবনীয়। কীটনাশক হিসাবে খুবই ফলপ্রসূ, বিশেষতঃ উইপোকার ক্ষেত্রে।

ডিক্যাপথন (Dicapthon) ($C_8H_9ClNO_5PS$) কেলাস পদার্থ। জলে অদ্রবনীয়। অ্যাসিটোন, ইথাইল অ্যাসিটেট, টোলিউন ইত্যাদি এবং কয়েক ধরণের তেলে দ্রবণীয়। ইঁদুর ধ্বংস করার জন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহৃত হয়। কীটনাশক হিসাবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ডাইএলড্রিন (Dieldrin) ($C_{12}H_8Cl_6O$) কেলাস পদার্থ। জলে অদ্রবণীয়। জাইলিন এবং ঐ জাতীয় দ্রাবকে সহজেই দ্রবনীয়। ইঁদুর মারার জন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। কীটনাশক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত কারণ চামড়ার মাধ্যমে সহজেই দেহে প্রবেশ করতে পারে এবং বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

ডিমপাইলেট (Dimpylet) ($C_{12}H_{21}N_2O_3PS$) ডায়াজিনন (Diazinon) নামেও পরিচিত। মৃদু গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ। জল, অ্যালকোহল, ইথার, বেনজিন ইত্যাদিতে দ্রবণীয়। কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত।

পেন্টাক্লোরোফেনল (Pentachlorophenol) (C_6HCl_5O) সরু সূঁচের মত কেলাস। গরম করলে তীব্র গন্ধ ছড়ায়। জলে প্রায় অদ্রবণীয়। অ্যালকোহল, ইথার, বেনজিন ইত্যাদিতে দ্রবণীয়। ইঁদুর মারার জন্য খাবারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা চলে। উইপোকা দমনে এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। বাঁধাইয়ের আঠার সঙ্গে মেশানো হয়ে থাকে কীটপতঙ্গের হাত থেকে সেটিকে বাঁচাবার জন্য। অত্যন্ত কার্যকরী ছত্রাকনাশক। ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। চামড়ার মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করতে সক্ষম।

বেরিয়াম কার্বোনেট (Barium Carbonate ($BaCO_3$) সাদা ভারী গুঁড়ো। জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু কড়া অ্যাসিডে দ্রবণীয়। এটি গৃহপালিত পশুপাখির পক্ষে মৃদু বিষ, কিন্তু ইঁদুরের পক্ষে মারাত্মক। অল্প জলের সঙ্গে ২০% অনুপাতে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়।

বোরিক অ্যাসিড (Boric Acid) (H_3BO_3) রংহীন, গন্ধহীন, স্বচ্ছ কেলাসিত বা সাদা দানাদার অথবা গুঁড়ো অবস্থায় পাওয়া যায়। জলে স্বল্প দ্রবণীয়। জলে মিশ্রণ জীবানু এবং ছত্রাকনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মারকিউরাস ক্লোরাইড (Mercurcus Chloride) (Hg_2Cl_2) স্বাদহীন, গন্ধহীন, সাদা ভারী গুঁড়ো। জলে প্রায় অদ্রবণীয়। আলো থেকে দূরে রাখা দরকার নতুবা আস্তে আস্তে মারকিউরিক ক্লোরাইডে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অত্যন্ত শক্তিশালী ছত্রাকনাশক। অত্যন্ত বিষাক্ত হওয়ায় ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন না করলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

মারকিউরিক ক্লোরাইড (Mercuric Chloride) ($HgCl_2$) সাদা দানাদার অথবা গুঁড়ো। করোসিভ সাবলিমেট নামেও পরিচিত। অত্যন্ত বিষাক্ত। জলে অল্প দ্রবণীয়। উইপোকার হাত থেকে কাঠকে রক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

লিনডেন (Lindane) ($C_6H_6Cl_6$) গন্ধযুক্ত কেলাস। জলে অদ্রবণীয়। অ্যালকোহল, বেনজিন, ইথার ইত্যাদিতে দ্রবণীয়। কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

লেড আর্সেনেট (Lead Aresenate) ($PbHAsO_4$) এটি সাদা রং এর ভারী ধরণের গুঁড়ো। জলে অদ্রবণীয়। অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিষ। জলে মিশিয়ে অথবা পাউডার হিসাবে এর প্রয়োগ করা হয়। মথের লার্ভা এবং বুকওয়ার্ম (অর্থাৎ গুবরে জাতীয় পোকার লার্ভা) এর ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকরী।

লেড কার্বোনেট (Lead Carbonate) ($PbCO_3$; $Pb(OH)_2$ সাদা দানাদার পদার্থ, জলে স্বল্প দ্রবণীয়। কিন্তু অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেটে সহজে দ্রবণীয়। সাধারণভাবে একে অনেক সময় সাদা সীসে অথবা হোয়াইট লেড (white lead) বলা হয়ে থাকে।

সোডিয়াম আর্সেনাইট (Sodium Arsenite) ($NaAsO_3$) সাদা অথবা সাদাটে ধূসর রংএর গ‍ঁড়ো। জলে সহজেই দ্রবণীয়। এটি নানাধরণের কাঠে কীটপতঙ্গের, বিশেষ করে উইপোকা/ঘুণপোকার, আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায়।

সোডিয়াম ফ্লুরাইড (Sodium Fluride) (NaF) সাদাটে দানাদার পদার্থ। জলে অল্প দ্রবণীয়। অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ। খাদ্যনালীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়া সুরু করে। খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে এর প্রয়োগ করা হয়।

সোডিয়াম বোরেট (Sodium Borate) ($Na_2B_4O_7$) সাধারণভাবে বোরাক্স নামেও পরিচিত। শক্ত গন্ধহীন কেলাস অথবা দানাদার পদার্থ। জলে স্বল্প দ্রবণীয়। কাঠকে অগ্নিনিরোধক করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ছত্রাক-নাশক হিসাবেও এর ব্যবহার করা হয়।

সোডিয়াম হেক্সাফ্লুরোসিলিকেট (Sodium Hexaflurosilicate) (Na_2SiF_6) সোডিয়াম ফ্লুওসিলিকেট নামেও পরিচিত। সাদা দানাদার গ‍ুঁড়ো। জলে অল্প দ্রবণীয়। ইঁদুর ও কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মথের আক্রমণ থেকে কাপড় (বিশেষতঃ গরম কাপড়) রক্ষায় ব্যবহার করা হয়।

হোয়াইট ফসফরাস (White Phosphorus) (P) সাদা অথবা স্বচ্ছ দানাদার গন্ধযুক্ত পদার্থ। খোলা অবস্থায় থাকলে বাতাসের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে কালচে হয়ে যায়। জলে প্রায় অদ্রবণীয়। অন্ধকারে হলুদ আলো বিকিরণ করে, বাতাসের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে। এটি মারাত্মক বিষ। অধিকাংশ প্রাণীর কাছে এর গন্ধ আপত্তিকর, ফলে এটিকে তারা এড়িয়ে চলে। কিন্তু ইঁদুর ফসফরাস মেশানো খাবারে কোন আপত্তি করে না। খাবারের সঙ্গে এই বিষ টাটকা অবস্থায় প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যায়। এই বিষাক্ত পদার্থ খোলা অবস্থায় থাকলে এর ক্ষতিকারক ক্ষমতা ক্রমশঃ কমে যায়।

স্পর্শবিষ

স্পর্শে বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী বিষের মধ্যে রয়েছে নিকোটিন, পিপ, ডিডিটি, ডিলড্রিন, এনড্রিন এবং কয়েক ধরণের ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন এবং ফসফরাসের

জৈব যৌগ, যথা পাইরেথিন্, ম্যালাথিয়ান ইত্যাদি। শেষোক্ত দুইধরণের যৌগ অনেক সময়ে খাদ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী বিষ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

ডি ডি টি (Dichlor-Diphenyl-Trichorethane) এটি একধরণের ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন। কীটনাশক হিসাবে নানা ক্ষেত্রে পৃথিবীতে যত বিষাক্ত পদার্থের প্রয়োগ করা হয় তার মধ্যে শতকরা ৭০/৭৫ ভাগই এই ডিডিটি বা তার মিশ্রণ। এর প্রধান সুবিধা, এটি যথেষ্ট স্থায়ী পদার্থ। পোকামাকড়, ইঁদুর ইত্যাদির যাতায়াতের পথের উপর ৫0% শক্তিসম্পন্ন ডিডিটি ছড়ানোর মাধ্যমে এদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এটি স্পর্শ এবং খাদ্যের সঙ্গে মিশে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। সম্প্রতি নানাদেশে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে অতিরিক্ত ডিডিটি বা ঐ জাতীয় বিষ ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে কীটপতঙ্গের মধ্যে এর প্রতিরোধ ক্ষমতা (resistance) জন্মায় এবং যে জায়গাতে এর দীর্ঘ প্রয়োগ করা হয়েছে, এটি সেখানকার পরিবেশে ক্রমশ জমে জমে নানাধরণের মারাত্মক পরিবেশদূষণ সৃষ্টি করে। সেকারণে উন্নত নানাদেশে এই ধরণের পদার্থ ব্যবহার সম্বন্ধে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

নিকোটিন (Nicotine) ($C_{10}H_{14}O_2$) রংহীন অথবা হাল্কা হলুদ তৈলাক্ত তরল। বাতাসে খোলা রাখলে খয়েরী রং ধারণ করে। জলে দ্রবণীয়। তামাক জাতীয় গাছের মধ্যে এটি উপক্ষার হিসাবে উপস্থিত থাকে। এটি কখনও কখনও ৯৫% শক্তিসম্পন্ন উপক্ষার অবস্থায় অথবা নিকোটিন সালফেড রূপে (যার মধ্যে ৪0% নিকোটিন উপক্ষার থাকে) ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে আরসেনিকঘটিত বিষে যেসব কীটপতঙ্গের ক্ষতি হয় না, সেসব ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট কার্যকরী। খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে ইঁদুর জাতীয় প্রাণীনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পাইরেথিন (Pyrethrine) ($C_{21}H_{21}O_3$ অথবা $C_{22}H_{28}O_5$) এটি একধরণের ভেষজ তেল। পাইরেথ্রাম ফুলের নির্যাস। সাধারণত ২৫% শক্তিতে এটি পাওয়া যায়। জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু কেরোসিন এবং অন্য কোন কোন দ্রাবকে দ্রবণীয়। ঐসব দ্রাবকে মিশিয়েই এর ব্যবহার করা হয়। কীটপতঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট বিষাক্ত হলেও মানুষ এবং গৃহপালিত পশুর পক্ষে এর তেমন কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এটির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এটি খুব সহজেই বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে এর কার্যকরী ক্ষমতা হারায়। শুধুমাত্র স্প্রে করার জন্যই এর ব্যবহার করা হয় স্বল্পকালস্থায়ী

নিবারক পদার্থ হিসাবে। অবশ্য এখন নানাধরণের পরীক্ষা চালানো হচ্ছে যার মাধ্যমে চেষ্টা করা হচ্ছে অন্য কোন রাসায়নিকের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে এর ক্ষমতা অধিকতর স্থায়ী করা সম্ভব কিনা।

বি-এইচ-সি (Benzene Hexachloride) ($C_6H_6Cl_6$) বর্ণহীন কঠিন পদার্থ। জলে অদ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহল, ইথার ইত্যাদিতে দ্রবণীয়। এটি কয়েকটি ভিন্নরূপে পাওয়া যায় যার মধ্যে একটি বিশেষরূপের (গামা আই-সোমার) কীটনাশক ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। উচ্চতর প্রাণী ও মানুষের পক্ষে এটি কম ক্ষতিকারক। সাধারণত এটি গুঁড়ো হিসাবেই ছড়িয়ে ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও কেরাসিনে মিশিয়েও স্প্রে করা হয়। এরই একটি বিশেষরূপ সাধারণভাবে গ্যামাক্সিন (Gammexane) নামে পরিচিত। যদিও আরশোলা, সিলভারফিস, ব্রিস্টলটেল ইত্যাদির ক্ষেত্রে খুবই কার্যকারী কিন্তু কয়েক ধরণের কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রে (যেমন বিভিন্ন ধরণেব পূর্ণাঙ্গ শুয়োপোকা) এটি ততটা কার্যকরী নয়। বাতাসে খোলা অবস্থায় দীর্ঘকাল পড়ে থাকলে এর ক্ষমতা ক্রমশ কমে আসে। ফলে ক্রমাগত ব্যবহাবজনিত পরিবেশদূষণের সমস্যা এটি সাধারণত সৃষ্টি করে না।

বেগন / শেলটক্স / ফিনিট (Begon/Shelltox /Finit)—পেট্রোলিয়াম দ্রাবকের সঙ্গে রাসায়নিক মিশ্রণে তৈরী এইসব কীটনাশক সাধারণত স্প্রে করে ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে অধিকাংশ কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রে এগুলি খুবই কার্যকরী। তীব্রগন্ধযুক্ত এই কীটনাশক একবার প্রয়োগের পর ৫/৭ দিন পর্যন্ত এর প্রভাব থেকে যায়, সে কারণে প্রতি সপ্তাহে এব নিয়মিত প্রয়োগে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব।

ম্যালাথিয়ন (Malathion)—হলদে থেকে গাঢ় বাদামী রংএর তীব্র আপত্তিকর গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ। এটি ফসফরাসেব একধরণের জৈব যৌগ। জলে অল্প দ্রবণীয়। উচ্চতাপমাত্রায় এটি এর কীটনাশক ক্ষমতা ক্রমশ হারিয়ে ফেলে। কীটপতঙ্গের পক্ষে তীব্র বিষ হলেও যেহেতু গৃহপালিত প্রাণী এবং মানুষের পক্ষে প্রায় ক্ষতিকারক না হওয়ায়, এটি ব্যবহারে যথেষ্ট সুবিধা হয়। শুকনো গুঁড়ো হিসাবে ছড়িয়ে অথবা দ্রাবকে মিশ্রণ অবস্থায় স্প্রে করে করে এটি ব্যবহার করতে হয়। ডিডিটির তুলনায় অপেক্ষায় মৃদু বিষ। এটি অত্যন্ত দাহ্য, ফলে সর্বদা আগুন থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

প্রশ্বাসের সাথে দেহে বিক্রিয়া সৃষ্টিকারী বিষ

প্রশ্বাসের সাথে দেহে ঢুকে বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী বিষের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মিথাইল ব্রোমাইড, কার্বন-ডাইসালফাইড, ইথিলিন অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন, থাইমল, ফরম্যালডিহাইড ইত্যাদি। সাধারণত এই ধরণের রাসায়নিক পদার্থ ধূপনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

ইথিলিন অক্সাইড (Ethylene Oxide) (C_2H_4O) বর্ণহীন দাহ্য গ্যাস। জলে, ইথারে অ্যালকোহলে দ্রবণীয়। ছত্রাকনাশক এবং কীটনাশক হিসাবে খুবই কার্যকরী। ধূপন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়।

ইথিলিন ডাইক্লোরাইড (Ethylene Dichloride) ($C_2H_4Cl_2$) মিষ্টিগন্ধযুক্ত ভারী তরল। জলে স্বল্প দ্রবণীয়। বাষ্পায়িত অবস্থায় দাহ্য। কার্যকরী কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে ইঁদুরনাশক হিসাবেও ব্যবহার করা চলে।

ইথিলিন ডাইব্রোমাইড (Ethylene Dibromide) ($C_2H_4Br_2$) সাধারণ ঘরের তাপমাত্রায় ক্লোরোফর্মের গন্ধযুক্ত ভারী তরল। কিন্তু সহজেই অদাহ্য বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। ধূপনে কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও খাবারের সাথে মিশিয়ে ইঁদুরনাশক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। দামে সস্তা এবং ব্যবহার করা আপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। গায়ের চামড়ায় বেশীক্ষণ লেগে থাকলে ক্ষতের সৃষ্টি করে। দীর্ঘ সময় এর বাষ্পের মধ্যে থাকলে লিভার, কিডনী, ফুসফুসের ক্ষতিসাধন করে।

কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (Carbon Tetrachoride) (CCl_4) বর্ণহীন গন্ধযুক্ত অদাহ্য ভারী তরল। জলে স্বল্প দ্রবণীয়। ইথার, অ্যালকোহল ইত্যাদিতে দ্রবণীয়। গ্যাসীয় অবস্থায় ধূপনে কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় অত্যন্ত দাহ্য কীটনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়, যাতে বিস্ফোরণ অথবা অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা না থাকে। এই গ্যাস অগ্নিনির্বাপক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

কার্বন ডাইসালফাইড (Carbon Disulphide) (CS_2) তীব্রগন্ধযুক্ত দাহ্য তরল শক্তিশালী কীটনাশক। বাতাসের সঙ্গে মিশে বিস্ফোরকে রূপান্তরিত হয়। বাষ্পীভূত অবস্থায় বাতাসের চেয়ে ভারী। কীটনাশক হিসাবে ধূপন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। মানুষের উপরও এর বিষক্রিয়া আছে। তীব্র মাথাব্যাথা

এবং যা বমিভাব এর বিষক্রিয়ার প্রাথমিক লক্ষণ। বেশী বিষক্রিয়ার ফলে পক্ষাঘাত, এমন কি মৃত্যুও ঘটতে পারে। যাদের হৃদরোগ আছে, তাদের ক্ষেত্রে বেশী ক্ষতিকারক।

থাইমল (Thymol) ($C_{10}H_{14}O$) কেলাস যেটি সামান্য তাপমাত্রায় ধীরে ধীরে এবং ১০০ সেঃ তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্যভাবে বাষ্পীভূত হতে সুরু করে। গ্যাসীয় অবস্থায় তীব্র গন্ধযুক্ত। জলে অল্প দ্রবণীয়। ছত্রাকনাশক এবং কীটনাশক হিসাবে ধূপনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সস্তা এবং ব্যবহারে অন্যান্য সুবিধা থাকায় ধূপনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ।

ন্যাপথালিন (Naphthalene) গন্ধযুক্ত সাদা কেলাস। খোলা বাতাসে এটি আস্তে আস্তে বাষ্পীভূত হয়। জলে প্রায় অদ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহল, বেনজিন, ইথারে দ্রবণীয়। কাপড়ে মথ ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের আক্রমণের প্রতিরোধ যথেষ্ট কার্যকরী।

প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন (Paradichlorobenzine) ($C_6H_4Cl_2Bn$). সাদা রংএর কেলাস যেটি সাধারণ ঘরের তাপমাত্রায় ধীরে ধীরে বাষ্পায়িত হতে পারে। গ্যাসীয় অবস্থায় মৃদু ইথারের গন্ধযুক্ত। কীটনাশক হিসাবে ধূপনের কাজে ব্যবহৃত হয়। জলে অদ্রবণীয়। অ্যালকোহল, ইথার, বেনজিন ইত্যাদিতে দ্রবণীয়। খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে ইঁদুরনাশক হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

ফরম্যালডিহাইড (Formaldehyde) (CH_2O) : দাহ্য বর্ণহীন তীব্র গন্ধযুক্ত গ্যাস। সাধারণভাবে জলে ৩৭% পরিমাণে দ্রবণই ব্যবহৃত হয়। এই দ্রবণ বর্ণহীন, তীব্র গন্ধযুক্ত। বাষ্পীভূত হলে অল্প পরিমাণ ফরম্যালডিহাইড গ্যাস এবং বাকীটা ট্রাইঅক্সিমিথিলিন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। ছত্রাক এবং কীটনাশক হিসাবে ধূপনে ব্যবহৃত হয়। মানুষের উপর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম।

মিথাইল ব্রোমাইড (Methyl Bromide) (CH_3Br) বর্ণহীন, প্রায় গন্ধহীন, উচ্চচাপে তরল পদার্থ। সাধারণ চাপে এবং তাপমাত্রায় ঘরের মধ্যে খোলা পাত্রে রাখলে এটি সহজেই বাষ্পীভূত হয়ে যায়। ফুটনাংক ৪৫° সেঃ। বাষ্পায়িত অবস্থায় এই গ্যাস বাতাসের তুলনায় ভারী। কীটপতঙ্গের ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ সব অবস্থাতেই এটি বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। সহজেই নানা পদার্থের মধ্যে সহজেই ঢুকতে পারে সেজন্য ধূপনে খুবই কার্যকরী। কোন গন্ধ না

থাকায় সহজে এর উপস্থিতি বোঝা না যাওয়ার ফলে অত্যন্ত ক্ষতিকারক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। অনেক সময় এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ২% ক্লোরোপিকরিণ (Chloropicrin) এর সাথে মিশিয়ে নেওয়া হয় যাতে এই রাসায়নিকের তীব্র গন্ধ থেকে মিথাইল ব্রোমাইডের উপস্থিতি বোঝা যায়। মিথাইল ব্রোমাইড শরীরে ঢুকে গেলে সেটি জমে থাকে। ভবিষ্যতে আবার এর সংস্পর্শে আসলে শরীরের মধ্যে জমা মিথাইল ব্রোমাইডের পরিমাণ বিপজ্জনক সীমা লঙ্ঘন করে বিপদ ঘটাতে পারে। চামড়ার সংস্পর্শে এলে এটি মারাত্মকভাবে পোড়ার মত ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে।

হাইড্রোজেন সায়ানাইড (Hydrogen Cyanide) (CHN) অত্যন্ত বিষাক্ত মৃদু মিষ্টিগন্ধযুক্ত গ্যাস। এই পদার্থ সহজেই প্রাণীকোষে প্রবেশ করে এবং অল্প সময় সেখানে থেকে পুনরায় বেরিয়ে যায়। এটি প্রাণীদেহের তন্তুগুলিকে অক্সিজেন গ্রহণ এবং সেটি ব্যবহারে অক্ষম করে দেয়। যথেষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কীটপতঙ্গ সহজেই ধ্বংস করে। সবধরণের প্রাণীর উপরই এর তীব্র বিষক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, সেহেতু এটি ব্যবহারে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। এই মারাত্মক গ্যাসের উপস্থিতি সহজে বুঝবার জন্য সাধারণত ক্লোরোপিকরিন গ্যাস এর সাথে মেশানো হয়ে থাকে।

কীটপতঙ্গ বিতাড়ক

কিছু রাসায়নিক পদার্থ আছে যেগুলি মৃদু বিষ অথবা আদৌ বিষাক্ত নয়, কিন্তু যার উপস্থিতি কীটপতঙ্গের পক্ষে সুখকর না হওয়াতে, এরা এই সব রাসায়নিক পদার্থকে এড়িয়ে চলে। সেইসব রাসায়নিক পদার্থকে কীটপতঙ্গ বিতাড়ক (Insect repellents) হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। একই রাসায়নিক সব কীটপতঙ্গের পক্ষে বিতাড়কের কাজ করতে পারে না। সাধারণভাবে বিতাড়ক বিভিন্ন ধরণের হয়— প্রথমটি সেইসব কীটপতঙ্গের পক্ষে কার্যকরী— যারা পায়ে হেঁটে চলে—যেমন উইপোকা, আরশোলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ক্রিয়োজট, ট্রাইক্লোরোবেনজিন, অন্যটি কাপড় ইত্যাদি আক্রমণকারী কীটপতঙ্গ যেমন ক্লথমথ, মথ, কার্পেট বিটল ইত্যাদির ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী যেমন সোডিয়াম ফ্লুওসিলিকেট, ডিডিটি ইত্যাদি।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক কর্তব্য

কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ইত্যাদি যেগুলো সাধারণত ব্যবহার করা হয় এদের প্রত্যেকটিরই গৃহপালিত পশুপাখি এবং মানুষের উপর কমবেশী বিষক্রিয়া আছে। সেজন্য এদের মজুত করে রাখা, প্রয়োগ ইত্যাদি সবই করতে হবে যথেষ্ট সচেতনভাবে এবং সাবধানতার সঙ্গে। প্রতিটি কীটনাশক, ছত্রাকনাশকের আধারের গায়ে সাবধানতার প্রয়োজনীয়তা এবং বিশেষ কিছু জ্ঞাতব্য থাকলে সেটিও সূচিত থাকে। এছাড়াও ঐ বিশেষ বিষাক্ত পদার্থের বিষঘ্নেরও (anti-dote) উল্লেখ থাকে। ব্যবহারের আগে মনোযোগ সহকারে এগুলি পড়ে নেওয়া এবং মেনে চলা দরকার। বিশেষতঃ অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করার ব্যাপারে অভিজ্ঞ কর্মীর সাহায্য নেওয়া দরকার। এই ধরণের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের ব্যাপক উৎপাদন এবং তার ব্যবহারের অনুপাতে এর ব্যবহারজনিত বিষক্রিয়ার সংখ্যা নগন্য। এই ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে সাধারণত যেসব কারণে সেগুলো হচ্ছে—

(১) ব্যবহৃত রাসায়নিক সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় ;

(২) যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বনের অভাবে ;

(৩) রাসায়নিকের নিজস্ব ব্যবহার বিধি না মেনে চলার জন্য।

বিষক্রিয়াজনিত দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য সাধারণভাবে যাসব করা উচিত তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—

(১) কোন বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করার আগে তার বিষক্রিয়া সম্বন্ধে ভালভাবে জেনে নিতে হবে এবং এই পদার্থের সংস্পর্শে যারা আসবে, তাদের সকলকেই এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে।

(২) এইসব পদার্থ যথেষ্ট সাবধানে তালা লাগানো আলমারী অথবা বাক্সের মধ্যে রাখা দরকার, যাতে কোন অবস্থাতেই অনভিজ্ঞ/অসাবধান কোন কর্মীর হাতে না পড়ে।

(৩) প্রতিটি বিষাক্ত রাসায়নিকের আধারের গায়ে স্পষ্টভাবে তার নাম এবং "বিষ" এই কথাটি সূচিত থাকা অত্যন্ত জরুরী।

(৪) খাবার রাখার কাজে ব্যবহৃত আধারে এবং খাবারের আশেপাশে কখনই বিষাক্ত পদার্থ মজুত করা উচিত নয়।

(৫) ভালভাবে বাতাস চলাচল করার ব্যবস্থা নেই এমন ঘরে অথবা তার কোন অংশে বিষাক্ত পদার্থের নাড়াচাড়া করা উচিত নয়।

(৬) সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যাতে বিষাক্ত পদার্থ চোখ, চামড়া ইত্যাদির সংস্পর্শে না আসে।

(৭) যেখানে মাঝে মাঝেই বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহার হয়ে থাকে, সেখানে হাতের কাছে কিছু জরুরী প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ এবং দরকারী বিষঘ্ন মজুত রাখা দরকার।

(৮) কাছাকাছি চিকিৎসক অথবা হাসপাতালের টেলিফোন নম্বর এবং অন্যান্য দরকারী তথ্য টেলিফোনের পাশেই অথবা হাতের কাছে রাখা দরকার। যথেষ্ট পরিমানে খাবার পরিস্কার জলে এবং অন্য কাজে ব্যবহারোপযোগী জলের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও যদি কখনও দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তবে কি কি করা উচিত সে ব্যাপারে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

(১) দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাথমিক শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে দ্রুত উপযুক্ত শুশ্রূষার মাধ্যমে দ্রুত আরোগ্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে বড় ধরণের বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসক এসে পৌঁছানোর আগেই বিষ ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে অপূরণীয় ক্ষতির সূত্রপাত ঘটে গেছে।

(২) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসক আনানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) যে ঘরে (রাসায়নাগার অথবা ধূপন কক্ষে) অথবা যে অঞ্চলে বিষক্রিয়ার সূত্রপাত হয়েছে, সেখান থেকে রোগীকে সরিয়ে খোলা বাতাসে শুয়ে থাকতে দিতে হবে।

(৪) রোগীর আশপাশ থেকে সবধরণের বিষাক্ত পদার্থ সরিয়ে দিতে হবে।

(৫) অজ্ঞান অথবা প্রায় অজ্ঞান ব্যক্তিকে উপুড় করিয়ে শুয়ে দিতে হবে এমনভাবে, যাতে মাথাটা একদিকে কাত হয়ে থাকে এবং জিভ যেন এমনভাবে থাকে যাতে শ্বাস প্রশ্বাসে কোন বিঘ্ন না ঘটে।

(৬) নজর রাখতে হবে রোগীর শরীরের তাপমাত্রা যাতে হঠাৎ বেড়ে বা কমে না যায় (দরকার হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে)।

(৭) রোগীকে কখনই একলা রাখা উচিত নয়।

(৮) দরকার হলে অর্থাৎ শ্বাসকষ্টের কোন লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) রোগীর অবসন্নতা দূর করার জন্য কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্রাণ্ডী বা ঐ জাতীয় মাদকের প্রয়োগ করা উচিত নয়, কারণ কয়েক ধরণের বিষের ক্ষেত্রে এর ফলে বিষক্রিয়া দ্রুততর হয়ে পড়ে।

(১০) চিকিৎসক এসে পোঁছানোর আগে পর্যন্ত যতটা সম্ভব শুশ্রূষা চালিয়ে যেতে হবে।

(১১) শুশ্রূষাকারীর মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখতে হবে।

চামড়ার মাধ্যমে যদি বিষক্রিয়ার সূত্রপাত হয়ে থাকে তবে ব্যবহৃত রাসায়নিক যার সংস্পর্শে বিষক্রিয়া ঘটেছে, সেটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে হবে। রোগীর জামা কাপড় পাল্টে দিতে হবে, ঘড়ি ইত্যাদি খুলে সরিয়ে রাখতে হবে। পরিষ্কার জলে প্রভাবিত (effected) অংশ ভালভাবে (১০/১৫ মিনিট ধরে) ধুয়ে ফেলতে হবে যাতে বিষাক্ত পদার্থ সম্পূর্ণ অপসারিত হয়। চামড়ার উপরে যদি কোন ক্ষত হয়ে থাকে, তবে তার উপরে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া তেল, মাখন, ঘি, সোডিয়াম বাইকার্বনেট জাতীয় কিছু প্রয়োগ করা উচিত নয়।

মুখের মাধ্যমে যদি বিষ দেহে ঢুকে থাকে (অর্থাৎ যদি খেয়ে ফেলা হয়) তবে প্রথমে দুই চার গ্লাস জল (অথবা দুধ) খাইয়ে দিতে হবে। রোগীর যদি সম্পূর্ণ জ্ঞান না থেকে থাকে তবে জল বা অন্য কিছু খাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। গলায় আঙুল দিয়ে রোগীকে সঙ্গে সঙ্গে বমি করাবার চেষ্টা করতে হবে। দরকার হলে ঈষদুষ্ণ নুনজল (বড় চামচের ১ চামচ লবন একগ্লাস জলে) প্রয়োগ করতে হবে। বিষক্রিয়া যদি কেরোসিন, ডিজেল অথবা কড়া ক্ষার জাতীয় বা অ্যাসিড থেকে হয়ে থাকে অথবা রোগী যদি অজ্ঞান অবস্থায় থাকে তবে বমি করাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। অন্যক্ষেত্রে বিষ সম্পূর্ণভাবে না বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত বমনোদ্বেগকারী ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। যদি বিষটি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়, তবে তার জন্য নির্দিষ্ট বিষঘ্ন প্রয়োগ করতে হবে। যেক্ষেত্রে বিষটি চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে না সেক্ষেত্রে সর্বাত্মক বিষঘ্ন (Universal antidote) (যেটি প্রায় সবধরণের বিষের ক্ষেত্রেই সুফল দিয়ে থাকে) একগ্লাস ঈষদুষ্ণ জলে ১৫ গ্রাম অথবা বড়চামচের উঁচু উঁচু একচামচ মিশিয়ে রোগীকে খেতে দিতে হবে। কোনভাবেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অথবা খুব নিশ্চিত না হয়ে রোগীকে তেল বা তৈলাক্ত পদার্থ বা মাদক জাতীয় পানীয় প্রয়োগ করা উচিত নয়। যদি সম্ভব হয় তবে বমির নমুনা সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

বিষ যদি প্রশ্বাসের সাথে দেহে ঢুকে থাকে তবে বিষাক্ত গ্যাসটি চিহ্নিত

করতে চেষ্টা করা উচিত। সেই গ্যাস যদি ক্লোরিন, হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড অথবা অনুরূপ কোন মারাত্মক বিষ হয়ে থাকে তবে উদ্ধার কার্যের জন্য উপযুক্ত গ্যাস মুখোস ব্যবহার করতে হবে। যদি মুখোস হাতের কাছে না থেকে থাকে তবে নিশ্বাস বন্ধ করে বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব এড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে যথেষ্ট পরিমাণে বিষাক্ত গ্যাস পরিবেশে থাকলে একটি প্রশ্বাসে যে পরিমান গ্যাস দেহে ঢুকতে পারে সেটি একজনকে অজ্ঞান করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বন্ধ ঘরে বা অঞ্চলে যথেষ্ট সাবধানতা নিয়ে তবেই ঢোকা উচিত। রোগীকে অবিলম্বে খোলা বাতাসে স্থানান্তরিত করতে হবে। যদি দেখা যায় যে রোগীর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, মুখে মুখ দিয়ে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থা ততক্ষণ চালু রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না চিকিৎসক এটি বন্ধ করতে বলছেন।

চোখে যদি বিষাক্ত পদার্থ ঢোকে তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর জল (সম্ভব হলে ঈষদুষ্ণ জলে) অনেকক্ষণ ধরে (১০/১৫ মিনিট) দুই চোখই ধুয়ে নিতে হবে। ধোবার সময় চোখ যাতে খোলা থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। দরকার হলে আঙুল দিয়ে চোখের পাতা খুলে রাখতে হবে, নয়ত সব বিষাক্ত পদার্থ ধুয়ে বার করে দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রধান প্রধান কয়েক ধরণের বিষের বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলির উল্লেখ নীচে করা হ'ল।

ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন (যথা আলড্রিন, ক্লোরডেন, ডিডিটি, ডাই-এলড্রিন, বি এইচ্ সি, লিনডেন ইত্যাদি)

উত্তেজনায় স্নায়ুদৌর্বল্য, চোখ পিটপিট করা, মাংশপেশীতে কাঁপ ধরা, পক্ষাঘাতের লক্ষণ, গা বমি বমি করা, মাথা ধরা, তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, বমি ইত্যাদি।

ফসফরাসঘটিত যোগ (যথা হোয়াইট ফসফরাস, ডায়াজিনন, জিঙ্ক ফসফাইড, ডিক্যাপথন ইত্যাদি)

নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, তীব্র মাথাব্যাথা, বুকে মাংশপেশীর সঙ্কোচন-জনিত খিচ্ ধরা, চোখের মণির সংকোচন। এছাড়াও বমি, উদরাময়, পক্ষাঘাত (বিশেষতঃ হৃদপিণ্ডের), মুখ দিয়ে লালা গড়াতেও পারে।

পারদঘটিত যোগ (যথা—মারকিউরিক ক্লোরাইড, মারকিউরাস ক্লোরাইড ইত্যাদি)

মুখ, গলা এবং খাদ্যনালীতে তীব্র জ্বালা, মুখ থেকে রক্তাক্ত থুতু পড়া,

রক্তচাপ দ্রুত নেমে যাওয়া, নাড়ীর গতি বৃদ্ধি, অসংলগ্ন কথাবার্তা, ভুলবকা, উম্মাদময় ইত্যাদি।

আয়োডিনকঘটিত যৌগ

গলায় জ্বালা, পেটে ব্যাথা, চামড়া ফ্যাকাসে এবং ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, রক্তচাপ এবং শ্বাস-প্রশ্বাস কমতে থাকা, প্রচণ্ড তৃষ্ণা, ক্রমশ জ্ঞান লোপ এবং কোমা।

বিশেষ কয়েক ধরণের বিষ, তার প্রতিকার এবং বিষঘ্ন

অ্যাসিড (Acids) : বাহ্যিক ব্যবস্থা—উপরে বর্ণিত প্রাথমিক শুশ্রুষার নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে। অন্তঃস্থ ব্যবস্থা—বমি করাবার ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সোডিয়াম বাইকার্বনেট বা কার্বোনেটের ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রচুর পরিমাণে মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া অথবা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল ব্যবহার করতে হবে।

পরিশেষে দুধ এবং ডিমের সাদা অংশটি জলে মিশিয়ে খেতে দিতে হবে।

আয়োডিনকঘটিত যৌগ : ঈষদুষ্ণ লবণ জল প্রয়োগে বমনোদ্বেগ করা দরকার। বমি হয়ে যাবার পর ২ চামচ মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া জলের সাথে এবং তারপর দুধ, মাখন প্রয়োগ করা যেতে পারে চিকিৎসকের অনুমোদন সাপেক্ষে। এটি খাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যদি ফেরিক হাইড্রোক্সাইড প্রয়োগ করা হয় তবে সেটি অত্যন্ত কার্যকর বিষঘ্নের কাজ করে।

মেথানল (Methanol/Methyl alcohol) প্রাথমিক শুশ্রুষার নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়াও একগ্লাস জলে দু চামচ সোডিয়াম বাইকার্বোনেট মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ক্ষারজাতীয় মিশ্রণ (Alkalies, Caustic) বাহ্যিক ব্যবস্থা—প্রাথমিক শুশ্রুষার নির্দেশবলী অনুসরণ করতে হবে।

অন্তঃস্থ ব্যবস্থা—বমি করাবার ব্যবস্থা করা উচিত নয়।

প্রচুর পরিমানে লেবুর রস জলে মিশিয়ে প্রয়োগ অথবা এর পরিবর্তে ১% অ্যাসিটিক অ্যাসিডের পাতলা মিশ্রণ অথবা ১% সাইট্রিক অ্যাসিডের পাতলা মিশ্রণ বা ১ ভাগ ভিনিগার ৪ ভাগ জলে মিশ্রণ প্রয়োগ করা চলে।

এর পর দুধ অথবা জলে ডিমের সাদা অংশের মিশ্রণ খেতে দিতে হবে।

বেরিয়াম যৌগ—সঙ্গে সঙ্গে এক গ্লাস জলে দুই বড় চামচ ভর্তি ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের মিশ্রণ খেতে দিতে হবে। পরে দুধ অথবা জলে ডিমের সাদা অংশের মিশ্রণ খেতে দিতে হবে।

সায়ানাইড এবং অনুরূপ যৌগ—অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস হওয়ায় ব্যবহার এবং উদ্ধার কাজের সময় উপযুক্ত মুখোশ পরতে হবে।

এর বিষক্রিয়ার প্রতিকারে প্রাথমিক যেটা দরকার, সেটা দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, কারণ দেরী হয়ে গেলে প্রায় কিছুই করার থাকে না।

অবিলম্বে রোগীকে মুক্ত বাতাসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। রোগীর দূষিত পোষাক পরিবর্তন করে দিতে হবে। দেহের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখতে হবে (অর্থাৎ দেখতে হবে দেহের তাপমাত্রা যাতে না নেমে যায়)। শ্বাসকষ্ট দেখা দেওয়া মাত্রই মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

রুমালে অ্যামাইল নাইট্রাইট লাগিয়ে বার বার (৫/৬ বার) অল্প সময়ের জন্য (১৫ সেকেণ্ডের জন্য) রোগীর নাকের কাছে ধরতে হবে। এটি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবর্দ্ধক।

যদি রোগীর জ্ঞান থেকে থাকে, তবে তাকে ঈষদুষ্ণ লবণ জল প্রয়োগের মাধ্যমে বমি করাবার চেষ্টা করতে হবে। (জ্ঞান না থাকলে এধরণের কোন চেষ্টা করা উচিত নয়)।

ফরম্যালডিহাইড এবং অনুরূপ যৌগ—যদি রোগী এটি খেয়ে ফেলে থাকে তবে যথেষ্ট দুধ অথবা একগ্লাস জলে এক বড় চামচ ভর্তি অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেটের মিশ্রণ প্রয়োগ করতে হবে।

যথেষ্ট ঈষদুষ্ণ লবণজল প্রয়োগের মাধ্যমে বমি করাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সম্পূর্ণ বমি হয়ে যাবার পর দুধ এবং কাঁচা ডিম খেতে দিতে হবে রোগীকে।

সিসার যৌগ—অবিলম্বে জলে ১৫—৩০ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম সালফেট অথবা সোডিয়াম সালফেটের মিশ্রণ প্রয়োগ করতে হবে।

রোগীকে দুধ অথবা জলে ডিমের সাদার মিশ্রণ প্রয়োগ করতে হবে।

নিকোটিন এবং অন্যান্য উপক্ষার—কার্যকরী বিষঘ্ন—জলে ১ঃ ১০০০০ অনুপাতে (০·০১% শক্তি সম্পন্ন) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের মিশ্রণ।

সর্বাধিক বিষঘ্ন ব্যবহারেও ভাল ফল পাওয়া সম্ভব।

[illegible] যৌগ—যদি চামড়ার মাধ্যমে দেহে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে,

অংশ প্রভাবিত ত্বক যথেষ্ট সময় ধরে প্রচুর জল ব্যবহার করে ধুয়ে দিতে হবে। পরে ত্বকটি ৩% কপার সালফেটের (তুঁতে) মিশ্রণে ধুতে হবে যাতে অবশিষ্ট ফসফরাসের রেশ অপসারিত হতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ১ মিলিগ্রাম অ্যাট্রোপিন বড়ি প্রয়োগ করা উচিত। অত্যন্ত বেশী শ্বাসকষ্ট এবং হৃদপিণ্ডের দৌর্বল্য দেখা দিলে অ্যাট্রোপিন প্রয়োগ সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। দরকার হলে অক্সিজেন এবং হৃদযন্ত্রের উত্তেজক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। শ্বাসনালীও পরিষ্কার রাখা দরকার। বিষক্রিয়া যদি বিষ পেটে যাওয়ার সুরু হয়ে থাকে তবে ঈষদুষ্ণ জলে ৫% সোডিয়াম বাইকার্বোনেট মিশ্রণ সহযোগে পাকস্থলী ধোয়ার ব্যবস্থা করতে হতে পারে।

জিঙ্কের যৌগ—প্রাথমিক শুশ্রূষার সাথে ২৮·৫ গ্রাম মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া অথবা জলে ২/৩টি ডিমের সাদা অংশের জলে মিশ্রণ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন ও তার যৌগ—যথেষ্ট ঈষদুষ্ণ লবণজলের প্রয়োগের মাধ্যমে বমি করাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ডি ডি টি জনিত বিষ-ক্রিয়ায় কখনই দুধ অথবা ক্যাস্টর অয়েল জাতীয় কিছু খেতে দেওয়া উচিত নয়।

পারদঘটিত যৌগ—যথেষ্ট দুধ এবং প্রোটীন জাতীয় (যেমন কাঁচা ৬টি ডিম) খাদ্য ও পানীয় দিতে হবে। ২%—৫% সোডিয়াম বাইক্রোমেট মিশ্রণ প্রয়োগ করা দরকার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে। পাকস্থলীতে নলের সাহায্যে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সোডিয়াম সালফেট প্রয়োগ করতে হতে পারে। পাকস্থলী ধোয়ার ব্যবস্থা করতেও হতে পারে।

জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য যে সব উপকরণ মজুত রাখা উচিত

(১) **সর্বাত্মক বিষঘ্ন**—(Universal antidote) তৈরী করতে নীচের উপাদানগুলি ব্যবহৃত হয়—

অ্যাকটিভেটেড কাঠকয়লা	২ ভাগ
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া)	১ ভাগ
কড়া চা'য়ের লিকার (ট্যানিক অ্যাসিড)	১ ভাগ

এটি প্রায় সবধরণের বিষাক্ত পদার্থের বিষক্রিয়া কমাতে কমবেশী সাহায্য করে। যদি বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিকটি চিহ্নিত করা সম্ভব না হয়, তবে এর ব্যবহার জরুরী হয়ে পড়ে।

(২) খাবার উপযুক্ত মানের ফেরিক হাইড্রোক্সাইড, মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়া, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট, সোডিয়াম কার্বোনেট, সোডিয়াম সালফেট, পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল, ম্যাগনেশিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট, সাধারণ খাবার লবণ।

(৩) ১% অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ১% সাইট্রিক অ্যাসিড।

(৪) অ্যামাইল নাইট্রাইট ০ ৩ মিলিলিটার পার্ল।

(৫) ৩% কপার সালফেট (তুঁতে) মিশ্রণ।

(৬) ৫% সোডিয়াম বাইকার্বোনেট মিশ্রণ।

(৭) ৫% সোডিয়াম বাইক্রোমেট।

(৮) ১ ভাগ ভিনিগার এবং ২ ভাগ জলের মিশ্রণ।

(৯) অ্যাট্রোপিন সালফেট ০·৬ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট।

(১০) অ্যাকটিভেটেড্ কাঠকয়লা (charcoal)।

(১১) ৪% ট্যানিক অ্যাসিড মিশ্রণ।

(১২) ১% বোরিক অ্যাসিড মিশ্রণ।

গ্রন্থাগার ভবন এবং সংরক্ষণ সমস্যা

গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণ সরাসরি গ্রন্থাগারিকের কাজের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারিকের একটা বড় দায়িত্ব আছে। এখানে আমরা গ্রন্থাগার ভবন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে সব বিষয়গুলি সংরক্ষণের সাথে জড়িত শুধু মাত্র সেসব বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা আলোচনা করব।

ভবনের পরিকল্পনার সুরুতেই স্থান নির্বাচনের কাজটা এসে পড়ে। যদি ধরে নেওয়া যায় স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের থাকে, তবে চেষ্টা করতে হবে যে ঘিঞ্জি, শব্দবহুল, দূষণ প্রকোপিত অঞ্চল থেকে দূরে শান্ত, খোলামেলা, পরিচ্ছন্ন পরিবেশই বেছে নেবার কারণ তাতে কয়েকটি সংরক্ষণ সমস্যার সম্ভাবনা ও পরিমান প্রশমিত করা সম্ভব। কিন্তু যাতে শহরের সব প্রান্ত থেকে গ্রন্থাগারে যাতায়াতের যথেষ্ট সুবিধা থাকে, সে দিকেও নজর রাখতে হবে।

গ্রন্থাগার ভবনের পরিকল্পনার সময় সূর্যের আলো অর্থাৎ রোদের কথা সচেতন ভাবে চিন্তা করতে হবে। কারণ আমরা জানি কাগজ, চামড়া, পার্চমেন্ট, ভেলাম থেকে সুরু করে টেপ ইত্যাদি আধুনিক উপকরণ সবই আলোতে ক্ষতি-গ্রস্থ হয়, বিশেষ করে অতিবেগুনী রশ্মিতে। ক্ষতির পরিমান নির্ভর করে আলোর পরিমান এবং কতক্ষণ ঐ আলোর মধ্যে বস্তুটি রয়েছে তার উপর। সেজন্য ভবনের নক্সা করতে হবে এমনভাবে যাতে ঘরে রোদ না ঢোকে। যেক্ষেত্রে সেটা সম্পূর্ণ সম্ভব হয় না, সেখানে রোদ প্রতিহত করতে জানালার রঙ্গীন কাচ (হলুদ/সবুজ) ব্যবহারের মাধ্যমে অতি বেগুনী রশ্মির গ্রন্থাগারে ঢোকার পথ যতটা সম্ভব বন্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু তার ফলে দিনের বেলা গ্রন্থা-গারের ভেতরে হলদেটে বা সবজে আলো থাকে, সেটা বেশ দৃষ্টিকটু। আজকাল অবশ্য অতিবেগুনী রশ্মি শোষনকারী প্লাষ্টিকের পাতলা পাত (sheet) পাওয়া যায় যেটা জানলায় লাগালে তার মধ্যদিয়ে শুধু তাপহীন এবং অতি-বেগুনী রশ্মিহীন আলো ঘরে ঢুকতে পারে। আগে এই ধরনের জিনিষ বিদেশ থেকে আমদানী করা হ'ত কিন্তু বর্তমানে একটি ভারতীয় প্রস্তুতকারক (Garware Nylons) এটি আমাদের দেশেই তৈরী করছে। এই কারণে

এটি এখন অনেক সহজলভ্য এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচ সাপেক্ষ। এই ধরণের পাত শুধুমাত্র অতিবেগুনী রশ্মিই নয় রোদের তাপের একটা বড় অংশই শোষণ করে নেয়।

গ্রন্থাগার ভবন পরিকল্পনার সময় আর যে সব বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা দরকার সেটা হচ্ছে গ্রন্থাগারের নিরাপত্তা। এই ব্যাপারকে দুটি নির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করা যায় প্রথমটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে অর্থাৎ আগুন, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি, দ্বিতীয়টি মানুষের বিরুদ্ধে অর্থাৎ যারা বইয়ের ক্ষতি বা বই চুরি সাথে জড়িত।

আগুনের বিরুদ্ধে সতর্কতা

গ্রন্থাগার ভবনের পরিকল্পনার সময় আগুনের ব্যাপারে সতর্কতা নেবার বিষয় আলোচনার আগে গ্রন্থগারে আগুনের সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার। বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যানে দেখা যায় সাধারণ আগুনের ঘটনার তুলনায় গ্রান্থাগারে আগুনের ঘটনার সংখ্যা অনেক কম। মুখ্যতঃ এর কারণ দুটি, প্রথমতঃ যেসব কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটে তার অধিকাংশই গ্রন্থাগারের মধ্যে অনুপস্থিত। গ্রন্থাগার ভবনের সবচেয়ে সুবিধা এই যে সেখানে খোলা আগুনের ব্যবহার নেই। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থাগার কর্মী ও ব্যবহারকারীরা অন্যান্য সাধারণ জনসাধারণের চেয়ে বেশী সচেতন আগুনের বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে। তবু যেসব আগুনজনিত ক্ষতি গ্রন্থাগারে হয় তার উৎপত্তি মূলতঃ ভবনের বৈদ্যুতিক লাইনের অথবা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের গোলযোগ থেকে। এছাড়া অবশ্য ধূমপান আরেকটি বড় উৎস। শেষেরটির হাত থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় গ্রন্থাগার কর্মী এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী দু'পক্ষেই সচেতনতা ও সাবধানতা। আর বৈদ্যুতিক লাইন ও সাজসরঞ্জাম নিয়মিত ভাবে পরীক্ষা করাই ঐ ধরণের বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচার পথ। কিন্তু এতো গেল যাতে আগুন না লাগে সে ব্যাপারে সতর্কতা। আগুন একবার লেগে গেলে তাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্রন্থাগার ভবনে কি কি ব্যবস্থা থাকা উচিত, সেটা দেখা দরকার।

প্রথমেই আগুন লাগার উদ্ভূত বিপর্যয়ে যাতে প্রাণহানি না ঘটে তার জন্য যথেষ্ট জরুরীকালীন নিষ্ক্রমণ পথ থাকা দরকার, [illegible] প্রত্যেক কর্মীর যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। তাছাড়া ঐ ধরণের নিষ্ক্রমণ

পথ সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশক গ্রন্থাগারের বিভিন্ন প্রধান অংশে দেওয়া দরকার যাতে ব্যবহারকারীরাও এ ব্যাপারে জানতে পারে এবং প্রয়োজনে এর ব্যবহার করতে পারে।

আধুনিক গ্রন্থাগারিকরা গ্রন্থাগারের সংগ্রহ একই দিকে একের উপর আরেক তলায় রাখার বিরোধী, কারণ সেটা অগ্নিকান্ডের ভয়াবহতা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। আগুন বাড়ার বা ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে সবচেয়ে সহায়ক জিনিষটি হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণ বাতাসের সরবরাহ। সাধারণত লিফটের ফাঁক বা সিঁড়ির অংশ দিয়ে একতলা থেকে অন্যতলায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে, সেজন্য এগুলোকে গ্রন্থাগার সংগ্রহ যে অংশে আছে সে অংশ থেকে দূরে রাখাই ভাল।

ভবন নির্মাণের সময় লক্ষ্য রাখা দরকার আশেপাশের অট্টালিকার আগুন গ্রন্থাগার ভবনে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে। ভবনের দেওয়াল যতটা সম্ভব মজবুত এবং অগ্নিপ্রতিরোধক উপকরণে তৈরী করা সম্ভব, সেটাই করতে হবে। সাধারণভাবে কাঠ সহজদাহ্য অতএব দরজা আগুনে প্রথমেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটাকে ঠেকাবার জন্য দরজা/জানালায় যতটা সম্ভব অগ্নিনিরোধক রং ব্যবহার করা উচিত। বাজারে আজকাল কয়েকধরণের রং পাওয়া যায় যেগুলো আগুনকে অনেকক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারে। এখন বাজারে এক ধরণের কাঠও বেরিয়েছে যা বিশেষধরণের রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগের ফলে অগ্নিপ্রতিরোধ করতে সক্ষম, যদিও তার দাম সাধারণ কাঠের তুলনায় অনেক বেশী। একতলা থেকে তার উপরের তলার মাঝের ছাদ বা মেঝে যতটা অগ্নিনিরোধক হয় ততই ভাল। এক কথায় ভবন নির্মাণের সময় সবচেয়ে বেশী করে যে কথাটা মনে রাখা দরকার, সেটা হচ্ছে যে আগুনের প্রসারের ব্যাপারে যতটা দেরী করানো সম্ভব ততই উপকার, কারণ ঐ সময়টা আগুন নেবানোর কাজে অত্যন্ত মূল্যবান। ভবন নির্মানে যথাসম্ভব অগ্নিপ্রতিরোধক উপকরণই ব্যবহার করা উচিত, যদি সেটা আর্থিক সঙ্গতির বাইরে না হয়। অগ্নিনির্বাপনের ব্যাপারে নানা ধরণের ব্যবস্থার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

শেষ করার আগে সাধারণভাবে অগ্নিনির্বাপক দপ্তর ন্যূনতম যে কয়েকটি সাবধানতা নেবার নির্দেশ দিয়ে থাকেন সেগুলো উল্লেখ করা দরকার।

[illegible] জন্য

(১) প্রতি তলে (floor) বাতাস পরিবাহী পথ (air duct)-এর যথাযথ

ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে তার মধ্যে তাপ বা ধোঁয়া সৃষ্টি হলে সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় সচেতক এবং নির্বাপক ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়।

(২) ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে স্বয়ংক্রিয় অগ্নিসচেতক ব্যবস্থা চালু হলে শীতাতপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

(৩) অগ্নিসচেতক ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যাতে বিপর্যয় শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতাস ঢোকার সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

(৪) বাতাস পরিবাহী পথ (airduct) যেন কখনই সিঁড়ির পাশের দেওয়াল বেয়ে ওপরে বা নীচে না যায়।

(৫) শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বায়ু পরিস্রাবন অংশে (air filter) যেন কোন দাহ্যবস্তু ব্যবহৃত না হয়।

বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার জন্য

(১) বিদ্যুৎবাহী তার যে পথে যাবে সেটি এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে অন্তত এক ঘন্টা আগুন ঠেকিয়ে রাখার মত এর অগ্নিপ্রতিরোধক ক্ষমতা থাকে।

(২) জলের নল এবং টেলিফোনের লাইন যেন কোন অবস্থাতেই বৈদ্যুতিক লাইনের সঙ্গে বা পাশাপাশি না থাকে।

(৩) ভবনের সব বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থায় মোটা ধরণের লোহার পাইপ (heavy gauge steel conduit pipes) ব্যবহার করা দরকার যেটি ভাল ভাবে "আর্থ" করা থাকবে (continuously bonded to the earth)।

(৪) বিদ্যুৎবন্টন ব্যবস্থার সঙ্গে "তাৎক্ষনিক প্রবাহরোধকারী ব্যবস্থা" (instant ruptive circuit) যুক্ত থাকা প্রয়োজন যার মান ভারতীয় মানক সূচকের ন্যূনতম মানের অনুরূপ হয় (as per ISI norms)।

মাইক্রোফিল্ম/মাইক্রোফিস্ কক্ষের জন্য

(১) মাইক্রোফিল্ম/মাইক্রোফিস কক্ষ লাইব্রেরীর ভিতরের খাবার ঘর অথবা স্ন্যাকস্‌বার/চা পান ঘর থেকে দূরে হওয়া দরকার।

(২) ঐ কক্ষ বিশেষভাবে অগ্নিনিরোধক করে তৈরী করা দরকার যাতে দুঘন্টা পর্যন্ত আগুন ও ধোঁয়া প্রতিরোধের ক্ষমতা এর থাকে। এই ক্ষমতা শুধুমাত্র দেওয়ালের থাকলেই চলবে না দরজা ও জানালার ক্ষেত্রেও একই মানের হওয়া প্রয়োজন।

(৩) মাইক্রোফিল্ম বা মাইক্রোফিস্ সবসময় স্টীলের দেরাজে রাখা দরকার।

(৪) ঘরের বৈদ্যুতিক আলো/পাখা ইত্যাদির সুইচ ঘরের বাইরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

অগ্নিজ্ঞাপক ঘণ্টার ব্যবস্থা

ভবনের মধ্যে প্রতি তলে অন্তত দুটি করে অগ্নিজ্ঞাপক ঘণ্টা রাখতে হবে। ঘণ্টাগুলো এমনভাবে লাগাতে হবে, যাতে সেগুলোর কাছে সহজেই পৌঁছানো যায় ও প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়।

প্রাথমিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা

(১) প্রতি তলে এবং প্রয়োজনের প্রতি অঞ্চলে ছোট ছোট বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখতে হবে (৯ লিটার সোডা অ্যাসিড টাইপ, ৫ কেজি ডি. সি. পি. টাইপ, ৮½ কেজি কার্বন ডাইঅক্সাইড টাইপ)। সাধারণভাবে প্রতি ১০০ স্কো. মি. অঞ্চলে একটি হিসাবে মোট সংখ্যা ঠিক করতে হবে।

(২) সোডা অ্যাসিড টাইপ সাধারণ কাঠ, কাগজ, কাপড় ইত্যাদির আগুনের জন্য ব্যবহার্য (এটিতে জল ব্যবহৃত হয় নির্বাপক্ হিসাবে)।

(৩) যেসব জিনিষ জলে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে সেগুলোর জন্য ডি. সি পি টাইপ ব্যবহার করতে হবে।

(৪ ইলেক্ট্রিক লাইনের, মাইক্রোফিল্ম /মাইক্রোফিস কক্ষের আগুন নিভাবার জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড টাইপ ব্যবহার্য।

সাধারণ কয়েকটি নির্দেশ

(১) সম্ভব হলে বইপত্র স্টীলের তাকেই রাখা দরকার।

(২) ইলেকট্রিক লাইন থেকে অন্তত ১২" দূরে তাক স্থাপন করতে হবে।

(৩) দুর্লভ সংগ্রহ স্টীলের আলমারীতে রাখা দরকার।

(৪) গ্রন্থাগারের আসবাব পত্র নির্মাণে ল্যামিনেটেড শীটের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

(৫) গ্রন্থাগারে কাজ বন্ধ থাকাকালীন সময়ে বৈদ্যুতিক লাইন বন্ধ করে রাখতে পারলে ভাল হয়।

(৬) গ্রন্থাগার ভবনে যদি কখনও ছাইদানি ব্যবহার করা যায় তবে সেটা ঢাকনা দেওয়া ছাইদানি হওয়া উচিত।

(৭) সম্ভব হলে স্থানীয় অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের অফিসের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোন লাইন রাখতে হবে।

জল/বন্যার বিরুদ্ধে সতর্কতা

বন্যাজনিত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচবার জন্য, গ্রন্থাগার ভবন এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যাতে বন্যার জল ভবনের ভেতরে না ঢোকে। এজন্য ভবনের নক্সা করার আগে দেখে নিতে হবে গত কয়েক বছর (৫০ বছরের) মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার সময় ভবনের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে জল জমেছিল কিনা—যদি জমে থাকে তবে কতটা। তারপর তার চেয়ে আরও কিছুটা নিরাপদ উচ্চতা স্থির করে সেই অনুপাতে নক্সা রচনা করতে হবে। বিদেশে মাটির নীচে দুই এক তলা তৈরী করা হয়—আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত এধরণের বাড়ীর বড় একটা রেওয়াজ নেই। তবু জেনে রাখা দরকার যে ঐ ধরণের বাড়ী করার সময় এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে বন্যার জল ভূগর্ভস্থ তলাতে না ঢুকতে পারে। এর জন্য সবচেয়ে সহজ ব্যবস্থা যেটা নেওয়া যেতে পারে সেটা হচ্ছে ভবনের চারিদিকের জমিটা কিছুটা উঁচু করে নেওয়া যাতে সেটা বন্যার সবচেয়ে বেশী জলের সীমার উপরে থাকে। এছাড়াও ভূগর্ভস্থ তলায় প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে দেওয়াল দিয়ে জল প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও আমাদের সব সময়ই নজর রাখতে হবে যাতে পুস্তক মঞ্চের (stack) নীচের তাকের বইয়ে জল না পৌঁছোয় তবু সবচেয়ে ভাল হয়, যদি ভবনের মধ্যে জল একেবারেই না ঢুকতে পারে, কারণ ঘরে একটু জল ঢুকলেই সেটা ঘরের আবহাওয়ার আর্দ্রতার পরিমান যথেষ্ট বাড়িয়ে দেয়, ফলে ছত্রাকের আক্রমণ সুরু হতে পারে।

গ্রন্থাগার ভবনের ভেতরে জলের পাইপ যত কম থাকে ততই মঙ্গল, কারণ তারফলে ঐসব পাইপ ফেটে ক্ষতির আশংকাও কমে যায়।

মানুষজনিত ক্ষতির বিরুদ্ধে সতর্কতা

এবারে মানুষজনিত ক্ষতির ব্যাপারটা একটু দেখা যাক। সাধারণভাবে গ্রন্থাগার ভবনে ঢোকা বা বাইরে যাবার জন্য একটা মাত্র পথই ব্যবহার করা দরকার, কারণ পথের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথেই সুরক্ষা বিঘ্নিত হবে। ঐ পথ এমন ভাবে করা হবে যাতে সেখানে নজর রাখা সহজ হয় এবং যেখানে সুরক্ষা কর্মী বসায় এবং ব্যাগপত্র জমা রাখার উপযুক্ত জায়গা (counter) থাকে।

বই চুরি বন্ধ করার দুটি প্রধান পথ—যথেষ্ট উপযুক্ত নজরদারীর ব্যবস্থা এবং ফাইল, ব্যাগ, ব্রিফকেস্ ইত্যাদি গ্রন্থাগারের প্রবেশপথে জমা রাখার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা। জমা রাখার ব্যাপারটা গ্রন্থাগার কর্মী এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী দুপক্ষের জন্যই সমান ভাবে প্রযোজ্য।

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রযুক্তির মাধ্যমে বই চুরির বিরুদ্ধে কয়েক ধরণের নিরোধক (checking) ব্যবস্থা (যান্ত্রিক) বিদেশে চালু আছে, যার অধিকাংশই যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ। ঐ সব যন্ত্রের প্রয়োগের পরিকল্পনা থাকলে ভবন নির্মাণের সময়ই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে ভাল হয় কারণ ঐ ক্ষেত্রে বাইরে যাবার পথের প্রস্থ কখনই ৩ ফুটের বেশী হওয়া সম্ভব নয় এবং তার একপাশে যন্ত্রবসার উপযুক্ত বেশ খানিকটা জায়গা এবং ঠিক বিপরীতে বিশেষ পর্দার জন্য কিছুটা জায়গা থাকা দরকার।

আমাদের দেশে এখনই এই ধরণের যন্ত্রের প্রয়োগ প্রায় অসম্ভব, খরচের কথা মনে রেখে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদি গ্রন্থাগারের যে পরিমান বই হারাবার ঘটনা ঘটে তার বিরুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে ফলপ্রসূ পথ বোধহয় যথেষ্ট সচেতন, কর্তব্যনিষ্ঠ সুরক্ষা কর্মী/দ্বাররক্ষী নিয়োগ। অবশ্য তাদের কাজ সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রান্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের করতে হবে। ব্যাগ ইত্যাদি ছাড়াও গেটে ছাতা, বর্ষাতি ইত্যাদি জমা রেখে তার বদলে প্রতীক (token) দেবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই পদ্ধতির উপযোগিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে দ্বাররক্ষীর কর্তব্যপরায়ণতার উপর। যদি কখনও কোন ব্যবহারকারীর নিয়মের অবহেলার ঘটনা ধরা পড়ে, তবে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, নতুবা দ্বাররক্ষীর কর্তব্যের প্রতি আগ্রহ এবং মনোবল দুইয়ের উপরই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটবে। এর সঙ্গে যদি সঠিক কর্তব্যপরায়ণতার জন্য কর্মীকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তবে নিঃসন্দেহে ভাল। পুরস্কার যে কোন রকমেরই হতে পারে—সেটা যে আর্থিকই হতে হবে, তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এমনকি কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ একটি প্রশংসাপত্রও এক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান, এবং সম্ভব হলে উপযুক্ত কালে চাকরীর ক্ষেত্রে উন্নতির (promotion) ব্যাপারে বিবেচনার সময় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

বইয়ের পাতা কাটা বা অন্যান্য ক্ষতি: এই ধরণের ক্ষতিকে আমরা আবার দুভাগে ভাগ করতে পারি, একটি গ্রন্থাগারের ভিতরে সংঘটিত অন্যটি বাইরে।

গ্রন্থাগার থেকে বই বাইরে নিয়ে যাবার পর যে ক্ষতি করা হয় সেটা সহজে নজর এড়িয়ে যেতে পারে। যেসব বইয়ে অনেক মূল্যবান ম্যাপ, নকশা, ছবি ইত্যাদি আছে সেগুলো ফেরৎ আসার সঙ্গে সঙ্গে ভাল করে দেখে নিতে হবে, সবকিছু ঠিক আছে কিনা। ঠিক তেমনি বাইরে যাবার সময় ব্যবহারকারীর ও গ্রন্থাগার-কর্মীর মিলিত দায়িত্ব বই দেখে দেওয়া ও নেওয়া। বইয়ে যদি কোন ত্রুটি থাকে তবে সেটা বইয়ের মধ্যেই উপযুক্তভাবে লিপিবন্ধ করে রাখতে হবে। যদিও এইভাবে বই লেনদেন করা সময় সাপেক্ষ তবু মূল্যবান ছবি সম্বলিত অথবা ঐ ধরণের বইয়ের ক্ষেত্রে সেই সব অসুবিধা স্বীকার করে নিতেই হবে—উভয়পক্ষের অযথা অপমানকর পরিস্থিতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার প্রয়োজনে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে যেসব বই মূল পাঠ্যবই হিসাবে ব্যবহৃত সেক্ষেত্রেও সম্ভবমত ভাল করে দেখে দেওয়া-নেওয়া করা উচিত; কারণ ফেরৎ নেওয়ার সময় প্রায়ই দেখা যায় প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা/পৃষ্ঠাসমূহ কেটে নেওয়া হয়েছে। সব বই দেবার/ফেরৎ নেবার সময় সর্বদা নির্ভুলভাবে পরীক্ষার কাজ করা যায় না, একথা মেনে নিয়েও বলতে হবে যে যতটা সতর্কতা নেওয়া সম্ভব, আমাদের মত অভাব তাড়িত দেশে ততটাই ভাল।

গ্রন্থাগারের ভিতরে এই ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যও উপযুক্ত নজরদারী দরকার। নজরদারীর জন্য বিশেষ কয়েকজনের নিযুক্তির তুলনায় যদি গ্রন্থাগারের সব কর্মীই মাঝে মাঝে "ভ্রাম্যমান নজরদারের" দায়িত্ব নেন তবে বেশী ভাল ফল পাওয়া যায়, কারণ কোন ব্যবহারকারীকে হাতেনাতে ধরাটা বড় কথা নয়—বড় কথা হচ্ছে ব্যবহারকারীদের সচেতন করে দেওয়া যে কোনরূপ স্বার্থপর তথা ক্ষতিকর আচরণের বিরুদ্ধে সতর্ক নজরদারী চালু আছে। এ ব্যাপারে একটা কথা বলে নেওয়া ভাল সেটা হচ্ছে খুব সাধারণভাবে পাঠকক্ষের (reading room) মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যদি কোন পাঠককে বই ব্যবহার বা অন্য কোন ব্যাপারে তার ত্রুটি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তবে কয়েকদিনের মধ্যেই পাঠকদের মধ্যে নজরদারী সম্বন্ধে সচেতনতা এসে যায়। কখনও একই সময় বা একই পথে বারবার যাতায়াত না করা সমীচীন। অনেক গ্রন্থাগারে দেখা যায় কোন পাঠক অশোভনভাবে চেয়ারে পা তুলে বা অনাবশ্যক ভাবে বইয়ের মলাট মুড়ে পড়ছে বা বইয়ের উপর কাগজ রেখে লেখালেখি করছে, সঙ্গে সঙ্গে তার পার্শ্বে গিয়ে তার ভুল বুঝিয়ে দিয়ে সংশোধন করে দিতে হবে। এর একটা সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে যার ফলে বড়

পাঠকদের অন্যায় আচরণ—যথা বই চুরির ক্ষেত্রেও কিছুটা সুফল আশা করা যেতে পারে।

গ্রন্থাগার ভবন পরিকল্পনার সময়, বিভিন্ন বিভাগের বিন্যাস চিন্তা করে এমনভাবে নক্সা করা উচিত যাতে দুর্লভ বা মূল্যবান সংগ্রহ যেখানে বসে ব্যবহার করা হবে সেটা যেন গ্রন্থাগারিক বা পদস্থ গ্রন্থাগার কর্মীদের নজরের মধ্যে থাকে। বর্তমানে বিদেশের মত আমাদের দেশের কোন কোন গ্রন্থাগারে নজরদারীর সুবিধার জন্য ক্লোজড্ সার্কিট টেলিভিশন (closed circuit television) সিস্টেমের ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এটি চালু করা যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ, কিন্তু বড় বড় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগে যথেষ্ট সুফল পাওয়া সম্ভব। এর উপস্থিতি ব্যবহারকারীদের উপর একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যেটা গ্রন্থাগারের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। CCTVর প্রধান অসুবিধা হচ্ছে এই যে একটা ক্যামেরা যেহেতু একটা বিশেষ অঞ্চলের ওপরই নজর রাখতে সক্ষম, সেজন্য গ্রন্থাগারের সব দিকে সমানভাবে নজর রাখার জন্য বেশ কয়েকটা ক্যামেরার দরকার হয়, তার সঙ্গে কয়েকটা স্ক্রিন বা একই স্ক্রিনে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যামেরার ছবি নেবার ব্যবস্থা রাখা দরকার হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই এগুলো খরচসাপেক্ষ।

মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ সব সময়ই আলাদাভাবে সুরক্ষিত ঘরে বন্ধ করে রাখা উচিত। প্রয়োজন হলে গ্রন্থাগারিক বা দায়িত্বশীল গ্রন্থাগারকর্মীর সামনে সেগুলো ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। যেক্ষেত্রে মনে হবে যে ব্যবহারের ধকল সহ্য করার মত অবস্থা সংগ্রহের নেই, সেক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থার —যেমন আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিলিপিকরণের (reprographic copy) মাধ্যমে কাজ চালাতে হবে। এই ধরণের প্রতিলিপিকরণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে। দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান সংগ্রহের ঘর এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে বন্যা, আগুন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বা অন্য দুর্বিপাকে সহজে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সাধারণত গ্রন্থাগারে ডাকাতি/বড় রকমের চুরি সচরাচর হয় না কারণ চোর/ডাকাতদের মধ্যে বোধ হয় জ্ঞানপিপাসাটা যথেষ্ট প্রবল নয়। ইংলণ্ডে একসময় এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে জেলে কয়েদীদের মধ্যে সেক্সপীয়ারসহ সৎসাহিত্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিক ভাবেই সেই সময় মৃদু গুঞ্জন উঠে, তবে কি এযুগে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা বেশী করে অপরাধপ্রবণ (criminal

হচ্ছে না কি জাত অপরাধীরাও বাধ্যতামূলকভাবে অসামাজিক কাজ থেকে বিরতি পেলে সৎসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। কোন দক্ষ চোর বা ডাকাত রোজ কোন গ্রন্থাগারে সদ্গ্রন্থের সান্নিধ্যে দিন যাপন করে নিজ আবাসে ফিরে যায়, এরূপ কোন বিচিত্র কাহিনীর তদন্ত শার্লক হোমসও করেছিলেন বলে জানা নাই। সে যাই হোক যেসব গ্রন্থাগারে যথেষ্ট মূল্যবান সংগ্রহ আছে তাদের তো বটেই—অন্য সব গ্রন্থাগারেরও কয়েকটি ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন দরকার যেমন—(১) গ্রন্থাগারে ঢোকার দরজা যথেষ্ট মজবুত হতে হবে। (২) জানালা-গুলো শক্তভাবে বন্ধ করার সুবন্দোবস্ত থাকা চাই এবং জানালার পাল্লাগুলো যথেষ্ট মজবুত হওয়া উচিত। (৩) চারিদিকের দেওয়াল যথেষ্ট মজবুত হওয়া দরকার। নীচের তলার জানালায় গ্রীল লাগানো থাকলে সেটি আরো সুরক্ষিত হয়। (৪) গ্রন্থাগারে দৈনন্দিন কাজকর্মের পরেও যথেষ্ট পাহারার ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিদেশে গ্রন্থাগারের বিশেষ বিশেষ অংশে অদৃশ্য আলো বা শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পাহারার ব্যবস্থা করা হয়, যার মাধ্যমে গ্রন্থাগার বন্ধ থাকাকালীন কোন অবাঞ্ছিত লোক ঢুকলে বিপদজ্ঞাপক সংকেত বেজে উঠে।

গ্রন্থাগার ভবনের উপরে সব সময় বজ্রনিরোধক ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে বজ্রপাতজনিত অগ্নিকাণ্ড বা অন্যান্য ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে।

যেসব অঞ্চলে প্রায়ই ভূমিকম্প হয় বা হবার সম্ভাবনা থাকে সেখানে ভবনের নক্সা বানানোর সময় সেদিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে কিনা সেটা গ্রন্থাগারিকের লক্ষ্য করা উচিত।

যেসব অঞ্চল ঘরবাড়ী প্রায়ই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেখানকার ভবনের নক্সা এমনভাবে তৈরী করা দরকার যাতে ঐ ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সইবার ক্ষমতা এর থাকে। এসব অঞ্চলে হাল্কা ধরণের বাড়ী বানানো কোন ভাবেই উচিত নয়।

সংরক্ষণের সহায়ক পরিবেশ রচনা

গ্রন্থাগার সংগ্রহের শত্রু সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা দেখেছি কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় ছত্রাক, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির আক্রমণ এবং তার বিস্তার সম্ভব নয়। যদি গ্রন্থাগারের ভিতরের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত করে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে বেঁধে রাখা যায় তবে গ্রন্থাগারের সংরক্ষণের অনেক সমস্যারই সহজ সমাধান করা সম্ভব। সংরক্ষণের সহায়ক ঐ সীমারেখা হল তাপমাত্রার ক্ষেত্রে ২২° থেকে ২৫·৫° সেঃ (অর্থাৎ ৭২° থেকে ৭৮° ফারেনহাইট) এবং আর্দ্রতার ক্ষেত্রে ৪৫% থেকে ৫৫%।

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই ধরণের নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে পরিবেশকে বেঁধে রাখার একমাত্র পথ শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া। কিন্তু এই ধরণের ব্যবস্থা চালু করা, এমনকি চালু রাখাও যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ। শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাপ এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও ঘরের ভেতরের বাতাসে ধুলোবালি, ক্ষতিকারক গ্যাস এবং অম্লতাও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ঘরের মধ্যে যে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকবে সেটাকে ক্ষার জলের (alkaline water) মধ্য দিয়ে চালিত করে এইসব সুফললাভ করা সম্ভব।

আধুনিকতম শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রন্থাগারিকের হাতে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ানিয়ন্ত্রণের অত্যন্ত ভাল অস্ত্র তুলে দিয়েছে। আগে যে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বিলাসিতার সামগ্রী হিসাবে ভাবা হ'ত, আজ নানা অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষানিরীক্ষার ফল স্বরূপ বুঝতে পারা গেছে যে, এটি দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান বইপত্র, পুঁথি এবং গ্রন্থাগারের আরো কিছু আধুনিক সামগ্রী যেমন মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস্, অডিও টেপ, গ্রামাফোন রেকর্ড, ভিডিও টেপ ইত্যাদি সংরক্ষণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, প্রায় অপরিহার্য। এটা অনস্বীকার্য যে সারানোর (restoration) চেয়ে সংরক্ষণই (preservation) বেশী কাম্য। সে কারণে রাসায়নিক এবং ছত্রাক কিংবা কীট-পতঙ্গ জনিত ক্ষতির প্রতিরোধে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত।

কাগজ বা বই সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তাপমাত্রা হ'ল ১৯° থেকে ২৩° সেঃ এবং আর্দ্রতার পরিমান ৪৫% থেকে ৫৫% ।

বিলাতের একটি সরকারী সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে "প্রথমতঃ আবহাওয়ায় ভেসে বেড়ানো ধুলো ময়লার মত কঠিন পদার্থ এবং তরল অবস্থায় অথবা গ্যাসীয় অবস্থায় উপস্থিত অ্যাসিড বই পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির প্রচণ্ড ক্ষতি করে এবং বিশেষ অবস্থায় এই সব পদার্থ কাগজ, চামড়া, ভেলাম ইত্যাদি সম্পূর্ণ ধ্বংসও করতে পারে। গ্রন্থাগার ভবনেরও অপূরণীয় ক্ষতি করা অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ বৃটেনের মত দেশে তাপমাত্রায় এবং আর্দ্রতার অত্যধিক ওঠা-নামা ক্ষয়ক্ষতিকে ত্বরান্বিত করে এবং তারই সঙ্গে নতুন কয়েকটি বিপদও ডেকে আনে, যেমন ছত্রাক, বীজাণু। এসব কারণে গ্রন্থাগারের বইপত্র এবং অন্যান্য সংগ্রহের সংরক্ষণের সবচেয়ে উপযোগী এবং অপরিহার্য পরিবেশ হচ্ছে ধুলোবালি এবং সবধরণের অ্যাসিড মুক্ত এমন আবহাওয়া যার আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা একটি বিশেষ মাত্রার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত। এই ধরণের আবহাওয়া সৃষ্টি একমাত্র সম্পূর্ণ শীতাতপনিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার প্রয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব (যেখানে ফিল্টারের মাধ্যমে কঠিন পদার্থ, যেমন ধুলোবালি, জলে ধোয়ার মাধ্যমে তরল এবং গ্যাসীয় অ্যাসিড অপসারিত করে, অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়)। বিশেষভাবে যেখানে আবহাওয়া অধিকতর দূষণযুক্ত এবং যেখানে সংগ্রহ গ্রন্থাগার ভবনের সর্বত্রই ছড়িয়ে রাখা আছে, সেক্ষেত্রে সংগ্রহের সঠিক এবং যথাযথ সংরক্ষণ কেবলমাত্র সম্পূর্ণ শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব।"*

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে প্রধান কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে, যথা বাতাসে ভেসে বেড়ানো কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবাঞ্ছিত বস্তু অপসারণ, বাতাসের আর্দ্রতা ও তাপ নিয়ন্ত্রণ। তাপ নিয়ন্ত্রণের আবার দুটো দিক আছে গরম আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা করা এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় গরম করা। গরম করার পথে কয়েকটি সমস্যা দেখা যায় যেমন দেওয়াল এবং ছাদ যদি যথাযথভাবে তাপ অপরিবাহী করে নেওয়া না হয়, তবে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট গরম বাতাসের অনেকটা তাপই ঐসব পথে বিকিরিত হবার ফলে যথেষ্ট জ্বালানীর

---

* University Grants Committee. Report of the committee on libraries : the Parry report. London. HMSO. 1967.

অপচয় হয়। ঠাণ্ডাই হোক আর গরমই হোক সেটাকে ভালভাবে ঘরের মধ্যে ধরে রাখার জন্য ঘরে জানালা বা বাতাস চলাচলের পথ যতটা কম থাকে ততই ভাল। গ্রন্থাগারের শীতাতপনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় (centralised) শীতলীকরণ / উত্তাপন ব্যবস্থাই অন্য পদ্ধতির তুলনায় অনেক কম খরচ-সাপেক্ষ। তপ্তকরণের জন্য গরম বাতাসে ব্যবহারে অসুবিধা হচ্ছে যে এরজন্য যথেষ্ট বড় গরম বায়ুবাহিপথ প্রতি ঘরে রাখা যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ এবং অনেকক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু। কিন্তু গরম বাষ্প ব্যবহারেও অসুবিধা অনেক। সেকারণে কম চাপে গরমজল ছাদে ও মেঝের নির্দিষ্ট অংশের মধ্য দিয়ে চালিত করে ঘর গরম করার পদ্ধতি কম খরচ সাপেক্ষ, উপযুক্ত এবং নিরাপদও বটে। এখানে অবশ্য কিছুটা সাবধানতার প্রয়োজন আছে, যাতে জলের নল (pipe) থেকে জল বেরিয়ে সংগ্রহের কোন ক্ষতি না করতে পারে।

জ্বালানী নির্বাচনের ব্যাপারে দূষণ, খরচ, উপযোগিতা ইত্যাদির দিকে নজর দিয়ে যথেষ্ট সচেতন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

শীতলীকরণের জন্য জ্বালানী হিসাবে বিদ্যুতের ব্যবহারই সবচেয়ে উপযোগী। তেলযুক্ত ফিল্টার পর্দার মাধ্যমে বাতাসচালিত করে বাতাসের মধ্যেকার কঠিন পদার্থ যেমন ধুলোময়লা সম্পূর্ণ অপসারণ সম্ভব। জলের ধারার মাধ্যমে ধুয়ে বাতাসের মধ্যেকার তরল এবং গ্যাসীয় দূষণজাত ক্ষতি-কারক পদার্থ দূর করা ছাড়াও, অত্যন্ত শুষ্ক হাওয়ার ক্ষেত্রে আর্দ্রতা বৃদ্ধি সম্ভব। মোটা কাপড়ের ফিল্টারের ব্যবহারও চালু আছে বাতাসকে পরিশ্রুত করার জন্য। বৈদ্যুতিক তরঙ্গের ব্যবহারের মাধ্যমেও বাতাসে ভাসমান কঠিন পদার্থ অপসারণ সম্ভব।

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় শীতলীকরণ যন্ত্রের (refrigeration unit) মাধ্যমে যখন বাতাসকে পরিচালিত করা হয়, তখন উপস্থিত অতিরিক্ত আর্দ্রতা প্রথমে জলকণায় ও পরে তুষারকণায় পরিণত হয়ে বাতাস থেকে আলাদা হয়ে যন্ত্রের ঐ অংশেই থেকে যায়। এছাড়াও বাতাস তার অতিরিক্ত তাপমাত্রা হারায়। এরপর নির্দিষ্ট তাপ ও আর্দ্রতা সম্বলিত বাতাসকে ভবনের মধ্যে প্রবাহিত করানো হয়।

শুষ্ক বাতাসে আর্দ্রতা বৃদ্ধি ব্যবস্থা সহজেই করা যায়। অগভীর ছড়ানো পাত্রে রাখা জলের উপর দিয়ে শুকনো বাতাস চালিত করলে সহজেই বাতাস আর্দ্রতা সংগ্রহ করে নিতে পারে।'

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রন্থাগার সংগ্রহের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী, কিন্তু সেটি ত্রুটিপূর্ণ হলে অপরিসীম ক্ষতির কারণ হতে পারে। সারাদিন রাত একই তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা সুনিশ্চিত করা খুবই প্রয়োজনীয়। তাপ মাত্রা অতিরিক্ত ওঠানামা করলে কাগজপত্রের যে সঙ্কোচন এবং প্রসারণ ঘটে তাতে সংগ্রহের শক্তি ও স্বাস্থ্যের হানি ঘটে। আর্দ্রতা অত্যধিক কম হলে প্যাপিরাস, কাগজ ইত্যাদি ভঙ্গুর হয়ে যায়, ভেলাম এবং চামড়াও নমনীয়তা হারিয়ে ভঙ্গুর হতে পারে। ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে সংগ্রহের বয়স, তার অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রের ওপর।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে আমেরিকার প্রায় সব গ্রন্থাগারেই কেন্দ্রীয় শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু আছে। ইউরোপের ছবিটা কতকটা অনুরূপ। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের ছবি সম্পূর্ণ বিপরিত। প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা স্থাপনের এবং চালু রাখার জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তার অভাবই এর প্রধান কারণ। যদিও অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এই ধরণের ব্যবস্থা এদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়। কিন্তু সীমিত আর্থিক অবস্থার কারণে তাদের পক্ষে শীতাতপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশের মোট গ্রন্থাগারের মধ্যে শতকরা একভাগেও এই ব্যবস্থা চালু নেই। সীমিত আর্থিক সঙ্গতিই এরজন্য দায়ী, যদিও কয়েকটি গ্রন্থাগারের অমূল্য দুঃপ্রাপ্য সংগ্রহের দামের সঙ্গে এই ব্যবস্থা চালু করার খরচের কোন তুলনা করা উচিত নয়। কিন্তু গ্রন্থাগারের আর্থিক সামর্থ্য এতই সীমিত যে সাধারণ ন্যূনতমভাবে গ্রন্থাগার চালু রাখতেই সেটা সম্পূর্ণ খরচ হয়ে যায়। আমাদের দেশে সেকারণে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভেবেচিন্তেই নিতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে আর্থিক সামর্থের অভাবই গ্রন্থাগার ভবন শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের পথে প্রধান বাধা—অনেক গ্রন্থাগারে কিছু সংগ্রহ থাকে, তাকে সংরক্ষণের জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রণ প্রায় অপরিহার্য। সেক্ষেত্রে ঐ সব সংগ্রহ, যার বিশেষ যত্নের প্রয়োজন সেগুলোকে সরিয়ে গ্রন্থাগারের ছোট্ট একটা নির্দিষ্ট ঘরে রাখা দরকার যেটিকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম খরচে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করে নেওয়া সম্ভব। ঐ কক্ষটি দুর্লভ সংগ্রহ বিভাগ (Rare Collection section) হিসাবে চিহ্নিত করা চলে।

প্রচণ্ড খরচ সাপেক্ষ হওয়া ছাড়াও শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কয়েকটি

অসুবিধা রয়েছে আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারের ভেতরে তাপমাত্রা যেহেতু ২১°সেঃ এর আশেপাশে থাকে অথচ গ্রীষ্মকালে বাইরের তাপমাত্রা ৪০°সেঃ এর কাছে পৌঁছে যায়। তখন গ্রন্থাগারের কর্মী এবং ব্যবহারকারীদের গরম আবহাওয়া থেকে ঠাণ্ডা ঘরে ঢোকা বা কাজের পরে ঠাণ্ডা থেকে গরম আবহাওয়ার মধ্যে বেরহওয়া জনিত যে শারীরিক ক্ষতি হয় তার কোন প্রতিকারের পথ এখনো নির্দেশ করা সম্ভব হয় নাই। এই অবস্থার প্রতিকার হিসাবে অনেকে পরামর্শ দেন যাতে কাজের জায়গা (working area) ও পাঠকক্ষ (reading room) শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতার বাইরে রাখা ভাল। কিন্তু কিছু কর্মীকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য গ্রন্থাগারের ঠাণ্ডা অঞ্চলে থাকতেই হবে। বিদেশে অনেক ক্ষেত্রেই কর্মীদের বাসস্থানেরও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে সেটা একটি অসম্ভব ব্যাপার।

গ্রন্থাগার ভবন সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে ভবনে কয়েকটি সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয়, যথা সীমিত সংখ্যক জানলা, দরজা এবং দেওয়াল, ছাদ ইত্যাদির তাপ পরিবহন ক্ষমতার সীমিতকরণ ইত্যাদি। সেকারণে নতুন ভবনে, যদি সেটি যথাযথভাবে তৈরী করা হয় তবে, এই ব্যবস্থা চালু করা অপেক্ষাকৃত সহজ—অবশ্য পুরানো ভবনেও এটি চালু করা সম্ভব, ভবনের প্রয়োজন অনুসারে কিছু রদবদল করার পর—যদিও সেটা কিছু খরচ সাপেক্ষ হওয়া সম্ভব।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে অন্তত চারটি ক্ষেত্রে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সুফল দিতে পারে—যেমন তাপমাত্রার যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, আর্দ্রতার নিয়ন্ত্রণ, বায়ু চলাচলে সঠিক ব্যবস্থা, বাতাসের যথাযথ পরিশ্রুতিকরণ (filtaratio n) যার মাধ্যমে বাতাসবাহিত অম্লতাকারক পদার্থ, ধুলোময়লা, দূষণজাত গ্যাস ইত্যাদির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।

বাতাসের অক্সিজেন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু এটি গ্রন্থাগারের সংগ্রহের কাগজ, চামড়া, ফিল্ম ইত্যাদির পক্ষে বিপজ্জনক এবং যথেষ্ট ক্ষতিকারক। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এই যে, ফিল্ম এবং কয়েকধরণের প্লাষ্টিক এবং ঐ জাতীয় বস্তু ছাড়া অন্য সব জিনিষের ওপর এই ক্ষতি খুবই ধীরগতিতে হয়।

শীতাতপনিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে বলা চলে যে এর মাধ্যমে সংগ্রহের সংরক্ষণের

শতকরা ৭৫/৮০ ভাগ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এর জন্য ব্যায়িত অর্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমানকে নগন্য স্তরে নামিয়ে আনে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বলা চলে, যেসব গ্রন্থাগারের আর্থিক সামর্থ্য আছে, তাদের পক্ষে এটি একটি আর্থিক সাশ্রয়কারী ব্যবস্থা।

কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারের পক্ষে যেহেতু এটি প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, দেখতে হবে অন্যান্য কোন কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রন্থাগারের পরিবেশের উন্নয়ন করা সম্ভব। গ্রীষ্মের অত্যন্ত শুকনো গরম আবহাওয়ার সংগ্রহ যে অঞ্চলে রাখা হয়েছে (stack area) সেখানের আর্দ্রতার মাত্রা অত্যাধিক যাতে না নেমে যায়, তারজন্য ছড়ানো স্বল্প গভীরতা সম্পন্ন ট্রে বা পাত্রে (shallow wide surfaced tray) কিছু দূরে দূরে জল রেখে দিলে আর্দ্রতার খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পাত্রের সংখ্যা নির্ভর করে ঘরের আয়তন এবং আর্দ্রতার পরিমানের উপর।

বর্ষাকালে বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা যখন অত্যন্ত বেড়ে যায় তখন জলের ট্রের বদলে পিরিচে করে আর্দ্রতানিরোধক রাসায়নিক (dehumidifing chemical) যথা অ্যানহাইড্রাস ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, অ্যানহাইড্রাস বক্সাইট, সিলিকা জেল, অ্যাক্টিভেটেড্ অ্যালুমিনা ইত্যাদি ঘরের নানা জায়গায় রেখে দিতে হবে। এই সব পদার্থ বাতাসের আর্দ্রতা শুষে নেয়। কতটা রাসায়নিকের প্রয়োজনে সেটা নির্ভর করে ঘরের আয়তন, তাপমাত্রা, বাতাস চলাচলের অবস্থা, আর্দ্রতার পরিমানের উপর। ব্যবহারের সুবিধা ও খরচের পরিমানের কথা বিবেচনা করে বলা চলে সিলিকা জেলই এব্যাপারে সবচেয়ে উপযোগী। মোটামুটি ৬০০ থেকে ৮০০ কিউবিক মিটার পরিমান আয়তনের ঘরের পক্ষে ১·৭৫ থেকে ২ কেজি সিলিকা জেলই যথেষ্ট। অত্যাধিক আর্দ্র আবহাওয়ায় প্রতি ৩/৪ ঘণ্টা পর পর পুরোনো সিলিকা জেল সরিয়ে নিয়ে নতুন রাসায়নিক দিতে হবে। ব্যবহৃত সিলিকজেল ৯৫° সেঃ তাপমাত্রায় গরম করে নিলে শুষে নেওয়া জল উবে গিয়ে সেটি আবার ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠবে। প্রাথমিক খরচের হিসাবে অ্যানহাইড্রাস ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের তুলনায় সিলিকা জেল বেশী খরচ সাপেক্ষ হলেও শেষ পর্যন্ত সিলিকা জেলই সস্তা পড়ে, কারণ এটি সহজেই পুনঃব্যবহারের উপযোগী করে নেওয়া চলে, যেটি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আজকাল যান্ত্রিক উপায় আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিও চালু হয়েছে।

সংগ্রহের পক্ষে আর্দ্রতার সঙ্গে বদ্ধবাতাস অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে,

কারণ ঐ অবস্থায় ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ এবং ছত্রাক দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এদিক থেকে গ্রন্থাগারের সর্বত্র বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। ঘরে যথেষ্ট জানালা এবং বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার, এর অভাবে মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক পাখা চালিয়ে বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা আবহাওয়ার এবং আর্দ্রতার বিরুদ্ধে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মাধ্যমে (room heater) কিছুটা সমাধান করা চলে। এ ধরণের উপকরণের ব্যবহারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার যথা লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বইপত্র এর খুব কাছে না থাকে, কারণ সেক্ষেত্রে ঐগুলো বেশী গরম হয়ে তার স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারাতে পারে। এমন কি আগুন লাগার সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে ঘরের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম না করে। যথেষ্ট জানালা ইত্যাদি রাখার ব্যাপারে মনে রাখা দরকার সেটা যাতে আবার ধুলোবালি, ময়লা, দূষণজনিত পদার্থের সমস্যার সৃষ্টি না করে।

আমরা আগেই দেখেছি যে আলোক তরঙ্গ সমষ্টির একটি অংশ—যার মধ্যে অতিবেগুনী রশ্মি পড়ে—গ্রন্থাগার সংগ্রহের পক্ষে ক্ষতিকারক। সাধারণ টিউব লাইটেও (fluorescent light) যথেষ্ট পরিমাণে অতিবেগুনী রশ্মি থাকে। সংগ্রহ যে অঞ্চলে বা কক্ষে রাখা হয়েছে সেখানে সর্বদা টিউব লাইট জ্বালানো থাকলে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—সেজন্য প্রয়োজনের সময় ছাড়া বাতিগুলো নিভিয়ে রাখা যেতে পারে। যদি দেখা যায় যে সর্বদাই বাতি জ্বালিয়ে রাখতেই হচ্ছে, তাহলে টিউবলাইটের ওপর আবরণের (cover) ব্যবহার করা দরকার, যেটি আলোর মধ্যেকার অতিবেগুনী রশ্মি শুষে নেবে।

সংগ্রহ রাখার ব্যাপারেও কয়েকটি ব্যবস্থা সংরক্ষণের পক্ষে সহায়ক। যেমন সাধারণ মাপের বই তাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। বাঁকাভাবে রাখা বই বাঁধাই এবং কাগজ দু'য়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক। কোন তাকেই পুরো ঠেসে বই রাখা উচিত নয়, কিছুটা জায়গা ফাঁকা রাখা দরকার, এতে বাতাস চলাচলে সুবিধা হয়। তাছাড়াও বই তাক থেকে বার করতে সুবিধা হয় এবং বইয়ের ক্ষতি সম্ভাবনা কমে যায়। বইগুলোকে সোজাভাবে রাখার জন্য ঠেকনা বা book support এর ব্যবহার করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে সেগুলোর ধারগুলো যাতে ধারালো না হয়, কারণ সেক্ষেত্রে বাঁধাই বা বইয়ের ক্ষতি হতে পারে। অত্যন্ত লম্বা বা চওড়া বই তাকে শুইয়ে রাখতে হবে

একটার উপরে একটা করে। তবে ঐভাবে একটি তাকে উপর উপর করে তিন চারটে বইয়ের বেশী রাখা উচিত নয়। খুব বেশী মোটা বা ভারী বইগুলো একক ভাবে তাকে রাখতে হবে। যথাযথভাবে বই তাকে না রাখা বা তাক থেকে বই নামাবার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করার জন্যই অধিকাংশ বাঁধাইয়ের ক্ষতির ঘটনা ঘটে।

বই ঝাড়পোঁছের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। সংরক্ষণ কর্মীদের এদিকে নজর দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগ্রহেকে নিয়মিতভাবে নজরে রাখতে হবে, যাতে কোনোটির সারানোর বা বাঁধাইয়ের দরকার হলেই সেটার ব্যবস্থা করা যাতে সম্ভব হয়—নয়ত ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায় পোঁছাতে পারে যখন আর সহজে সারানো যায় না।

বাঁধানো বই বা সাময়িক পত্রপত্রিকা থেকে ফটোকপি করার সময় লক্ষ্য রাখা দরকার বাঁধাইয়ের সেলাইএর উপর যতটা সম্ভব কম চাপ পড়ে। এ ব্যাপারে আরেকটা জিনিষের প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হবে লাইব্রেরীর বাঁধাই এমন হওয়া দরকার যাতে বাঁধানো বই/পত্রিকা সহজেই (কোন চাপ ছাড়াই) ভালভাবে খোলা সম্ভব হয় (এজন্য বাঁধাইয়ে একমাত্র 'জুস' বা তশমা সেলাই এরই ব্যবহার করা উচিত)।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা প্রায়ই যথাযথভাবে সংগ্রহ ব্যবহার করেন না—তাদের এ ব্যাপারে সচেতন করার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের সচেষ্ট হতে হবে। দরকার মত পোষ্টার বা নোটিস ইত্যাদির ব্যবহার করা যেতে পারে।

সংরক্ষণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যপ্রণালী

আমাদের দেশে সাধারণভাবে গ্রন্থাগারগুলির একটা প্রধান সমস্যা হচ্ছে ধুলো-বালির আধিক্যের সমস্যা। আমাদের সারা বছরই ধুলো ময়লার সমস্যার সম্মুখীন হতেই হয়। এ থেকে অন্যান্য কয়েকটি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, যেমন ছত্রাক ইত্যাদি। সেজন্য সুরু থেকেই ধুলোবালির ব্যাপারে নজর দেওয়া উচিত। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারে এ সমস্যাটা অনেকটা স্তিমিত। কিন্তু শীতাতপনিয়ন্ত্রণের মত খরচ সাপেক্ষ ব্যবস্থা খুব অল্প গ্রন্থাগারের পক্ষেই সম্ভব। সেজন্য অধিকাংশ গ্রন্থাগার যেখানে ঐ ব্যবস্থা নেই, সেখানে চেষ্টা করতে হবে যাতে বাইরে থেকে যতটা কম ধুলো গ্রন্থাগারের ভেতরে আসে। দরকার হলে জানালা বন্ধ রেখে, (যদি সেটা কাচের হয় তবেই সেটা সম্ভব), অথবা দরজা জানালায় লোহার সূক্ষ্ম জাল বা রঙ্গীন পর্দা লাগিয়ে এটা করা সম্ভব। নিয়ন্ত্রণের সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও কিছুটা ধুলো গ্রন্থাগারে ঢুকবেই। সেটা সাধারণভাবে পরিষ্কার করার জন্য মেঝ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে পাট ভিজিয়ে মুছে নিলে মেঝের ধুলো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এইটি করার সময় আসবারপত্রের নীচের ধুলো যতটা সম্ভব বার করে দিতে হবে, কারণ মেঝে বা আসবাবের নীচে যথেষ্ট ধুলো জমলে আস্তে আস্তে সেটা তাকে রাখা বইপত্র এবং অন্যান্য সংগ্রহের উপরও ছড়িয়ে জমতে থাকে।

বইয়ের মঞ্চ নিয়মিত ঝাড়পোছ করতে হবে। একেকটি তাকের সব বই নামিয়ে নিয়ে কাপড়ের ঝাড়ন দিয়ে মুছে ধুলো পরিষ্কার করা দরকার। ধুলো পরিষ্কারের ব্যাপারে পালকের ঝাড়ন ব্যবহার না করাই উচিত। কারণ এটির ব্যবহারে এক তাকের ধুলো অন্য তাকে সঞ্চারিত হয়। কাজ সুরু করতে হবে মঞ্চের সবচেয়ে উপরের তাক থেকে, তারপর আস্তে আস্তে নীচের তাকগুলো সবশেষে সবের নীচের তাকটি পরিষ্কার করতে হবে। কারণ মোছবার সময় যে ধুলো নীচের তাকে সঞ্চারিত হয়, সেটা এভাবে কাজ করার ফলে ভালভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে। যদি খুব বেশী ধুলো জমে থাকে, তবে কাপড় জলে ভিজিয়ে, সেটা ভাল করে নিংড়ে নিয়ে সেই কাপড় দিয়ে তাক মুছলে সব ধুলোই কাপড়ে উঠে আসবে। এটা অবশ্য ষ্টীলের তাকের পক্ষেই বেশী

থাকে, কারণ সেক্ষেত্রে তাকের আর্দ্রতা শুষে নেবার কোন সমস্যা থাকে না। তাকের ধুলো পরিষ্কারের ব্যাপারে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের (vacuum cleaner) ব্যবহার করা চলে। এই যন্ত্রের সাহায্যে যন্ত্রের মধ্যে বায়ুশূন্য পরিবেশ তৈরী করা হয়। তাকের দিকে যন্ত্রের নলের মুখ ঘোরানো থাকলে জোরে বাইরের বাতাস যন্ত্রের মধ্যে ঢোকার সময় তাকের উপরের ধুলোটুকু টেনে নেয়। ঐ ধুলো যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো ছোট ব্যাগে গিয়ে জমা হয়। এই যন্ত্র ব্যবহারে যে সুবিধা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে তাকের বা বইয়ের উপরের ধুলো সরাসরি ব্যাগের মধ্যে গিয়ে জমে, যেটা শুকনো কাপড় দিয়ে মোছার সময় হয়না বরং তখন কিছুটা ধুলো আশেপাশের তাকে মধ্যে ছড়িয়ে যায়।

তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা বইয়ের উপরের অংশেই সবচেয়ে বেশী ধুলো জমে—তাছাড়া মলাটের ভাঁজে, বাঁধাইয়ের খাঁজেও কিছুটা ধুলো জমে। একেকটা বই ভালভাবে কি করে পরিষ্কার করতে হয়, সেটা দেখা যাক। প্রথমে বইটিকে তাক থেকে নামিয়ে বইটার পুটের উপর দিয়ে উপরের দিকটা চেপে ধরে পুটের দিক থেকে বাইরের দিকে জোরে ফুঁ দিলে ধুলো উড়ে যাবে। তবু যদি কিছুটা ধুলো থেকেই যায়, তবে নরম ব্রাশ দিয়ে পুটের দিক থেকে বাইরের দিকে আলতো করে ব্রাশ করে ধুলো ঝেড়ে ফেলতে হবে। ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার

বইয়ের উপরের ধুলো পরিষ্কার করার পদ্ধতি
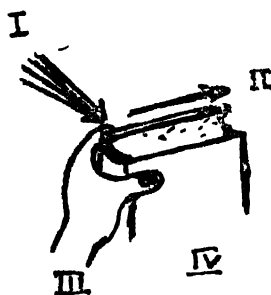
I. ফুঁ এর গতিপথ, II. অপসারিত ধুলোর গতিপথ, III. বইটি ধরার সময় হাতের অবস্থান, IV. বইটি যার ধুলো অপসারণ করা হবে।

করার সময়ও বইটা একইভাবে চেপে ধরে থাকতে হবে যাতে ধুলো বইয়ের ভেতরে নুতন করে না ঢুকতে পারে।

বইয়ের ওপরের ধুলো পরিষ্কার হয়ে যাবার পর বইটা হাতের উপর রেখে

বোর্ডের মলাট খুলে হঠাৎ জোরে বন্ধ করতে হবে—এতে মলাটের খাঁজে জমা ধুলোর বেশীর ভাগই পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাকীটা ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কীটপতঙ্গের উপদ্রব খুবই বেশী। গ্রন্থাগারের ভেতরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রেখে এদের আক্রমণ অনেকাংশে নিবারণ করা চলে। সে ব্যাপারে এবং এর প্রতিকার সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু একবার আক্রমণ শুরু হয়ে গেলে তাকে সীমিত করে আস্তে আস্তে অবদানের ব্যাপারে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে কীটনাশক ছড়ানো বা স্প্রে করা। আরশোলা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পিপ, ফিনিট, বেগন, শেলটক্স ইত্যাদি কীটনাশক ছড়ালে বা স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়। এই সব রাসায়নিক পদার্থ গ্রন্থাগার সংগ্রহের অর্থাৎ কাগজ, চামড়া, কাপড় ইত্যাদির কোন ক্ষতি করে না অথচ কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে। ১ লিটার পিপ বা বেগনের সাথে ১০ থেকে ১৫ ফোঁটা এলড্রিন বা ডাইএলড্রিন মিশিয়ে নিলে বেশী ভাল ফল পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারের ভিতরে মাসে অন্তত একবার এই ধরণের কীটনাশক ছড়ানো দরকার। ছড়াবার সময় বিশেষ করে সে সব জায়গা, যেখানে কীটপতঙ্গেরা সাধারণত বাসা বানায় অর্থাৎ দেওয়ালের ফাটল, তাকের কোনায়, ঘরের যেসব জায়গায় আলো কম বা সাধারণত নাড়াচাড়া পড়ে না অথবা কম পড়ে, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে বইপত্রকে বাঁচাবার জন্য বেনজিন ব্যবহার করা চলে। বিশেষ করে যেসব ঘরে বা আলমারিতে কোন সংগ্রহ আলাদা করে বন্ধ করে রাখা হয় (যেমন দুর্লভ সংগ্রহ, মানচিত্র সংগ্রহ ইত্যাদি) সেখানে বেনজিন ব্যবহারে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে পুঁথিপত্রের সংগ্রহকে কীটপতঙ্গের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য গোলমরিচ এবং তামাকপাতা কুচো করে ব্যবহার করা হত। এছাড়াও নিমপাতা, কর্পূরের একত্রে ব্যবহারও চালু ছিল। যেহেতু এইধরণের কীটপতঙ্গ বিতাড়ক পদার্থ বাতাসের সংস্পর্শে আস্তে আস্তে তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে সেজন্য মাস দুয়েক পর পর নতুন মিশ্রণ দিয়ে আগের মিশ্রণকে পাল্টে দেওয়া হত। স্বল্প সংগ্রহের জন্য এটি সেকালে খুবই ফলপ্রসূ পদ্ধতি ছিল।

আগে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারে কাঠের তাকের ফাটলে বা দেওয়ালের

ফাটলে ক্রিওজোট (Creosote) কেরোসিন তেলের সাথে মিশিয়ে ছড়ানো (spray) বা কাপড়ে করে লাগিয়ে দেবার যে পদ্ধতি চালু ছিল, সেটাও যথেষ্ট কার্যকরী। এটি অনেক গ্রন্থাগারে, বিশেষ করে যেগুলো শহর থেকে দূরে, এখনও চালু আছে। সেসময় অনেক বইয়ের মধ্যে নিমপাতা ও তামাক পাতা রাখা হ'ত কিন্তু এর ফলে বই এবং বইয়ের পাতার ক্ষতি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

উইপোকার আক্রমণের সন্ধান পাওয়ামাত্র আক্রান্ত অঞ্চলে ১% সোডিয়াম আর্সেনাইট, ২0% জিংক ক্লোরাইড জলে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেকসময় ৫% ডি ডি টি কেরোসিনের সাথে ব্যবহারেও ভাল ফল পাওয়া যায়। আজকাল বাজারে একধরণের রাসায়নিক পাওয়া যায়—টারমেক্স, যেটা কেরাসিনের সাথে মিশিয়ে ব্যবহারে অত্যন্ত ভাল ফল পাওয়া যায়। শুধুমাত্র রাসায়নিক ছড়িয়েই উইপোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। উইপোকা যদি দেওয়ালে বা মেঝেতে ফাটলের সৃষ্টি করে তবে সেগুলো সাদা আর্সেনিক এবং কিউপ্রিক আরসেনাইট এর (প্যারিস গ্রীনের) মিশ্রণ অথবা সোডিয়াম ফ্লুরাইড এবং ক্রিওজোটের মিশ্রণ প্রথমে ঐখানে প্রয়োগ করে, পরে সিমেণ্টে ঐ রাসায়নিক মিশ্রণ মিশিয়ে ফাটলগুলো বুজিয়ে দিতে হবে। কাঠের আসবাবের ক্ষেত্রে একভাগ কোলটার ক্রিওজোট দুভাগে কেরোসিনে মিশ্রণ অথবা একভাগ ক্লোরিনেটেড ফেনল, এক ভাগ বি-ন্যাপথল, ৪0 ভাগ পেট্রলের সঙ্গে মিশিয়ে ঐ মিশ্রণ কাঠে প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। উইয়ের বাসার আশেপাশে বি এইচ সি, ডি ডি টি, ক্লোরডেন, সোডিয়াম আরসেনাইট, পেণ্টাক্লোরোফেনল ইত্যাদি রাসায়নিক প্রয়োগে উইয়ের আক্রমণ তাৎক্ষনিকভাবে কিছুটা স্তিমিত করা সম্ভব। উইপোকার একে অন্যের গা চেটে দেবার এবং নিজেদের মৃত সহকর্মীর দেহ খেয়ে ফেলার অভ্যেস আছে সেটার মাধ্যমে বিষাক্ত কীট-নাশক তাদের সুড়ঙ্গ বা বাসার আশেপাশে ছড়িয়ে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়, যদিও সেটা স্থায়ী নয়। হোয়াইট আরসেনিক, ডি ডি টি পাউডার, ১% সোডিয়াম আরসেনাইটের জলে মিশ্রণ কিংবা ৫% ডি ডি টির জলে মিশ্রণ উইপোকার আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার পক্ষে যথেষ্ট ফলপ্রসূ। উইপোকার আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে কাঠের তাক দেওয়ালের ফাঁকফোকর সিমেণ্ট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া ছাড়াও ক্রিওজোটের প্রয়োগের কথা আগেই বলা হয়েছে। ভাল ফল পাবার জন্য বছরে অন্তত দুবার এধরণের প্রয়োগ প্রয়োজন। তার মধ্যে একবার বর্ষার পর পরই করা উচিত।

গ্রন্থাগার ভবনের মধ্যে যদি ভালভাবে ছত্রাক কীটপতঙ্গের আক্রমণ শুরু হয়ে যায় তবে সেটা থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাবার জন্য ভবনে হাইড্রোসাইনিক অ্যাসিড গ্যাসে ধূপনের প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞের সহায়তায় যথেষ্ট সাবধানে এই ধূপন দুদিন অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টা ধরে করা দরকার। ধূপনের পরও দুদিন হাইড্রো-সাইনিক গ্যাসের অবশিষ্টাংশ ভবন থেকে সম্পূর্ণ বার করে দিতে লেগে যায়। তারপরই গ্রন্থাগার আবার ব্যবহারের জন্য খোলা সম্ভব। তাৎক্ষনিক কিছু উপকার অবশ্য ২৪ ঘণ্টা ধরে মিথাইল ব্রোমাইড ধূপন করলে পাওয়া সম্ভব। যখন আক্রমণ অনেক ব্যাপক ও সাংঘাতিক পরিমাণে হয়ে থাকে, তখন একমাত্র ধূপনই ঐ আক্রমণের সমাপ্তি ঘটাতে পারে। হাল্কা ধরণের আক্রমণের প্রতিরোধে ডি ডি টি, বি এইচ সি অথবা ক্লোরডেন স্পিরিটে মিশিয়ে ছিটিয়ে /স্প্রে করে দেওয়া বা ব্রাশে করে প্রয়োগ করার মাধ্যমে তখনকার মত আক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, এরপর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত নতুন আক্রমণের সম্ভবনাও থাকে না।

গ্রন্থাগারে কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধের একটি প্রধান উপায় হচ্ছে—গ্রন্থাগার ভবন এবং তার আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। সেই সঙ্গে ভবনের আসবারপত্র অন্ততঃ প্রতি পাঁচ বছর পরপর নতুন করে রং করাও দরকার। কাঠের তাক, ট্রলি ইত্যাদি ক্ষেত্রে রং করার সময় ঐ রংএ কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে দিলে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যায়।

গ্রন্থাগারে কাঠের মঞ্চ ব্যবহারের বদলে ষ্টীলের মঞ্চ (যেটা অপেক্ষাকৃত কিছুটা বেশী দামী) ব্যবহার করাটাই সমীচিন। যে সব মঞ্চে নিয়ন্ত্রনযোগ্য (adjustable) তাকের ব্যবস্থা আছে সেগুলো ব্যবহারের পক্ষে বেশী উপযোগী, কারণ তাক ছোট বড় বইয়ের প্রয়োজনে মত ওঠা-নামা করানোর সুবিধা ছাড়াও এতে বাতাস চলাচলের অনুকুল অবস্থার সৃষ্টি করা সম্ভব। মঞ্চের উচ্চতা সাধারণভাবে সাড়ে ছয় ফিটের চেয়ে বেশী উচু না হওয়াই বাঞ্চনীয়, নয়ত সবচেয়ে উপরের তাকের বই দেখা বা নামানোর অসুবিধা হয়। কাঠের তুলনায় ষ্টীলের মঞ্চ বেশী উপযোগী এজন্য যে আগুন, কীটপতঙ্গ বা ছত্রকের বিস্তারে এটি মোটেই সহায়ক নয়। এটি কাঠের মত আর্দ্রতাও শুষে নেয় না।

সংরক্ষণের সহায়ক পদ্ধতি হিসাবে প্রতিলিপিকরণের ব্যবহার

আধুনিক গ্রন্থাগারে এমন অনেক সংগ্রহ থাকে যেগুলো কোন না কোন কারণে সাধারণভাবে ব্যবহারকারীদের ব্যবহার করতে দেওয়া যায় না, যেমন খুব পুরানো খবরের কাগজ বা প্রায় ভঙ্গুর বই/পুঁথি ইত্যাদি। কিন্তু গ্রন্থাগারের সংগ্রহ তো ব্যবহারের জন্যই। শ্রদ্ধেয় ডঃ রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার নীতির পরিবর্তিত রূপ উল্লেখ করে বলা চলে 'গ্রন্থাগার সংগ্রহ ব্যবহারেরই জন্য' (Documents are for use)। এই কথা যদি মেনে নিতে হয় তবে এই সব ব্যবহারের প্রায় অনুপযোগী সংগ্রহ ব্যবহারকারীদের কাছে পেঁছে দেবার একটি মাত্র পথ আছে, যাকে বলা হয় প্রতিলিপিকরণ (reprography)। প্রতিলিপিকরণকে আবার দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা সম্ভব, যথা (ক) ম্যাক্রোগ্রাফি (macrography) যার মাধ্যমে সরাসরি সাধারণ চোখে পড়ার উপযুক্ত প্রতিলিপি তৈরী হয়, যেমন জেরগ্রাফি বা জেরক্সকপি, এবং (খ) অন্যটি মাইক্রোগ্রাফি, যেখানে প্রতিলিপি মূল বস্তু থেকে অনেকগুণ ছোট হয়ে যাওয়ায় শুধুমাত্র বিশেষ পাঠযন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিলিপিটিকে বহুগুণ বাড়িয়ে পাঠোদ্ধার করা হয়।

ম্যাক্রোগ্রাফী

চেস্টার কার্লসন এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। সাধারণভাবে গ্রন্থাগারের কোন সংগ্রহ যা ব্যবহারের ধকল সহ্য করতে পারে না, তাকে রক্ষা করা অথচ ব্যবহারকারীকে তাতে বিধৃত তথ্যসংগ্রহ থেকে বঞ্চিত না করার জন্য ম্যাক্রোগ্রাফী ব্যবহার করা হয়। অথবা কয়েকজন গবেষক যখন একই পত্রিকা বা একই প্রবন্ধ দেখতে চান অথচ যার মাত্র একটাই কপি গ্রন্থাগারে আছে সেক্ষেত্রে সমাধান হিসাবে এর ব্যবহার খুবই সুবিধাজনক। কিংবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের অধ্যাপক কোন বিশেষ প্রবন্ধ দেখে নিতে বলেছেন অথচ যেটি মাত্র দু/একটা কপি গ্রন্থাগারে আছে; সেখানেও ম্যাক্রোগ্রাফীর ব্যবহার যথেষ্ট উপযোগী। এই ব্যাপারে কিন্তু সব সময় নজর রাখতে হবে যাতে

কপিরাইট আইন (Copyright act) কোনভাবে লঙ্ঘিত না হয়। (পরিশিষ্টে কপিরাইট আইন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে)।

মাইক্রোগ্রাফী দুধরণের হয়—একটি ইলেকট্রো-ফটোগ্রাফী, অন্যটি ইলেকট্রোলাইটিক পদ্ধতি। সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ইলেকট্রোফটোগ্রাফিক পদ্ধতি, হচ্ছে জেরোগ্রাফী। গ্রীকভাষায় Xeros এর অর্থ শুকনো এবং Graphes মানে লেখা। এই পদ্ধতিতে কোন তরল পদার্থের ব্যবহার না থাকায় এই নামেই এটি পরিচিত। ১৯৫০ সালে এর প্রথম উদ্ভাবনের পর থেকে এই কয়েক দশকে এর নানা উন্নয়ন এবং পরিবর্তন সাধিত হলেও মূল পদ্ধতির বড় একটা হেরফের ঘটেনি। এই পদ্ধতিতে সেলেনিয়াম, ক্যাডমিয়াম সালফাইড, টাইট্যানিয়াম অক্সাইড, জিংক অক্সাইড ও একধরণের রজন মিশ্রণ আলোকপরিবাহী সামগ্রীরূপে (photoconductive material) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় সেলেনিয়াম। মাঝে কিছুদিন আর্থিক দিক থেকে অনেক সস্তা হওয়ায় ক্যাডমিয়াম সালফাইড ব্যবহৃত হয়েছিল, বিশেষতঃ জাপানে, কিন্তু পরে যখন জানা গেল যে, এই রাসায়নিক পদার্থ হয়ত ক্যান্সার সৃষ্টির সহায়ক তখন সাধারণভাবে এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। এখন এটি ব্যবহৃত হলেও এর উপর একটি বিশেষ ধরণের আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে, যাতে এর ক্ষতি করার ক্ষমতা আর না থাকে।

এই পদ্ধতিতে এক ধরণের পাত (plate) থাকে যার একদিকে বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ (সাধারণত সেলেনিয়াম) লাগনো থাকে। পাঁচটি ধাপে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ হয়—(১) পাতটি স্থিরবিদ্যুতে 'চার্জ' (charge) করা, (২) আলোতে উদ্ঘাটন করা (exposure), (৩) ছবি ফোটানো (developing), (৪) ছবির স্থানান্তর (image transfer), (৫) ছবি স্থায়ীকরণ (fusing)। 'চার্জ'করা অবস্থায় পাতটি আলোক সংবেদনশীল (light sensetive) হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় বিশেষ লেন্সের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠার ছবি (যার প্রতিলিপি করা হবে) এর ওপর ফেলা হয়। যে সব অংশে আলো পড়ে সেখানের স্থিরবিদ্যুৎ নষ্ট হয়ে যায় এবং পাতের পিছনের ধাতব অংশে চলে যায়। যে অংশে আলো পড়ে না (মূল কাগজের যে সব অংশ কালো সেখানে আলো প্রতিফলিত না হওয়ায়) সেখানকার স্থিরবিদ্যুৎ আগের মতই থেকে যায়। এর পর এই পাতের উপর দিয়ে এক ধরণের বিশেষ কালো গুঁড়ো কালির পাউডার (টোনার) চালিত করা হয়। পাতের ওপরকার বিদ্যুৎ

ঐ পাউডারকে টেনে নেয়। এরপর ঐ প্লেটের উপর একটি কাগজ পেতে দেওয়া হয় এবং বিশেষ পদ্ধতিতে কাগজটি স্থিরবিদ্যুৎএ চার্জ করা হয়, যার ফলে কালো পাউডারে তৈরী ঐ প্রতিরূপ কাগজে স্থানান্তরিত হয়। এরপর ঐ কাগজটি গরম করা হয় যাতে ঐ কালো পাউডার গলে গিয়ে কাগজে সেটে যায় এবং ছবিটি স্থায়ী হয়ে যায়। কোন কোন পদ্ধতিতে তাপ প্রয়োগের বদলে এক ধরণের রাসায়নিক বাষ্প প্রয়োগে স্থায়ীকরণের কাজটি সেরে নেওয়া হয়। আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে পাতের (plate) কাজটি একটি ড্রাম (drum) করে। সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি স্বয়ংক্রিয় হওয়ায় প্রতি মিনিটে ৫ থেকে ১০০ টি প্রতিলিপি (copy) তৈরী হতে পারে, বিভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা। একেকটি ভাল ড্রামের ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ পর্যন্ত প্রতিলিপি করার ক্ষমতা থাকে। এই ড্রামের উপরে পাতলা সেলেনিয়াম আস্তরণ থাকে যেটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। ধূলো ময়লা, অতিরিক্ত আর্দ্রতা, অসাবধানতাজনিত আঙ্গুলের ছাপ বা আঁচড় এর অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে।

কালো পাউডাররূপী টোনার (এখন অবশ্য অন্য কয়েক রংএ ছাপানোর ব্যবস্থাও হয়েছে—যেমন সিপিয়া, ব্রাউন, নীল ইত্যাদি রং-এর টোনারের মাধ্যমে) যথাযথ ভাবে কাগজে সেটে গেলে সেটি যথেষ্ট স্থায়ী হয়।

যে কাগজের ওপর প্রতিলিপি করা হয় সেটার চরিত্রের উপর স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এই সব যন্ত্রে এমনভাবে ব্যবস্থা করা থাকে, যাতে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পাতলা থেকে মোটা কাগজ ব্যবহার করা চলে। যদি স্থায়ী র‍্যাগ কাগজ ব্যবহার করা হয় তবে অত্যন্ত স্থায়ী প্রতিলিপি পাওয়া সম্ভব।

আধুনিক যন্ত্রগুলোতে যথেষ্ট গাঢ় রংএ ছাপা হয় এবং গাঢ়ত্ব কিছু পরিমানে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাও এতে থাকে। আগের যুগের যন্ত্রে কয়েক ধরণের রংএ ছাপা বা লেখা, প্রতিলিপি করার সময় হয় ঝাপসা হয়ে যেত, নয়ত ছবি মোটেই আসত না। আরও কয়েক ধরণের রঙ্গীন কাগজে ছাপা থেকে প্রতিলিপি করার সময় কালচে পশ্চাৎপট (backgroud) আসত। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রে উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে এই অসুবিধা দূর করা হয়েছে।

কয়েকটি যন্ত্রে শুধুমাত্র সমান আকারের প্রতিলিপিই তৈরী হয়, অন্য কয়েকটিতে এক বা একাধিক মাত্রায় সংকোচনের (reduction) ব্যবস্থা থাকে। আবার আধুনিকতম যন্ত্রে সম্প্রসারণের (enlargement) ব্যবস্থাও থাকে। আবার কয়েকধরণের যন্ত্র সঙ্কুচিত চিত্র যথা মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস্

থেকে পাঠযোগ্য সম্প্রসারিত প্রতিলিপি তৈরী করতে পারে। সাধারণতঃ শেষোক্তগুলো প্রিন্টার (printer) নামে পরিচিত, অন্যগুলো কপিয়ার (copier) হিসাবে বেশী পরিচিত। সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্র রঙ্গীন ছবির রং বিশ্লেষণ করে রঙ্গীন টোনারের মাধ্যমে রঙ্গীন প্রতিলিপি তৈরী করতে সক্ষম।

এক ধরণের প্রতিলিপিকরণ যন্ত্রে বিশেষ ধরণের কাগজের ওপরেই শুধু প্রতিলিপিকরণ সম্ভব ছিল। ঐ বিশেষ কাগজের উপর রজনমিশ্রিত জিঙ্ক অক্সাইডের আস্তরণ (coated paper) দেওয়া থাকে। ঐই পদ্ধতি ইলেক্ট্রোফাক্স (electrofax) নামে পরিচিত। সাধারণ কাগজে প্রতিলিপিকরণ চালু হবার ফলে এখন ইলোক্ট্রোফাক্স যন্ত্রের কোন চাহিদা নেই। কারণ এটি অপেক্ষকৃত খরচ সাপেক্ষ, প্রতিলিপি সহজেই আর্দ্রতা শুষে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এর বিশেষ ধরণের অব্যবহৃত কাগজ বেশী দিন (বিশেষতঃ বর্ষাকালে) রাখা সম্ভব হয় না।

মাইক্রোগ্রাফি

১৮৩৯ সালে জন বেঞ্জামিন ডান্সার প্রথম মাইক্রোফটোগ্রাফীর উদ্ভাবন করলেও, এর প্রথম ব্যবহার হয় পায়রার মাধ্যমে সংবাদ পাঠানোর কাজে, ১৮৭০ সালে ফ্রান্স এবং প্রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সময়।

আধুনিকযুগের মাইক্রোগ্রাফীর ব্যবহার চালু হয়, ১৯২০ সালের পরে, যখন জর্জ এল ম্যাকারথি ব্যাঙ্কের কাজের সুবিধার জন্য এর ব্যবহারের সূত্রপাত করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় নথিপত্র রক্ষা করার জন্য এর ব্যাপক ব্যবহার সুরু হয়। তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় নানা উপকরণের উৎকর্ষও সাধিত হয়। সেই সময় থেকেই গ্রন্থাগারে এর ব্যবহারও বেড়ে যায় প্রচুর। কোন পদ্ধতির ব্যবহার যখনই বাড়ে, তখন সে ব্যাপারে সবদিক থেকে উন্নতির সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয় নানাভাবে, এক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। যুদ্ধোত্তর যুগে এর ব্যবহারের নানা সুবিধা নজরে আসায় বিভিন্ন প্রয়োজনে এর প্রয়োগ প্রসারিত হতে থাকে। সেইভাবে আমাদের সামনে খুলে যায় ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনাময় প্রয়োগক্ষেত্র। এব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশের নানা ব্যবসায়িক সংস্থা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের অবদান অনেক।

মাইক্রোগ্রাফীর ব্যবহারের নানা সুবিধা :

(১) স্থান সঙ্কুলানের পক্ষে বিরাট সুবিধা হয় (৮৫% থেকে ৯০%)।

(২) ফাইল (file) থেকে কাগজপত্র হারিয়ে যাবার অথবা পরিবর্তন করার সম্ভাবনা থাকে না। কাগজপত্র ফাইল থেকে সরানো সম্ভব, কিন্তু একবার মাইক্রোফিল্মে এটি নথিভুক্ত করার পর কোন পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

(৩) ব্যবহারের দিক থেকেও সুবিধাজনক। মাইক্রোফিল্মে অত্যন্ত সঙ্কুচিত অবস্থায় তথ্য নথিভুক্ত থাকে যার পাঠোদ্ধার যান্ত্রিক উপায়ে অতি সহজেই করা চলে (কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রেরও প্রয়োজন হয়না)

(৪) স্থানান্তরে পাঠানো অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য দিক থেকে অনেক সহজ—হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থ/নথি মাইক্রোফিল্ম অথবা মাইক্রোফিস্ অবস্থায় বিমানডাকে অত্যন্ত কম খরচে পাঠানো সম্ভব। এতে সময় এবং খরচ দুইই বাঁচে।

(৫) সহজেই প্রতিলিপিকরণ সম্ভব। প্রয়োজনে সহজেই সাধারণভাবে পাঠের উপযুক্ত ছোট বড় যে কোন আকারের প্রতিলিপি প্রস্তুত করা সম্ভব।

(৬) স্থায়িত্ব এবং সুরক্ষা—অত্যন্ত মূল্যবান এবং দুর্লভ সংগ্রহ মাইক্রোগ্রাফির মাধ্যমে সহজেই কম খরচে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব। যদি দুটো কপি মাইক্রোফিল্ম করা হয়, তবে একটি সাধারণ ব্যবহারের জন্য রেখে, অন্যটিকে স্থায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়।

(৭) গোপনীয় দলিলপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করা সুবিধাজনক।

(৮) গ্রন্থাগারে এবং তার বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্য সহজে এবং কম খরচে একত্রিত করা সম্ভব যার ফলে গবেষকদের তথ্য সন্ধানের সময়ের সাশ্রয় করা সম্ভব।

মাইক্রোগ্রাফির মাধ্যমে নানা ধরণের জিনিষ পাওয়া যায়—(১) রোলফিল্ম (২) স্ট্রিপফিল্ম (Strip film) (৩) একক ফিল্ম (Unitised film) (৪) এ্যাপারচার কার্ড (Aparture card) (৫) মাইক্রো কার্ড (Micro card) (৬) মাইক্রোফিস্ (৭) আলট্রাফিস্ (৮) কমফিল্ম (Com film) (৯) কম ফিস্ (Com fisch) (Com—Computer Output Microfilm)

রোলফিল্ম—রোলফিল্ম দুভাবে থাকে, রীল/স্পুলে (spool) এবং ক্যাসেট/কার্টিজএ। রীলে বা স্পুলে ১৬ মিমি বা ৩৫ মিমি এবং ক্যাসেটে ১৬ মিমি ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। রীলে ফিল্মের দৈর্ঘ্য সাধারণত ১00 ফুট অর্থাৎ ৩0'৪৮ মিটার। ফিল্ম দুধরণের হয়ে থাকে, একটিতে দুধারে ফুটো

ফুটো করা থাকে (perforated), অন্যটিতে সেটা থাকে না। স্বাভাবিক-ভাবে দ্বিতীয়টিতে ব্যবহারোপযোগী জায়গা বেশী থাকে। সাধারণত ৩৫ মিমি মাইক্রোফিল্মের ১০০ ফুটএ মোটামুটি ৮০০ পূর্ণ ঘর (full frame) এবং

মাইক্রোফিল্মে ব্যবহৃত রোল ফিল্ম
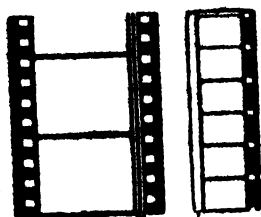
তার দ্বিগুণ অর্ধ ঘর (half frame) থাকে। সাধারণত যেসব নথিতে কোন পরিবর্তন সচরাচর করতে হয় না সেগুলো এটিতে রাখা হয়, যথা, পুরানো খবরের কাগজের প্রতিলিপি, প্রয়োজনীয় পুরানো নথিপত্র, দুঃপ্রাপ্য বই

উপরে রোল ফিল্মের এবং নীচে সিনেমা ফিল্মে নথিভুক্তি করণের পদ্ধতি
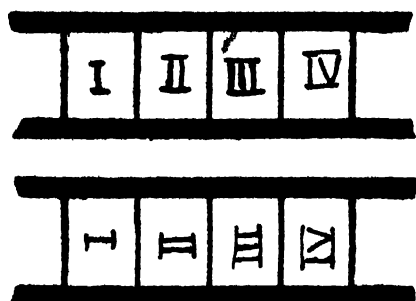
ইত্যাদি। রোল ফিল্মে ছবিগুলো সিনেমার মত ওপর নীচে নথিভুক্ত থাকেনা— থাকে পাশাপাশি ভাবে।

ক্যাসেট বা কার্টিজের ক্ষেত্রে ফিল্ম একটি ক্যাসেটে থাকে যার মধ্যে দুদিকে দুটি স্পুল থাকে। একটির মধ্যে ফিল্মটি গোটানো থাকে। একটি স্পুল থেকে অন্যটিতে স্থানান্তরিত করে এটি পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে, বিভিন্ন ধরণের ক্যাসেটের পাঠোদ্ধারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠযন্ত্রের দরকার হয়; স্পুলের রোলফিল্মের ক্ষেত্রে সে অসুবিধাটা মোটেই দেখা যায় না। কিন্তু ক্যাসেটের কয়েকটি সুবিধাও আছে,

যেমন এতে নাড়াচাড়া বা ব্যবহারের সময় ধুলোবালি বা হাতের ছাপ ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। রোল ফিল্মের একটি প্রধান অসুবিধা হ'ল, এটি কোন একটা সময় মাত্র একজনের দ্বারাই ব্যবহৃত হতে পারে।

(২) **স্ট্রিপ ফিল্ম**—এইটিও ১৬ মিমি বা ৩৫ মিমি এ হতে পারে। আসলে রোল ফিল্মকে যদি ছোট ছোট টুকরোতে ভাগ করা হয় (৮½ ইঞ্চি অর্থাৎ ২১'৬ সেমি লম্বা টুকরো, একেকটিতে ১০ টা ঘর বা ফ্রেম থাকে) তবেই আমরা স্ট্রিপ

জ্যাকেটের মধ্যে স্ট্রিপ ফিল্ম
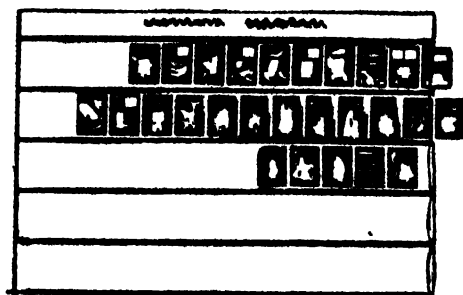
ফিল্ম পাই। সাধারণত পাতলা স্বচ্ছ কাগজের খাপে (jacket) এগুলো রাখা হয়। এই ধরণের ফিল্মের ব্যবহার ক্রমশ কমে যাচ্ছে ব্যবহারের নানা অসুবিধার জন্য।

(৩) **একক ফিল্ম বা ইউনিটাইসড ফিল্ম**—এটি ১৬ মিমি বা ৩৫ মিমি স্ট্রিপ ফিল্মের মতই অ্যাসিটেটের স্বচ্ছ খাপে রাখা থাকে। ঐ খাপের মধ্যে সরু সরু ভাগ করা থাকে যার মধ্যে একেকটি টুকরো রাখা সম্ভব। খাপের উপর-নীচ বন্ধ থাকলেও দুই ধার খোলা থাকে যেখান দিয়ে ফিল্মের টুকরোগুলো ঢোকানো হয়। একেকটি খাপ ৫ থেকে ৬টি সারিতে ভাগ করা থাকে। প্রতি খাপের সাধারণ আকার ৪"×৬" (১০'২×১৫'৩ সেমি) হলেও ৩"×৫" (৭'৬×১২'৭ সেমি) অথবা ৫"×৮" (১২'৭×২০'৩ সেমি) পর্যন্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফুটো ছাড়া (non-perforated) ফিল্মই ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে রোল ফিল্মের কয়েকটি অসুবিধা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একই বিষয়ে

বিভিন্ন নথি এক জায়গায় রাখা সম্ভব। একই সময় একাধিক ব্যক্তি এর বিভিন্ন অংশের ব্যবহার করতে পারেন। খাপের উপরের প্রান্তে খালি চোখ পড়ার উপযুক্ত করে জ্ঞাপক সূচনাটি / বিষয়টি লেখা থাকে, যাতে খোঁজা বা ব্যবহারের সুবিধা হয়। এর আরেকটি সুবিধা হল নতুন কোন তথ্য যদি হাতে আসে তবে সেটি খাপে সহজেই সংযোজিত হতে পারে। তেমনি পুরানো অপ্রয়োজনীয় তথ্য (out dated) সহজেই সরিয়ে ফেলা যায় অথবা অপ্রয়োজনীয় অংশটি কেটে বাদ দিয়ে বাকীটা যথাস্থানে রেখে দেওয়া সম্ভব। প্রয়োজনমত এটিকে অতি সহজে নবতর তথ্য সংযোজনের (update) মাধ্যমে সাম্প্রতিকতম তথ্য সম্বলিত করা সম্ভব। এ থেকে সস্তায় এবং সহজেই সাধারণ কাগজে প্রতিলিপি তৈরী করাও সম্ভব।

(৪) **অ্যাপারচার কার্ড** (Aperture Card)—সাধারণত এটি একখণ্ড কার্ড যার মধ্যে একটি ফোকর (window) থাকে যে টির মধ্যে একটি ৩৫ মিমি ফিল্মের ফ্রেম লাগানো যায়। কার্ডের আকার সাধারণতঃ ১৮.৭ × ৮.২ সেমি (অর্থাৎ ৭$\frac{3}{8}$" × ৩$\frac{1}{4}$ ইঞ্চি, এবং এর উপর বিষয় সূচনা সাধারণ পাঠোযোগ্য অক্ষরে লিপিবন্ধ থাকতে পারে কিম্বা যান্ত্রিক উপায় বা কম্পিউটার দ্বারা বাছার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এতে ফিল্ম আটকানো থাকে, কোথাও বা ফিল্ম ঢোকাবার ব্যবস্থা থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ১৬ মিমি ফিল্মও এতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে বলা চলে যে, প্রযুক্তি বিষয়ক নক্সার ব্যাপারেই এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশী হয়, কয়েকটি বিশেষ কারণে—

(ক) দাম সস্তা

(খ) বিষয় নির্দেশক তথ্য সহজেই কমসময়ে এবং অল্প আয়াসেই লিপিবন্ধ [illegible]

(গ) যান্ত্রিক উপায়ে খোঁজার ব্যবস্থা এতে সহজেই করা যায়।

(ঘ) সাধারণভাবে এতে যে ধরণের কার্ড ব্যবহার করা হয়, সেটা খুবই টেকসই এবং স্থায়ী ধরণের, সেকারণে বিভিন্ন আবহাওয়া এবং বহুল ব্যবহারের ধকল সহজেই সইতে পারে।

(ঙ) এই ধরণের কার্ড রাখার উপযুক্ত নানাধরণের আসবাবপত্র বাণিজ্যিক

(ছ) সম্প্রসারক যন্ত্রের (enlarger) ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই যথেষ্ট প্রসারিত করে নেওয়া যায়।

(৫) **মাইক্রোকার্ড** : সাধারণত ১২×৭½ সেমি (৫"×৩") আকারের অস্বচ্ছ উপকরণ বা কার্ড যার উপরে যথেষ্ট সংকুচিতভাবে তথ্য নথিভুক্ত করা থাকে। এই লিপিবদ্ধ তথ্য পর্দার উপর প্রতিফলিত করে অথবা উপযুক্ত পাঠ-যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যম সম্প্রসারিত করে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব।

(৬) **মাইক্রোফিস** : যদিও ১২×৭.৫ সেমি ৫"×৩" (১০.৫×১৪.৮ সেমি) থেকে ৪"×৬" পর্যন্ত আকারে মাইক্রোফিস্ পাওয়া যায়। তবু বড় আকারেরটিই সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। এটি আসলে স্বচ্ছ এবং ফিল্ম সিটেরই অংশ। এর সবচেয়ে উপরের অংশে সাধারণত ফিসের মধ্যে রাখা তথ্যের বিষয়সূচক নির্দেশিকা সাধারণ চোখে পাঠযোগ্যভাবে ছাপানো থাকে। ক্যামেরার সংকোচনের মাত্রার ওপর নির্ভর করে এতে কতগুলি সারি (row এবং কতগুলি স্তম্ভ (column) থাকবে—

১৮.২× সংকোচন ৫ সারি এবং ১২ স্তম্ভ = ৬০
২৪ × „ ৭ „ „ ১৪ „ = ৯৮
৪৮ × „ ১৫ „ „ ১৮ „ = ২৭০

এর সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে এই যে অতি স্বল্প পরিসরের মধ্যে এত প্রচুর তথ্য লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। একই বিষয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য-একই

মাইক্রোফিস
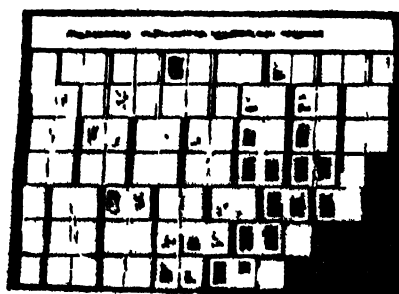
মাইক্রোফিসে বা বিভিন্ন মাইক্রোফিসে পাশাপাশি রাখা সম্ভব যেটা রোল ফিল্মে করা সম্ভব নয়। এটি সাধারণভাবে যেমন খুঁজে বের করা যায়, তেমনি যান্ত্রিক ভাবেও এই কাজটি করা সম্ভব। এটি পাঠের জন্যে বিশেষ পাঠযন্ত্রের

(mirofiach reader) প্রয়োজন হয়। আজকাল সহজবহনযোগ্য ছোট পাঠযন্ত্রও পাওয়া যায়। কোন কোন যন্ত্রে বিশেষ ব্যবস্থা থাকে যার মাধ্যমে প্রয়োজন মত অংশের প্রতিলিপি মুহূর্তের মধ্যে করে নেওয়া সম্ভব।

(৭) **আল্ট্রাফিশ:** আসলে এটিও মাইক্রোফিসেরই মত ১৪·৮ × ১০·৫ সেমি (৬" × ৪") আকারের ফিল্ম, যার উপর অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে তথ্য নথিভুক্ত করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সংকোচনের মাত্রা মাইক্রোফিসের তুলনায় অনেক বেশী, যার ফলে একটি আলট্রাফিসে সাধারণ বইয়ের ৩২৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নথিভুক্ত করা সম্ভব। এই ধরণের একটি আলট্রাফিসে ১২৫ থেকে ২৫০ ভাগ সংকোচন ঘটানো হয়ে থাকে। এটির পাঠোদ্ধারের জন্য অনুরূপভাবে শক্তিশালী পাঠযন্ত্রের দরকার হয়।

(৮) **কমফিল্ম** (কম্পিউটার অডিটপুট অন ফিল্ম): ১৬ মিমি রিল ফিল্মের অনুরূপ শুধুমাত্র এক্ষেত্রে সংকোচণের মাত্রা অপেক্ষাকৃতভাবে আরো বেশী (৪৮ ভাগ পর্যন্ত)।

(৯) **কমফিস:** এটিকে সূক্ষতর মাইক্রোফিস হিসাবে বর্ণনা করা চলে, যেহেতু এতে ব্যবহৃত সংকোচনের মাত্রা যথেষ্ট বেশী, সেহেতু একটি কমফিসে ২০০ থেকে ৪০০ ফেম বা পৃষ্ঠার নথিভুক্ত করা সম্ভব।

মাইকোগ্রাফীতে প্রধানতঃ যেসব সরঞ্জামের দরকার হয় সেগুলো হচ্ছে (১) ক্যামেরা (২) প্রসেসর (processor) (৩) প্রতিলিপিকারক (duplicator) (৪) পাঠযন্ত্র/প্রতিলিপিকারক পাঠযন্ত্র (reader/reader-printer) (৫) ফিল্ম (৬) রাখার উপযোগী ব্যবস্থা (filing system) বা নথিবন্ধকরণ।

ক্যামেরা

ক্যামেরা দু'ধরণের হতে পারে—প্ল্যানেটারী ক্যামেরা (planetary camera) এবং রোটারী বা ফ্লো ক্যামেরা (rotary or flow camera) মাইক্রোগ্রাফি ক্যামেরা সাধারণ ক্যামেরা থেকে কিছুটা আলাদা। এটি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। এরই সাথে আলোকিত করার জন্য উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ যোগ্য আলো, নথি রাখার উপযুক্ত পাটাতন থাকে। মূল ক্যামেরার মধ্যে একটি লেন্স, ফোকাস্ করার, ফিল্ম চলাচলের, বিভিন্ন মাত্রায় সংকোচনের উপযোগী ব্যবস্থা থাকে। এর মধ্যে শেষোক্ত ব্যবস্থাই মাইক্রোগ্রাফীর

সবচেয়ে অধিক প্রয়োজনীয়। প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে এই ক্যামেরা খুবই মজবুত এবং সূক্ষ্ম কারিগরি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। কারণ সামান্যতম ত্রুটি (যেমন সামান্যতম কাঁপা) ছবি নষ্ট করে দিতে পারে।

প্ল্যানেটারী ক্যামেরা স্থির কোন নথির ছবি তোলার জন্য প্ল্যানেটারী ক্যামেরা এবং চলমান নথির ছবির জন্য ফ্লো ক্যামেরার ব্যবহার করা হয়। ক্যামেরার মধ্যে দুটি রীল থাকে একটিতে থাকে অব্যবহৃত ফিল্ম (unexposed film) এবং অন্যটিতে ব্যবহৃত ফিল্ম। ভেতরে এমন ব্যবস্থা করা থাকে যাতে প্রতি ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে এক এক ধাপ করে অব্যবহৃত ফিল্ম লেন্সের আলোর প্রবেশপথ (aperture) হয়ে ব্যবহৃত ফিল্মের রীলে চলে যায়। অতি সংকোচনক্ষম লেন্সের মধ্য দিয়ে এবং সূক্ষ্ম স্বয়ংক্রিয় ফোকাসিং-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ছবি ফিল্মের উপর পড়ে। ক্যামেরাটি ক্যামেরাধারক স্তম্ভের উপর ওঠা নামা করান হয় নথির আকারের উপর নির্ভর করে। আলোর প্রবেশ পথ (aperture) বিশেষ নিয়ন্ত্রক (shutter) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্যামেরায় কতটা ফিল্ম ব্যবহৃত হয়েছে সেটা এক বিশেষ জ্ঞাপকের (indicating meter) মাধ্যমে জানা যায়। কোন কোন ক্যামেরার সঙ্গে বিশেষ নিরূপক আলো (finder light) থাকে, যেটা জ্বালালে পাটাতনের উপরের একটা অংশ আলোকিত হয় এবং এটা থেকে নির্দেশিত হয় ক্যামেরাটি ঐ অবস্থায় রেখে কত বড় নথির ছবি নেওয়া সম্ভব। অন্যান্য ক্যামেরার ক্ষেত্রে পাটাতনে দাগ কাটা থাকে যা থেকে ক্যামেরাকে প্রয়োজনানুসারে নিয়ন্ত্রন করতে হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে যান্ত্রিক উপায়ে এই কাজগুলো সারা হয়।

ক্যামেরার পাটাতন (অনেকসময় এটি একটি টেবিল এর কাজ করে) সাধারণত যথেষ্ট বড় এবং টেকসই হয়, যাতে বড় বড় নথি এতে ধরে যায়। মাইক্রোগ্রাফীর ক্যামেরার লেন্স অত্যন্ত শক্তিশালী হয় যাতে প্রতি মিলি মিটার আয়তনের মধ্যে ১00 লাইন অথবা তার চেয়েও বেশী সংকোচন সম্ভব।

আলো সাধারণত পাটাতনের দুটি আলোক স্তম্ভের উপরে ক্যামেরা ধারক স্তম্ভের দুধারে ৪৫°-তে লাগানো থাকে। মোটামুটি এইগুলোই হচ্ছে ক্যামেরার প্রধান অংশ। অবশ্য এছাড়াও কিছ কিছু আনুষঙ্গিক উপকরণও থাকে, যেগুলো বিভিন্ন ক্যামেরার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

ফ্লো ক্যামেরা—এটি অপেক্ষাকৃত দ্রুত কাজের পক্ষে সহায়ক। এটিতে

ফিল্ম সংকোচনকৃত দ্রুত গতিতে চলাচল করে যেটি নির্ভর করে নথির গতি এবং সংকোচনের পরিমাপের উপর।

যেসব নথির ছবি তোলা হবে সেগুলো একটি ড্রামের উপরদিয়ে চালিত করা হয়। এই চলমান ড্রামের গতি ক্যামেরা এবং তার আলো দুটিকেই নিয়ন্ত্রিত করে। ফলে ফিল্মের ওপর যথাযথভাবে সংকুচিত (reduced) প্রতিচ্ছবি পড়ে। একই গতিতে ড্রামের উপরকার নথি এবং ক্যামেরার ভেতরকার ফিল্ম এগিয়ে যায়। একটি নথি সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে যায় এবং ফিল্মও থেমে যায়। এরপর পরের নথি সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার আগের মতই আলো জ্বলে ওঠে এবং অন্যসবই আগের মত পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই ক্যামেরার সবই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এতে আলোর পরিমাণ, ফোকাস্ ইত্যাদি নির্দিষ্ট। কিন্তু এর সাথে অনেকগুলো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাও করা থাকে যথা ফিল্ম প্রায় শেষ হয়ে গেলে, কোন যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলে, সেটি জ্ঞাপক সংকেতের ব্যবস্থা এতে আছে। পূর্ণ গতিতে চালালে এটি প্রতি ঘণ্টায় ৩০,০০০ পর্যন্ত ছবি নিতে সক্ষম।

কোন কোন সময় এই ক্যামেরায় নথির আয়তন ছোট হলে অর্ধেক ফিল্মের মধ্যে ছবি নেওয়া সম্ভব। এইভাবে ফিল্ম পুরো ব্যবহৃত হলে ফিল্মটি আবার

ছোট নথির জন্য অর্ধেক ফিল্মের ব্যবহার
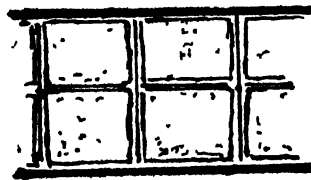
উল্টে দিয়ে বাকী অর্ধেক অংশে ছবি তোলা সম্ভব। এই ক্যামেরায় প্রয়োজনানুসারে নানা ধরণের লেন্স ব্যবহার করা চলে—যার ফলে ৪০ ভাগ পর্যন্ত সংকোচন সম্ভব।

মাইক্রোফিল্মের জন্য ব্যবহৃত ক্যামেরা—এটিও মাইক্রোফিল্মের ক্যামেরার মতই। শুধুমাত্র এটিতে রোল ফিল্মের বদলে ফিস শিট (sh:et) ফিল্মের ব্যবহারের জন্য কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা থাকে, যাতে প্রথম সারির সব ছবি তোলার পর দ্বিতীয় সারির ছবি তোলার জন্য আপনা-আপনি শিট ফিল্ম

যথাস্থানে চলে যায়। সাধারণভাবে বলা চলে এটিতে কাজ অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিতে চলে কারণ প্রতিটি শিট্ ফিল্ম ব্যবহৃত হবার পর অন্ধকারে সেটি অপসারণ করে নতুন ফিল্ম লাগাতে হয়। এতে যথেষ্ট সময় খরচ হয়। এই অসুবিধার জন্য আধুনিক মাইক্রোফিস্ ক্যামেরায় ক্যাসেটের ব্যবহার চালু হয়েছে যার মধ্যে একসাথে ৫০টি শিট্ ফিল্ম রাখা সম্ভব। এই ব্যবস্থায় প্রতি দশমিনিটে ৭০টি ছবি তোলা সম্ভব। এর বিকল্প হিসাবে অনেক সময় ৭০ মিমি অথবা ১০৫ মিমি ফিল্মের ব্যবহার করা হয় মাইক্রোফিসের নেগেটিভ তৈরীর জন্য। যার ফলে কাজ অনেক দ্রুততর করা সম্ভব।

ফিল্ম প্রসেসর

সাধারণ ফটো প্রসেসিংএর সঙ্গে মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস্ প্রসেসিংএর কোন পদ্ধতিগত পার্থক্য নেই, কিন্তু রোলের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি কারণে কয়েকটি অসুবিধার সৃষ্টি হয় যেগুলোর সমাধানকল্পে কিছু কিছু যান্ত্রিক অথবা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কয়েকটি সরঞ্জামের ব্যবহারও করা হয়।

রীল ট্যাংক—এটি সাধারণ ৩৫ মিমি প্রসেসিং ট্যাংকের মতই শুধু আয়তনে বড়, যাতে ২০-২৫ ফুট দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ফিল্ম ধরে। এই ট্যাংক একটি আলোনিরোধক প্লাষ্টিকের পাত্র, এর মধ্যে একটি রীল এবং প্রসেসিংএ ব্যবহার্য মিশ্রণ ঢালার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে। এই ট্যাংক দু'ধরণের হয়—এ্যপ্রন ট্যাংক এবং স্পাইর‍্যাল ট্যাংক। এ্যপ্রন ট্যাংকে ১০০ ফুট লম্বা নমনীয় (flexible) স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের দুদিকে খাঁজযুক্ত এ্যপ্রন ষ্ট্রীপ থাকে। এই ষ্ট্রীপের উপরেই ফিল্মটি রেখে দেওয়া হয়।

স্পাইর‍্যাল ট্যাংকের মধ্যেকার স্পাইর‍্যাল রীলে ফিল্ম জড়িয়ে ট্যাংকের মধ্যে রাখা হয়।

যখন ফিল্মের দৈর্ঘ্য ২০ থেকে ১০০ ফুটের মত হয় তখন হাত দিয়ে ঐ ফিল্ম ট্যাংকে ঢোকানো প্রায় অসম্ভব—এজন্য যান্ত্রিক সহায়তার দরকার, যাতে একটা স্পুল ধারক (holder) এবং বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র থাকে ফিল্ম গোটাবার জন্য। প্রসেসিংএর পর ফিল্মটি খোলার জন্য যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। রীলের মধ্যে রাখা অবস্থায় শুকোবার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ শুকোবার ব্যবস্থায় শুকনো ঠাণ্ডা অথবা অল্প গরম বাতাস ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে চালিত করা হয়।

সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়যন্ত্রে সিনেমার ফিল্মের মত মাইক্রোগ্রাফী ফিল্মও প্রসেস করা সম্ভব। এতে যে বড় কাজের সুবিধা হয় তাই নয়—তৈরী জিনিষের মান অপেক্ষাকৃত ভাল এবং একই রকম উচ্চ মানের হয়। এর কারণ এই পদ্ধতিতে প্রতিটি পর্যায় রাসায়নিক মিশ্রণের মান এবং পরিমান, তাপমাত্র যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক ফিল্মের উপরের রাসায়নিক আস্তরণও অনেক পাতলা হয়ে থাকে, যার ফলে ফিল্ম শুকোতে অনেক কম সময় লাগে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সাধারণত তিন রকমের হতে পারে (১) ডিপিং (Dipping) (২) হেলিক্যালি থ্রেডেড (Helidally threaded) মেসিন (৩) রোলার ট্রান্সপোর্ট মেসিন (Roller transport)। এদের মধ্যে শেষেরটি দীর্ঘতম রোল ফিল্মের পক্ষেও উপযোগী এবং প্রথমটি অপেক্ষাকৃত ছোট দৈর্ঘ্যের পক্ষে এবং অন্যটি মাঝারি আকারের ফিল্মের পক্ষে উপযোগী।

যে কোন ধরণের প্রসেসিং যন্ত্রই হোক সেটি এমন উপাদানে তৈরী হওয়া উচিত যেটি ভাল রকমের ক্ষয়নিরোধক (anti-corrosive) গুণ সম্পন্ন। এদিক থেকে ৩১৬ ষ্টেনলেস ষ্টীল, টাইট্যানিয়াম্ এবং হ্যাষ্টেলয় সি (Hastelloy C) অত্যন্ত উপযোগী উপাদান; যদিও দামের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম খরচ সাপেক্ষ, কয়েক ধরণের প্লাষ্টিকও এব্যাপারে যথেষ্ট উপযোগী।

প্রতিটি যন্ত্রের (বিশেষতঃ স্বয়ংক্রিয়গুলোতে) তার নিজস্ব রাসায়নিক মিশ্রণ, তাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে, যেগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ যন্ত্রের সঙ্গেই পাওয়া যায়। সবসময়ই সেই নির্দেশাবলী মেনে চলা উচিত কারণ শুধুমাত্র তার মাধ্যমেই ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। সেকারণে সেসব ব্যাপারে এখানে বিস্তারিত আলোচনা অপ্রয়োজনীয়।

মাইক্রোগ্রাফী পাঠযন্ত্র / মাইক্রোগ্রাফী প্রতিলিপিকারক পাঠযন্ত্র

সাধারণভাবে বলা চলে যে মাইক্রোগ্রাফী পাঠযন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের মাইক্রোগ্রাফের (মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস ইত্যাদি) পাঠ সম্ভব। প্রতিলিপি-কারক পাঠ যন্ত্র সাধারণ পাঠযন্ত্রেরই মত, শুধু এটিতে বিশেষ এমন ব্যবস্থা সংযোজিত থাকে যার মাধ্যমে প্রয়োজন অনুসারে মাইক্রোগ্রাফের নির্দিষ্ট অংশের প্রতিলিপি অতি সহজে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহারকারী পেয়ে যেতে পারেন। প্রতি পাঠযন্ত্রের যেসব অংশ থাকে সেগুলো হচ্ছে (ক) এমন ব্যবস্থা

যার মাধ্যমে মাইক্রোগ্রাফের সম্প্রসারিত (magnified) পাঠযোগ্য প্রতিচ্ছবি (optical system) তৈরী করা সম্ভব; (খ) বিশেষ ধরণের পর্দা (screen) যার ওপর প্রতিচ্ছবিটি প্রতিফলিত হবে, (গ) বিশেষ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ফিল্ম অথবা ফিস্‌টিকে যথাস্থানে রাখা যায়, যাতে প্রয়োজনীয় প্রতিচ্ছবি পর্দার ওপর ফেলা সম্ভব হয়। (ঘ) ফিল্ম/ফিস্‌টি প্রয়োজনমত সামনে-পেছনে সরাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা (ঙ) যন্ত্রের মধ্যে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন আলোর উৎস থেকে সৃষ্ট তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা।

সম্প্রসারিত প্রতিচ্ছবি তৈরীর ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চমানের সম্প্রসারণকারী আতসকাচ (lens), উচ্চশক্তিসম্পন্ন আলোর উৎস, আয়না। আলো ফিল্মের মধ্যদিয়ে সর্বত্র সমান পরিমাণে পরিচালিত হয়ে পরবর্তী লেন্সের মাধ্যমে পর্দার উপর পড়ে যেখান থেকে ব্যবহারকারী সরাসরি পাঠে সক্ষম হন।

অস্বচ্ছ পর্দায় সম্প্রসারিত প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে পাঠোদ্ধার
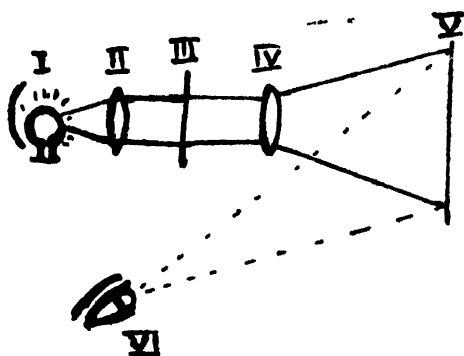
I আলো, II এবং IV আতস কাচ III ফিল্ম V অস্বচ্ছ পর্দা VI পাঠক

সস্তা পাঠযন্ত্রে একটি মাত্র সম্প্রসারণকারী লেন্স থাকে, কিন্তু দামী যন্ত্রে একাধিক সম্প্রসারণকারী লেন্স থাকে। পর্দা ঘসা কাচের (transluscent) অথবা অস্বচ্ছ দুরকমেরই হতে পারে। পর্দা কোন ধরণের তার উপর নির্ভর করে যন্ত্রের ভিতরকার প্রযুক্তি ব্যবস্থা। দুধরণের পর্দারই নিজ নিজ সুবিধা এবং অসুবিধা আছে। আগে মাইক্রোফিল্ম এবং মাইক্রোফিস্‌ অথবা আলট্রাফিসের জন্য আলাদা আলাদা যন্ত্রের ব্যবহার করা হত। কিন্তু আধুনিকতম যন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার মাইক্রোগ্রাফের পাঠোদ্ধার সম্ভব। মাইক্রোগ্রাফী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষপত্র রাখার জন্যে যে ব্যবস্থার দরকার সে সম্বন্ধে

কিছুটা আলোচনা করা যাক।—এই কাজে ব্যবহৃত জিনিষপত্র অর্থাৎ কাঁচামাল এবং উৎপাদিত ফিল্ম বা ফিস্ ইত্যাদি অত্যন্ত সংবেদনশীল (sensetive)। সেকারণে যে কক্ষে এগুলো রাখা হবে, যেখানে এগুলো নিয়ে কাজ করা হয়, সেগুলো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। কক্ষটি দূষিত গ্যাস বিশেষতঃ অ্যামোনিয়া গ্যাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া দরকার। কারণ ঐ ধরণের গ্যাসগুলি খুবই ক্ষতিকারক, উপকরণ এবং উৎপাদিত মাইক্রোগ্রাফ দুয়েরই পক্ষেই। যে কক্ষে এগুলি গুদামজাত (store) করা হয় সে কক্ষের আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা যথাক্রমে ১৫—২০% এবং ১৮°—২০° সেঃ-এর মধ্যে রাখতে পারলে সবচেয়ে ভাল। যদি সেটা সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ ৫০% আর্দ্রতা এবং ২০—২১° সেঃ এর মধ্যে রাখা দরকার। তবে মনে রাখা দরকার সিলভার হ্যালাইড্ এবং ডিয়াজো ফিল্ম দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত অবস্থায় সংরক্ষণের জন্য হিমাঙ্কের কাছাকাছি তাপমাত্রায় রাখা সবচেয়ে ফলপ্রসূ।

স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর পদার্থ সম্বন্ধে সাবধানতা

প্রতিলিপিকরণ বিভাগে নানাধরণের রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার করা করা হয় যার মধ্যে অনেকগুলোই মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই কথা মনে রেখে গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারকর্মী সকলেরই যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

ছবি পরিস্ফুটনের জন্য অন্ধকার ঘরে (dark room) নানাধরণের অতি বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহার করা হয়, যার সংস্পর্শে কর্মীদের আসতে হয় নানাভাবে। ঐসব পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে কক্ষের আবহাওয়া দূষিত করতে পারে—সেটা কক্ষের তাপমাত্রা এবং নানা রাসায়নিকের নিজ নিজ চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন এইভাবে কাজ করলে স্বাভাবিকভাবেই ক্রমশ এই দূষণ আস্তে আস্তে কর্মীর শরীরের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের অসুস্থ করে তুলতে পারে। সাধারণত নাক, ফুসফুস ইত্যাদি এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার অনেক সময় হাতে ঐসব রাসয়নিক পদার্থের জন্য দাগ পড়তে পারে, চামড়ার ক্ষতি এবং নানাধরণের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। এই সবের প্রতিকারের প্রথম ধাপ হচ্ছে কক্ষে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থার উন্নতি করা যাতে বাইরে থেকে বিশুদ্ধ বাতাস ঘরে আসতে পারে এবং

দূষিত বাতাস বাইরে চলে যেতে পারে। কর্মীদের খালি হাতে কাজ না করে রবারের দস্তানা ব্যবহার করা উচিত।

ম্যাক্রোগ্রাফীক কপিয়ারের ক্ষেত্রে যে টোনার বা একধরণের তরল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় প্রতিলিপি স্থায়ীকরণের জন্য, এইগুলো সাধারণভাবে প্রশ্বাসের সাথে কর্মীদের দেহে ঢুকে অসুস্থতার সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রেও ঘরের বাতাস চলাচলের ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে।

মাইক্রোফিল্ম ক্যামেরা নিয়ে যেসব কর্মীরা প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেন তাদের দীর্ঘ সময় অতি উজ্জ্বল আলোর মধ্যে কাজ করতে হয়, যেটি চোখের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক। এর প্রতিকারের জন্য কর্মীদের রঙ্গীন চশমা (sunglass) ব্যবহার করা উচিত, যার মাধ্যমে উজ্জ্বল আলোর ক্ষতিকারক ক্ষমতা অনেকটা নষ্ট করে দেওয়া সম্ভব। ঠিক তেমনিভাবে ডিয়াজো প্রতিলিপিকারক (Diazo duplicators) যন্ত্র নিয়ে যে সব কর্মী কাজ করেন তাদের চোখে অতিবেগুনীরশ্মিজনিত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রেও একই প্রতিকারের সহায়তা নেওয়া দরকার। ডিয়াজো প্রতিলিপিকারক যন্ত্রে তরল অ্যামোনিয়ার ব্যবহার করা হয় যেটি সহজেই বাষ্পীভূত হয়ে কর্মীর দেহে প্রবেশ করে নাক, ফুসফুস ছাড়াও চামড়ার ক্ষতি করতে পারে।

সাধারণত প্রতিলিপিকরণ বিভাগে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। সেই ব্যবস্থা যদি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় (centralied aircondition system), তবে লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে প্রতিলিপিকরণ বিভাগ থেকে যে বাতাস এই যন্ত্রে ফিরে আসে সেটা যেন আবার ঠাণ্ডা করে গ্রন্থাগারে চালিত করা না হয়। কারণ ঐ বাতাসে নানাধরণের ক্ষতিকারক রাসায়নিক বাষ্প থাকে। ঐ বাতাস বের করে নতুন ঠান্ডা বাতাস চালিত করার মাধ্যমে পরিবেশ উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করা সম্ভব।

এছাড়াও এই বিভাগে একটি প্রাথমিক শুশ্রূষার জন্যে ওষুধপত্র সম্বলিত বাক্স (First-aid bcx) রাখা খুব প্রয়োজন। নানাধরণের বিষাক্ত রাসায়নিক যেগুলো এই বিভাগে ব্যবহার করা হয়, হঠাৎ প্রয়োজনের কথা মনে রেখে তার বিষঘ্নও (অর্থাৎ বিষক্রিয়ানাশক ওষুধ) মজুত রাখা ভাল। কর্মীদের বছরে অন্তত দুবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

জলে ক্ষতিগ্রস্থ সংগ্রহের সংরক্ষণ, সারান এবং অন্যান্য সমস্যা

গ্রন্থাগারের সংগ্রহ জলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অনেকভাবে। একদিকে থেকে দেখতে গেলে আর্দ্রতাজনিত ক্ষতিকেও আমরা জলে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া বলে ধরতে পারি। আর্দ্রতাজনিত ক্ষতির মূল কারণ অবশ্য গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান-সম্মত পরিবেশের অভাব। এই ধরণের অনুপোযোগী পরিবেশে ছত্রাকের আক্রমণের এবং প্রসারের বহুমুখী অশুভ সম্ভাবনা ছাড়াও, আর্দ্রতায় বেড়ে ওঠা ছত্রাকের আক্রমণের প্রভাবে কখনও কখনও বইয়ের বা পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো একটি আরেকটির সাথে জুড়ে যায়, যার ফলে পাণ্ডুলিপির কালি অথবা ছবির রংএর যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

আরেকভাবে গ্রন্থাগরের সংগ্রহ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, এটার মুখ্য কারণ গ্রন্থাগার ভবনের পরিকল্পনার ত্রুটি (structural defects ot library building)। গ্রন্থাগার ভবনের কোন অংশে ভিতরে/বাহিরে যেখানে সচরাচর লোক চলাচল করে না সে রকম কোনস্থানে যদি কোন জলের পাইপ থাকে এবং সেখানে কোনভাবে যদি জল চুঁইয়ে পড়তে সুরু করে তাহলে সহজে সেটা নজরে নাও আসতে পারে, এবং তার ফলে কাছাকাছি অবস্থিত তাকে বইপত্র ঐ চুঁইয়ে পড়া জলে ভিজে আথবা অতি আর্দ্রতায় ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ঘটনাটি নজরে আসতে যত দেরী হবে ক্ষতির পরিমানটা ততই বেশী হবে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে এমন পর্যায়েও পৌঁছাতে পারে যাতে এগুলোর পুনরুদ্ধার অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কিন্তু জলজনিত সবচেয়ে বেশী এবং ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে বন্যা বা ঐ ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে—যেমনটি ঘটে থাকে আমাদের দেশের অনেক ছোট বড় গ্রন্থাগারে মাঝে মাঝেই। এই ধরণের অত্যন্ত ব্যাপক ঘটনা ইদানীং-কালে যেটা ঘটেছিল, সেটা ১৯৭২ সালে ২২ জুন তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্ক ষ্টেটে গ্লাস শহরে এবং ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারটি কর্নিং মিউজিয়াম লাইব্রেরী। ইউরোপে ফ্লোরেন্সের বন্যার ক্ষতিগ্রস্থ গ্রন্থাগারগুলির কথাও উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা এবং আশপাশ অঞ্চলে প্রায় সপ্তাহ-ব্যাপী বিরামহীন বর্ষণের ফলে অস্বাভাবিক জল জমে এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারসহ অনেক গ্রন্থাগারের প্রভূত ক্ষতি হয়। এছাড়াও বড় ধরণের কোন অগ্নিকাণ্ড গ্রন্থাগারে ঘটে যাবার পরও আগুন নেভাবার জন্য ব্যবহৃত জলে ভেজা গ্রন্থসংগ্রহ একই সমস্যার সৃষ্টি করে। এই ধরনের দুর্যোগের ক্ষেত্রে প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আগেই করা হয়েছে।

যেভাবেই জলে ক্ষতিগ্রস্থ হোক না কেন এই ধরণের ক্ষতিকে আমরা মোটা-মুটি দুভাগে ভাগে করতে পারি, (ক) অল্প ক্ষতিগ্রস্থ, (খ) বেশী ক্ষতিগ্রস্থ। জলে ভেজার ফলে যেসব ক্ষতি সাধারণত দেখা যায় সেগুলোকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগে ভাগ করা চলে, যথা—

(ক) **ভৌত অবস্থার পরিবর্তন জনিত দুর্বলতা** : পরীক্ষা থেকে জানা গেছে জলে ভেজা কাগজ সাধারণভাবে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সহজেই ছিঁড়ে যেতে পারে। ভেজা অবস্থায় ধুলো বালি আটকে যাবার এবং অসাবধান-ভাবে নাড়াচাড়া করলে ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে।

(খ) **রাসায়নিক অথবা ভৌতিকক্ষতিজনিত দুর্বলতা** : কাগজ তৈরীর উপাদানগুলির মধ্যে এমন কিছু কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু/যৌগ থাকে যেগুলো জলে দ্রবণীয়—যেমন সাইজিং-এ (sizing) ব্যবহৃত রজন, আঠা, জিলেটিন ইত্যাদি। দীর্ঘ সময় জল ভেজা অবস্থায় থাকলে ঐসব জিনিষগুলি ধুয়ে যায়। আঠা কাগজের উপর ছড়িয়ে পড়ে এবং ফলে একটা পৃষ্ঠার সঙ্গে পাশের পৃষ্ঠা জুড়ে যায়।

(গ) **ছত্রাকের আক্রমণ** : ভেজা কাগজের ওপর সহজেই ছত্রাক গজায়, বিশেষ করে যদি কাগজে জৈব আঠা অথবা স্টার্চ (starch) ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কারণ এইগুলিই ছত্রাকের পুষ্টি জোগায়।

জলেভেজা বইপত্র সারান এবং সংরক্ষণে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সেটার নির্বাচন নির্ভর করে ক্ষতির পরিমাণ, ক্ষতিগ্রস্থের সংখ্যা, এবং গ্রন্থা-গারের আর্থিক সামর্থ্যের উপর অর্থাৎ গ্রন্থাগারের পক্ষে এই কাজে কত টাকা খরচ করা সম্ভব।

সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং সমস্যা : অধিকাংশ কাগজই যদি একত্রে শুকানো হয় তবে জুড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে এবং একবার জুড়ে গেলে সেটাকে

আলাদা করা যথেষ্ট শক্ত। সাইজিংএর উপাদান জলে নরম হয়েই প্রধানতঃ এই সমস্যা সৃষ্টি করে। এর প্রতিকারের জন্য পৃষ্ঠাগুলি ভেজা অবস্থাতে খুলে প্রতিটি পৃষ্ঠার মাঝে ব্লটিং পেপার দিয়ে আলাদা করে দিতে হবে তারপর চাপের মধ্যে রেখে শুকোতে হবে। যখন প্রায় শুকিয়ে এসেছে তখন অল্প গরম ইস্ত্রি দিয়ে শুকানোর কাজটা সম্পূর্ণ করতে হবে। নানা ভাবে শুকানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে; যদি ভেজা সামগ্রীর সংখ্যা খুব বেশী না হয় তাহলে সাধারণ তাপমাত্রায় একাজ করতে পারা যাবে।

কাগজ যদি উচ্চমানের হয় তবে ভেজাজনিত ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক কম থাকে, যদিও কাগজ স্বাভাবিকভাবে ফুলে উঠতে এবং কুঁচকে/কুঁকড়ে যেতে পারে। কুঁচকে যাওয়া ঠিক করার জন্য কয়েকটা কাগজ একসাথে নিয়ে তার উপর ভেজা স্পঞ্জের সাহায্যে মৃদু চাপ দিয়ে পালিশ করতে হবে। এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে, যতক্ষণ না সব কাগজ ঠিক করা হয়ে যায়।

যেসব বই সম্পূর্ণ ভিজে গেছে সেগুলোকে আলাদা করে প্রত্যেক পৃষ্ঠা ঠিক করে নিয়ে চাপের মধ্যে রেখে শুকোতে হবে। এটি ঠিকভাবে করার পর অর্থাৎ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে কাগজকে নতুন করে সাইজিং (resizing) করে নিতে হবে।

বইটি যদি সম্পূর্ণ না ভিজে থাকে অর্থাৎ অল্প ভিজে গিয়ে থাকে তবে প্রতিটি পৃষ্ঠার পর একটি করে ব্লটিং কাগজ রেখে অল্প চাপের মধ্যে রাখতে হবে। মাঝে মাঝে ঐ ব্লটিং কাগজগুলো পাল্টে দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বইটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। আর্ট কাগজে ছাপা বই সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। কারণ এগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একেকটা পাতা তার পাশের পাতার সাথে এমন ভাবে জুড়ে যায় যে খোলা প্রায় অসম্ভব কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। সংখ্যায় বেশী হলে এগুলির ওপর দিয়ে অত্যন্ত গরম বাষ্প (১১০° সেঃ তাপমাত্রায়) চালিত করতে হবে। এর ফলে ঐ জুড়ে যাওয়ার ব্যাপারে সহায়ক জীবাণুগুলো মরে যায় এবং অবস্থার পরিবর্তনের ফলে সহজে পাতাগুলো আলাদা হয়ে যেতে পারে। পাতাগুলো খুলে যাবার পর যথাযথ সাবধানতাসহ গরম বাতাসের মধ্যে রেখে এগুলোকে শুকোতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় এভাবে সব জুড়ে যাওয়া বই খোলা সম্ভব হচ্ছে না। যে সব বইয়ের কাগজে সাইজিং এর জন্য ষ্টার্চ অথবা প্রোটিন ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলোর ক্ষেত্রে জুড়ে যাওয়া পাতা খুলবার জন্য

এন্‌জাইম (enzyme) প্রয়োগ করতে হবে। এন্‌জাইম খোলার কাজে সাহায্য করে কিন্তু নিজে খুলে দেয়না, সেকারণে এর প্রয়োজন হয় খুব অল্প পরিমানে। সাধারণভাবে জুড়ে যাবার কারণ হচ্ছে সাইজিংএর এবং লোডিংএর সময় কাগজের উপরের স্তরে এক ধরণের আঠার প্রয়োগ। ঐ আঠা দু ধরণের হতে পারে, যেমন—

(ক) ষ্টার্চ, শর্করা ঘটিত আঠা (খ) প্রোটিন ঘটিত আঠা। কোন ধরণের আঠা ব্যবহৃত হয়েছে তার উপর নির্ভর করে, আমাদের এন্‌জাইম নির্বাচন।

ষ্টার্চ/শর্করা ঘটিত আঠা সহযোগে প্রস্তুত আর্ট কাগজে পৃষ্ঠা জুড়ে যাওয়া জনিত সমস্যার সমাধান ঃ ষ্টার্চ / শর্করা ঘটিত আঠার ক্ষেত্রে প্রথমে উচ্চমানের (চিকিৎসায় ব্যবহারের উপযোগী) ডায়াসটেস (Diastase) জল মিশিয়ে (৫% মিশ্রণ) ২০° সেঃ তাপমাত্রার প্রয়োগ করতে হবে। এতে যথেষ্ট ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতিতে কাগজ এবং কালির কোন ক্ষতি না হওয়ায় সেগুলো অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। অত্যন্ত পুরনো ছাপা পুঁথির ক্ষেত্রে আলফা অ্যামাইলোসের (α amylose) ব্যবহারে তৈরী নিরপেক্ষ (nutral) মিশ্রণের (pH ৭·০) ৬৫° সেঃ তাপমাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। যদিও এই পদ্ধতিতে ভাল ফল পাওয়া যায়, তবু এটি পুঁথি সম্বন্ধে কতটা নিরাপদ সে ব্যাপারে কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে। কারণ এভাবে জুড়ে যাওয়া পুঁথি খোলার পর অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে কালি কিছুটা ঝাপসা হয়ে গেছে এবং আগের তুলনায় কাগজও কিছুটা নরম এবং দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ষ্টার্চ মূলতঃ দু'ধরণের রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ - যে দুটি গ্লুকোজের বিভিন্ন ধাপ। ঐ মিশ্রণে কোনটির পরিমাণ কতটা হবে সেটা নির্ভর করে কোন উৎস থেকে ঐ ষ্টার্চ উৎপাদিত হয়েছে তার উপর। তবে সাধারণভাবে বলা চলে যে এতে ২৫% অ্যামাইলোস (amylose) এবং ৭৫% অ্যামাইলোপেকটিন (amylo-pec:in) থাকে। এই ষ্টার্চকে নষ্ট করতে, স্বল্পতম এন্‌জাইম প্রয়োগে কাজ হয়। এর অ্যামাইলোস ও অ্যামাইলোপেকটিনকে ডেক্সট্রিনে রূপান্তরিত করে নিতে হবে ; এই কাজটি খুব সহজেই আলফা অ্যামাইলোস প্রয়োগে করা সম্ভব কারণ এতে অ্যামাইলোস সম্পূর্ণভাবে এবং অংশিকভাবে অ্যামাইলোপেকটিনকে ডেক্সট্রিনে পরিবর্তিত করে। এইভাবে ডেক্সট্রিনে পরিবর্তিত হওয়ায় সহজেই ষ্টার্চকে অপসারণ করা সম্ভব। যদি তাপমাত্রা ৩৭° থেকে ৩৯° সেঃ মধ্যে হয়

এবং pH ৬ ৯৫তে থাকে তবে সবচেয়ে কম এন্‌জাইম ব্যবহারে (সবচেয়ে বেশী ০'৫% শক্তিসম্পন্ন মিশ্রণ, ওজন / পরিমাণ) সুফল পাওয়া সম্ভব। কোন কোন সময় এর চেয়েও কম শক্তিসম্পন্ন মিশ্রণের কাজ হয়। এই পদ্ধতিতে টিস্যু কত সময় লাগবে সেটা নির্ভর করে কত সহজে কাগজে মিশ্রণটি ঢুকতে পারছে তার উপর। বিক্রিয়া শেষ হবার পর অতিরিক্ত এন্‌জাইম সাধারণ জলে (২০° সেঃ তাপমাত্রায়) ধুয়ে এবং শেষবার গরম জলে (৫০° সেঃ) ধুয়ে নিতে হবে।

প্রোটিন ঘটিত আঠা সহযোগে প্রস্তুত আর্ট কাগজে পৃষ্ঠা জুড়ে যাওয়া জনিত সমস্যার সমাধান—প্রোটিন ঘটিত আঠা বলতে বোঝায় জৈব আঠা, যা সাধারণত অন্য ভেষজ আঠার সাথে মেশানো হয়। তাছাড়াও সাধারণ ময়দা থেকে তৈরী আঠাতেও কিছু পরিমাণ প্রোটিন থাকে।

এই জাতীয় আঠার ক্ষেত্রে ৪০° সেঃ এবং pH ৭'৪-এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে ০ ৫% ওজন/পরিমাণ ট্রাইপসিন ব্যবহার করা হয়। এর ব্যবহারে প্রোটিন ঘটিত আঠার ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া ৪০° সেঃ এবং pH ৭'৪৫-এ '০৫% ওজন/পরিমাণ শক্তি সম্পন্ন প্রোটিয়েজ (protease) ব্যবহার করা চলে। সাধারণভাবে বলা চলে শুধুমাত্র প্রোটিন আঠা ব্যবহৃত হয় না। যে আঠাতে প্রোটিন ঘটিত পদার্থ থাকে তাতে ষ্টার্চ ঘটিত আঠাও থাকে। সে কারণে আগে আলফা এ্যমাইলোজ ব্যবহার করার পরে প্রোটিয়েজ ব্যবহার করা উচিত। কারণ আলফা অ্যমাইলোজ নিজেই একটি প্রোটিন পদার্থ। অতএব আগের বিক্রিয়ার শেষে কাগজের মধ্যে আলফা অ্যামাইলোজ-এর যে রেশ থেকে যায় সেটাও প্রোটিয়েজ প্রয়োগে ধ্বংস করা সম্ভব।

যেসব ক্ষেত্রে রঙ্গীনকালি অথবা রং-এর ব্যবহার করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। প্রথমে সেলুলোজ অ্যাসিটেট অ্যাসিটোনে (cellulose acetate in acetone) মিশিয়ে অথবা পলিক্রাইনীল অ্যাসিটেট্ (polycrinyl) টোলিউন মিশ্রণ প্রয়োগে কালি অথবা রংকে স্থায়ী করে নিতে হবে এন্‌জাইম প্রয়োগের আগে। একটা কথা সব সময় মনে রাখা দরকার যে পার্চমেণ্ট এবং ভেলামের পাণ্ডুলিপিতে কখনও প্রোটিয়েজ প্রয়োগ করা উচিত নয় কারণ এই মাধ্যমগুলো মূলতঃ প্রোটিনে তৈরী হওয়ায় এর প্রয়োগে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

এবার দেখা যাক কিভাবে এন্‌জাইম প্রয়োগ করলে সবচেয়ে ভাল ফল লাভ

করা সম্ভব। প্রয়োগের আগে প্রথমেই দেখে নিতে হবে যে কালি জলে কোন ভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, এমন ভাবে স্থায়ী করে নেওয়া হয়েছে। একমাত্র তার পরে কাজ সুরু করা চলবে।

এন্‌জাইমের বোতল প্লাষ্টিকের ব্যাগে করে রেফিজারেটরের ফ্রিজার সিলিকা জেলের সঙ্গে রাখা হয়। দরকার মত প্রয়োজনীয় শক্তি সম্পন্ন মিশ্রণ তৈরী করে নিতে হবে এবং সেটা ঠান্ডায় ফ্রিজারে রেখে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে এই মিশ্রণ বেশীদিন রাখা সম্ভব নয়, কারণ অল্প কয়েক দিনের মধ্যে এটা নষ্ট হয়ে যায়। দেখতে হবে কোন আঠা নষ্ট করতে হবে—কাগজের ষ্টার্চ ঘটিত অথবা প্রোটিন ঘটিত কিংবা দুই রকমের আঠাই। কারণ এর উপরই নির্ভর করবে কোন মিশ্রণ ব্যবহার করা হবে। ৯00 মিলিলিটার জল 80° সেঃ গরম করে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় মিশ্রণটি মেলাতে হবে ১00 মিলিলিটার পরিমাণে। এবার সিংকে (sink) গরমজলে পাত্র রেখে তার মধ্যে পাতলা করা (dilute) মিশ্রণ ঢালতে হবে। পাত্রের মধ্যে তাপনির্ধারিক যন্ত্র (থার্মোমিটার) রাখতে হবে কারণ নজর রাখা দরকার যেন মিশ্রণের তাপমাত্রা মোটামুটি ৩৭° সেঃ-এ থাকে, কারণ 80° সেঃ-এর বেশী তাপমাত্রায় এন্‌জাইম নষ্ট হয়ে যায়, আবার বেশী নীচু তাপমাত্রায় এর কর্মক্ষমতা অত্যন্ত কমে যায়। যদি ষ্টার্চ ঘটিত আঠা অপসারণের দরকার হয় তবে মিশ্রণে ১ গ্রাম (ছোট চামচের এক চামচ পরিমাণ) আলফা অ্যামাইলোস মিশিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে হবে। এবার প্রয়োজনীয় কাগজটি দুদিকে দুটো রক্ষাকারী কাগজ দিয়ে (যাতে মূল কাগজটি সহজে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়) ঐ মিশ্রণে আস্তে আস্তে ডুবিয়ে দিতে হবে। মিশ্রণটি মাঝে মাঝে নাড়তে হবে এবং তাপমাত্রার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় পুরো আঠা অপসারণে কতক্ষণ সময় লাগবে। সেটি আধ ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে যে কোন সময়ই হতে পারে। বিক্রিয়া শেষ হয়েছে কিনা বুঝবার জন্যে কিছুক্ষণ পর পর কাগজের গায়ে ব্লটিং লাগিয়ে নিয়ে সেটা পাতলা আয়োডিন মিশ্রণে (dilute iodine solution) ডোবাতে হবে। যদি ব্লটিংএ লালচে (purple) ছোপ ধরে তবে বুঝতে হবে তখনও কিছু ষ্টার্চ রয়েছে, সবটা নষ্ট হয়নি। যদি প্রোটিন অপসারণের দরকার হয় তবে তার উপযুক্ত পাতলা মিশ্রণ আগের মত গরম করে নিয়ে (৩৭° সেঃ) সেটাতে ১ গ্রাম প্রোটিয়েজ মিশাতে হবে। আগের মতই তাপমাত্রা ৩৭° সেঃ-এ রাখতে হবে। এই ভাবে সব আঠা নষ্ট করে ফেলার পর কাগজকে আবার ভাল করে ধুয়ে নিয়ে দরকার মত বিঅম্লীকরণ করে তারপর সাইজিং করে নিতে হবে।

সারানর জন্য ল্যামিনেশনের মাধ্যমে কাগজের দুর্বলতা দূরীকরণ

নানাভাবে যথা জলে ভিজে, কীটপতঙ্গের আক্রমণে, বয়সজনিত কারণে অথবা ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে কাগজ দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং আস্তে আস্তে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে যায়। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য দরকার সারানর এবং তারই একটি পন্থা হচ্ছে ল্যামিনেশন।

সারানর কাজ করবার সময় প্রায়ই নজরে পড়ে কাগজের উপর নানা ধরণের দাগ পড়েছে। সারানর আগে এই সব দাগ অপসারণ দরকার। কিন্তু এই দাগ অপসারণের আগে জানতে হবে দাগটি কিসের জন্য এবং কি ভাবে পড়েছে কারণ বিভিন্ন ধরণের দাগ অপসারণে বিভিন্ন উপাদানের দরকার হয়। এমন অনেক উপাদান আছে যাতে একধরণের দাগ অপসারিত হলেও অন্য কোন ধরণের দাগ এতে তো অপসারিত হয়ই না, বরং আরো স্থায়ী হয়ে যায়। সেজন্য কারণ অনুসন্ধানটা হচ্ছে প্রাথমিক কাজ।

সাধারণভাবে আমরা জানি যে দাগ অপসারণের উপকরণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত এবং যার নাম প্রথমেই মনে আসে সেটি হচ্ছে জল— কারণ এটি সবচেয়ে সহজলভ্য, সস্তা, অদাহ্য, নিরাপদ, গন্ধহীন এবং বিষাক্ত নয়। জলের সম্বন্ধে "নিরাপদ" কথাটা ব্যবহার করার কারণ সাধারণভাবে অধিকাংশ মাধ্যমের উপর এর নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রয়োগে কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে অনেকক্ষণ প্রয়োগে এটি কাগজেরও ক্ষতি করে। কয়েক ধরণের চামড়ার ক্ষেত্রে, বার্চছালের পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেও এটি ক্ষতিকর। জল ছাড়া যে সব উপকরণ এইসব কাজে ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে আছে—বেনজিন, অ্যালকোহল, ক্লোরোফরম, পেট্রল, টোলিউন ইত্যাদি। এইসকল উপকরণ সাধারণত খুব নরম পাতলা ব্রাস অথবা নরম তুলো কিংবা নরম কাপড়ের সাহায্যে লাগানো হয়। কাগজে যেদিকে দাগ লেগেছে সেদিকটা একটা পরিষ্কার ব্লটিং কাগজের উপর রেখে (দাগের দিকটা নীচের দিকে অর্থাৎ ব্লটিংয়ের দিকে) যেদিকে দাগ লেগেছে তার উল্টো দিকে বারবার অল্প অল্প করে দ্রাবক

(solvent) প্রয়োগ করতে হবে এবং ব্লটিং কাগজ দরকার মত মাঝে মাঝে পাল্টে দিতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না দাগটি আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়। যদি সঠিক দ্রাবক নির্বাচন করা হয় এবং প্রয়োগ যদি যথাযথ হয় তাহলে দাগ সম্পূর্ণভাবেই উঠে যাবে।

গ্রন্থাগারের সংগ্রহে নানাধরণের দাগ দেখা যায়, যার কারণ বিভিন্ন এবং সেগুলো অপসারণের জন্য যেসব দ্রাবকের দরকার সেগুলোর উল্লেখ নীচে করা হ'ল। কিন্তু কোন দ্রাবক ব্যবহারের আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে সেটা মাধ্যমের কোন রকম ক্ষতি করবে না।

দাগের কারণ	ব্যবহার্য দ্রাবক
আলকাতরা	(ক) পেট্রল
	(খ) বেনজিন
	(গ) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড
	(ঘ) পাইরিডিন
আয়োডিন	ইথাইল অ্যালকোহল
কালি—ফাউণ্টেন পেনের	৫% অক্জালিক অ্যাসিড
কপিং কালি	মেথিলেটেড স্পিরিট ও অ্যামোনিয়া
ছাপার কালি	প্রথমে তারপিন, পরে পেট্রল
মার্কিং কালি	পটাশিয়াম ফেরোসায়ানাইডের সলিউশন
কফি	(ক) হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড
	(খ) প্রথমে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট সলিউশন, পরে পাতলা (dilute) সালফিউরিক অ্যাসিড
	(গ পটাশিয়াম পারবোরেট
কাদা	(ক) জল
	(খ) অ্যামোনিয়া
গ্রীজ	(ক) অ্যালকোহল
	(খ) পেট্রল (দাহ্য)
	(গ) পাইরিডিন
	(ঘ) বেনজিন

দাগের কারণ	ব্যবহার্য দ্রাবক
	(ঙ) ট্রাইক্লোরোইথিলিন
	(চ) তারপিন
	(ছ) ক্লোরোফর্ম
	(জ) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড
	(ঝ) কার্বন ডাই-সালফাইড
চা	(ক) হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড
	(খ) পটাশিয়াম পারবোরেট
	(গ) প্রথমে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট সলিউশন, পরে পাতলা (dilute) সালফিউরিক অ্যাসিড
ছত্রাক	(ক) ইথাইল অ্যালকোহল
	(খ) বেনজিন
গঁদের আঠা	ঈষতঃ গরম জল
গালা	ইথাইল অ্যালকোহল
আঠা (সাধারণ)	জল
মোম	(ক) পেট্রল
	(খ) ক্লোরোফর্ম
	(গ) কার্বন-ডাইসালফাইড
	(ঘ) অ্যালকোহল
	(ঙ) পাইরেডিন
	(চ) বেনজিন
	(ছ) তারপিন
	(জ) ট্রাইক্লোরোইথিলিন
	(ঝ) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড
ল্যাকার	অ্যাসিটোন
রং	(ক) বেনজিন এবং অ্যালকোহলের মিশ্রণ
	(খ) প্রথমে পাইরেডিন এবং পরে জল
	(গ) তারপিন

দাগের কারণ	ব্যবহার্য দ্রাবক
তেল এবং ঐ জাতীয় পদার্থ	(ক) অ্যালকোহল
	(খ) কার্বন-ডাইসালফাইড
	(গ) কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড
	(ঘ) ক্লোরোফর্ম
	(ঙ তারপিন
	(চ) পাইরেডিন
	(ছ) পেট্রল
	(জ) বেনজিন
	(ঝ) ট্রাইক্লোরোইথিলিন
বার্নিশ	(ক) অ্যালকোহল
	(খ) অ্যাসিটোন
	(গ) পাইরেডিন
লোহার দাগ	(ক) ৫% অক্‌জালিক অ্যাসিড
	(খ) সাইট্রিক অ্যাসিড
	(গ) সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইড
	(ঘ) টারটারিক অ্যাসিড
লিপস্টিক	প্রথমে ৫% টারটারিক অ্যাসিড এবং পরে জল
রক্তের দাগ	সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে কত বিভিন্ন ধরণের দ্রাবকের ব্যবহার হয় দাগ অপসারণের জন্য। এই সব দ্রাবকের মধ্যে অধিকাংশ খুবই দাহ্য আবার কিছু আপত্তিকর গন্ধযুক্ত। কয়েকটা আবার যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন না করলে মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারকও হতে পারে—যে কক্ষে বা পরীক্ষাগারে এই সব দ্রাবক নিয়ে কাজ করতে হবে, সেখানে ভালভাবে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে এই সব দ্রাবকের ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া সীমিত করা সম্ভব।

কাগজ বা অন্য পাণ্ডুলিপির উপর থেকে দাগ অপসারণের পর সেটাকে পরিষ্কার করার পর দুর্বল অংশগুলিকে নানাধরণের সারানর মাধ্যমে মজবুত করে তোলা হয়। এই কাজে কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখা দরকার যেমন কোন

অবস্থাতেই পাণ্ডুলিপির অথবা বইয়ের পাঠযোগ্যতার অবনতি ঘটতে দেওয়া হবে না, আগের চেহারা যতটা সম্ভব রক্ষা করা হবে এবং যতটা বেশী সম্ভব মজবুত করে তুলতে হবে।

সারানর নানা পদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানা থাকলেও এই ব্যাপারে সত্যিকারের পটুতা অর্জনের একটিই মাত্র পথ—হাতে কলমে কাজ করে হাত পাকানো।

সারানর নানা পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যেকটিরই কিছু সুবিধা আর অসুবিধা আছে। প্রত্যেক প্রকার সারানর আগে তার নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতিটিই নির্বাচন করে সেটির ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

কাগজের একটা প্রান্ত কোনভাবে খোঁচা লেগে বা টান লেগে কিছুটা ছিঁড়ে গেলে সেটা সারান কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু যখন বয়সের জন্য বা অন্য কোন কারণে ক্রমাবনতির ফলে কাগজ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে তখন কাগজকে আবার মজবুত করে তোলা যথেষ্ট সময় এবং পরিশ্রমসাধ্য। এব্যাপারে যেসব পদ্ধতি কাজে লাগানো যেতে পারে তাদের মধ্যে প্রথমে যেটির কথা মনে আসে সেটি হচ্ছে ল্যামিনেশন।

পাণ্ডুলিপি, পুঁথি, বই ইত্যাদি সারানর জন্য কখনও টিসু কাগজ, কখনও বা রেশমী কাপড়, সিফন, অথবা সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফয়েলের সাহায্য নেওয়া হয়। অল্প ছিঁড়ে যাওয়া পৃষ্ঠার পেছনে উপযুক্ত শক্ত কাগজের টুকরো লাগিয়ে (যেক্ষেত্রে লেখা শুধু একদিকেই থাকে), কখনও টুকরো অংশ অথবা অংশগুলো খুঁজে এনে সেগুলো যথাস্থানে উপযুক্ত মাধ্যমের সাহায্যে লাগানো হয়। কাগজের মাঝের ফুটো কাগজের মণ্ড অথবা টিসু কাগজ ইত্যাদির সাহায্যে সারান যেতে পারে।

অত্যন্ত দুর্বল কাগজকে মজবুত করে তোলার জন্য কয়েকধরণের রাসায়নিক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

এইসব পদার্থের মধ্যে আছে—

(ক) সেলুলোজ নাইট্রেট ১০% অ্যালকোহলে মিশ্রণ। এই মিশ্রণ সাধারণভাবে সেলিট্ (Cellit) নামে পরিচিত।

(খ) দ্রবণীয় নাইলন ১·৫% অ্যালকোহলে মিশ্রণ ৪০° সেঃ তাপমাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। এই মিশ্রণ সাধারণভাবে ক্যালটন (Calton) নামে পরিচিত।

(গ) কার্বোক্সি-মিথাইল সেলুলোজ ২.৫% থেকে ৫% জলে মিশ্রণ। সাধারণভাবে এই মিশ্রণ গ্লুটোফিক্স (Glutofix) নামে পরিচিত।

(খ) পলিভিনাইল অ্যালকোহল ১% থেকে ৫% টোলিউনে মিশ্রণ।

সারানর জন্যে এই মিশ্রণে ক্ষতিগ্রস্থ পৃষ্ঠাকে ভেজানো দরকার। এই কাজটি করার জন্য মিশ্রণ ছিটিয়ে অর্থাৎ স্প্রে করে অথবা অত্যন্ত নরম ব্রাসের সাহায্যে পৃষ্ঠার উপর প্রয়োগ করতে হবে। এই ধরণের মিশ্রণ প্রয়োগে মজবুত করা ছাড়াও, ক্রমাবনতি রোধে অত্যন্ত কার্যকরী। এই পদ্ধতিটিই রাসায়নিক ল্যামিনেশন।

কাগজ বেশ দুর্বল হয়ে যাবার ফলে এটি ভঙ্গুর অথবা অত্যন্ত ফুলে ওঠে, তখন এটিকে টেকসই করে তুলতে দরকার ভাল মানের, উপযুক্ত মাত্রায় পুরু এবং ওজনের টিস্যু কাগজ অথবা সূক্ষ্ম রেশমী কাপড়, যা দুইদিক থেকে কাগজের উপর লাগিয়ে কাগজের দুর্বলতা দূর করা যায়। টিস্যু কাগজ লাগানো অপেক্ষাকৃত সহজ। যদি সঠিকভাবে লাগানো যায় তবে টিস্যু কাগজ সম্পূর্ণ অদৃশ্যভাবে পৃষ্ঠার উপর লেগে যায়। অল্প ক্ষতিগ্রস্ত কাগজের জন্য এটির প্রয়োগই যথেষ্ট। কারণ এভাবে সারানর পর অন্য কোন ধরণের সারানর দরকার হয় না। একবার এইভাবে সারান কাগজের ক্রমাবনতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

টিস্যু কাগজ ব্যবহার না করে রেশমী কাপড় (সিফন) সহযোগে সারান কাগজ অপেক্ষাকৃত বেশী মজবুত হয়ে উঠলেও, সারানর এই সুফল মাত্র ২৫ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। যেসব কাগজ খুবই ক্ষতিগ্রস্থ আর দুদিকেই লেখা আছে সেগুলোর জন্য এই পদ্ধতির ব্যবহার করা চলে। ঠিকমত ব্যবহার করলে এটিও সম্পূর্ণ অদৃশ্যভাবে কাগজের উপর লেগে যায়। সম্পূর্ণ ভঙ্গুর কাগজকেও টিস্যু কাগজ অথবা সিফন দিয়ে সারান হয়।

যেসব কাগজ ভাঁজ হয়ে গেছে সেগুলোকে আগে খুলে সোজা করতে হবে। অর্থাৎ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। পোকায় খাওয়া, জীর্ণ কাগজ—তার অবস্থা, তার উপর লেখা বা ছাপার পরিমান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সারানর জন্যে ব্যবহার্য উপকরণের নির্বাচন করতে হবে। যদি কাগজের একদিকে ছাপা থাকে তবে যেদিকে ছাপা নেই সেদিকে হাতে তৈরী কাগজ কেটে সারান চলে। কিন্তু দুইদিকেই ছাপা কাগজের ক্ষেত্রে টিস্যু কাগজ

অথবা সিফণের অথবা ঐ জাতীয় পদ্ধতির প্রয়োগ ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না।

টিস্যু কাগজ অথবা সিফন অথবা অন্যকিছু উপযুক্ত মাধ্যম যাই ব্যবহার করা হোক না কেন এই ধরণের সারানর আগে সব সময় যে কাগজটি সারান হবে সেটি থেকে সবধরণের ত্রুটি যেমন অত্যাধিক শুষ্কতা, অম্লতা ইত্যাদি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দূর করে নিতে হবে।

রেশমী কাপড়ের ল্যামিনেশনের মাধ্যমে সারানর কাজ খুব উঁচুমানের সিফন বা রেশমী কাপড় (যেটি সমানভাবে বোনা এবং প্রতি ইঞ্চিতে ৯০ থেকে ৯৫টি সুতো থাকে) ব্যবহার করতে হবে। টিস্যু ল্যামিনেশনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হচ্ছে—জাপানী টিস্যু কাগজ—"তোসা বি" কিংবা "মিনো এ এ" (Tosa B, Mino A A)।

টিস্যু ল্যামিনেশনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ অথবা দুর্বল কাগজ দুটি টিস্যু কাগজের মধ্যে রেখে সেটে দেওয়া হয়। এই কাজে দরকার আঠা। ল্যামিনেশনে ব্যবহৃত আঠার কয়েকটি গুণ থাকা দরকার—যেমন এর জোড়া লাগানোর ক্ষমতা ছাড়াও, কিছুটা সংরক্ষণের সহায়ক এবং কীট পতঙ্গ/ছত্রাক ইত্যাদি প্রতিরোধক ক্ষমতা। এটি এমন হওয়া উচিত যাতে এটি লাগানোর পক্ষে সুবিধাজনক এবং প্রয়োজন হলে বিশেষ কোন পদ্ধতি অথবা উপায়ে আবার খোলা যায়, কাগজের কোন ক্ষতি না করে। নানা ধরণের আঠা এবং তার প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

অত্যন্ত দুর্বল কাগজের ক্ষেত্রে 'সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফয়েল ল্যামিনেশন' অত্যন্ত ফলপ্রসু এবং উপযুক্ত।

এতে প্রথমে টিস্যু কাগজ তার উপর অত্যন্ত সুক্ষ্ম (০০০৮৮" পুরু) সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফয়েল, তার উপর ক্ষতিগ্রস্থ দুর্বল কাগজ তার উপর

টিস্যু ল্যামিনেশন

I ক্ষতিগ্রস্ত কাগজ II সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফয়েল III টিস্যু কাগজ

আবার সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফয়েল এবং সবচেয়ে উপরে আবার টিস্যু কাগজ

দিয়ে সবগুলোকে তাপ এবং চাপের মাধ্যমে জুড়ে দেওয়া হয়। এই কাজে ব্যবহৃত টিস্যু কাগজকে মোম অথবা তৈলাক্ত উৎপাদন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া উচিৎ। এটিকে তাপ এবং চাপ প্রয়োগের জন্য সাধারণত টেফলনের (Teflon) আস্তরণযুক্ত কাপড়ের মধ্যে রেখে ল্যামিনেশনের যন্ত্রের উত্তপ্ত দুটি ধাতব পাতের মধ্যে চেপে দেওয়া হয়। উত্তপ্ত ধাতব পাতের তাপমাত্রা ১৪৫° থেকে ১৫৫° সেঃ এর মধ্যে থাকে। ঐ তাপমাত্রায় সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফয়েল নরম হয়ে যায়। উপরের ধাতব পাতের মাধ্যমে যে চাপ দেওয়া হয় তার পরিমাণ হচ্ছে ৩০ থেকে ৪০ কেজি প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে। এই অবস্থায় ২—৩ মিনিট থাকার পর চাপ থেকে মুক্ত করে রোলারের মাধ্যমে ল্যামিনেটেড্ কাগজটি বেরিয়ে আসে যন্ত্র থেকে। এবার কাগজ থেকে একটু বড় করে (মোটামুটি ৩ মিলি মিটার) চারদিকটা ছেঁটে নিতে হবে। সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফয়েল ল্যামিনেশন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে, আমেরিকার ন্যাশন্যাল ব্যুরো অব স্ট্যাণ্ডার্ডস্ ১৯৩৫ সালে। প্রথমে ল্যামিনেশনের জন্য যে বাষ্পের সাহায্যে হাইড্রোলিক যন্ত্রটি ব্যবহার করা হ'ত সেটি যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ হওয়ায়, উইলিয়াম জেমস্ ব্যারো অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট এবং সস্তা যন্ত্র তৈরী করেন ১৯৩৮ সালে। এই যন্ত্রে বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে উত্তপ্ত ধাতব পাত দুটি রোলারের সাহায্যে চেপে দেবার ব্যবস্থা যুক্ত। এর দ্বারা প্রতি ইঞ্চিতে ৩০০ থেকে ২০০০ পাউণ্ড (অর্থাৎ ২.৫ সেমি এ ১৪০ থেকে ৯৩৩ কেজি) পরিমাণ চাপ সৃষ্টি সম্ভব। এই যন্ত্রে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না, বাষ্পের সাহায্যে উত্তপ্ত হাইড্রোলিক যন্ত্রের ক্ষেত্রে যার দরকার হ'ত। এইটিতে আরেকটি বড় সুবিধা হচ্ছে রোলারের মাধ্যমে একধার থেকে আস্তে আস্তে চাপটা পুরো কাগজে ছড়িয়ে পড়ায় কাগজের ল্যামিনেশনের মধ্যে কোথাও বাতাসের বুদ্বুদ থেকে যাবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না, যেটা আগেকার যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটত। এই যন্ত্র উদ্ভাবনের সাথে সাথেই ডবল্যু জে ব্যারো আধুনিক সেলুলোজ অ্যাসিটেট্ ফয়েল ল্যামিনেশন ব্যবস্থা চালু করেন। তার আগে পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে বাইরের আবরণের জন্য টিস্যু কাগজের ব্যবহার করা হত না ফলে সারান কাগজ অন্যদিক থেকে মজবুত হয়ে উঠলেও সহজেই ছিঁড়ে যেতে পারত এবং ভাঁজ জনিত ক্ষতি প্রতিরোধের ক্ষমতারও এতে যথেষ্ট অভাব ছিল। টিস্যু কাগজের ব্যবহারের মাধ্যমে এই ধরণের অসুবিধাগুলো দূর করা হয়।

এইভাবে সারান কাগজের স্থূলতা ক্ষতিগ্রস্থ কাগজের তুলনায় বড় একটা হেরফের হয় না—প্রায় একই থাকে, কারণ সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফয়েল এবং টিস্যু কাগজ দুইটিই অত্যন্ত পাতলা।

যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া টিস্যু কাগজ এবং সেলুলোজ অ্যাসিটেট সহযোগে সারানর পদ্ধতি

ছোটখাট গ্রন্থাগারের পক্ষে ল্যামিনেশনের যন্ত্র রাখা সম্ভব নয়, সেজন্য যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া ল্যামিনেশনের আরেকটি পদ্ধতি চালু আছে। এই পদ্ধতিকে আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী করে কিছু রদবদল করে নিয়েছে ভারতের জাতীয় মহাফেজখানা (ন্যাশন্যাল আরকাইভস্)। যদিও এতে যন্ত্রের ব্যবহার করা হয় না, তবু এভাবে সারান কাগজ যন্ত্রে সারান কাগজের তুলনায় কোন অংশে কম মজবুত হয় না।

এই পদ্ধতিতে প্রথম একটি মসৃন পরিষ্কার কাচের শীট নেওয়া হয়। কাচের উপর প্রথমে ক্ষতিগ্রস্থ কাগজটি রেখে তার উপর সেলুলোজ অ্যাসিটেট্ ফয়েল রাখতে হবে—যে কাগজটি সারান অর্থাৎ ল্যামিনেশন করা হবে তার চেয়ে ঐ শীট সবদিকেই একটু বড় হওয়া দরকার। সেলুলোজ অ্যাসিটেট্ ফয়েলের উপরে জাপানী টিস্যু কাগজ রাখতে হবে। এবার খুব নরম কাপড়ের টুকরো অথবা তুলো দিয়ে টিস্যু কাগজের ওপর আস্তে আস্তে অ্যাসিটোন লাগাতে হবে—কাগজের ঠিক মাঝখান থেকে ক্রমশ ধারের দিকে তুলো চালাতে হবে। অ্যাসিটোনের প্রতিক্রিয়ায় সেলুলোজ অ্যাসিটেট শীট নরম হয়ে গিয়ে টিস্যু কাগজের সাথে ক্ষতিগ্রস্থ কাগজটি জুড়ে দেবে। এইভাবে একদিকটা সম্পূর্ণ হবার পর সেদিকটা পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে ঠিক একইভাবে আবার অপর দিকটা করে নিতে হবে। অ্যাসিটোন প্রয়োগ হবার পর মাঝারী চাপে ২/১ দিন রেখে কাগজটি শুকোবার ব্যবস্থা করতে হবে। দুদিক সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবার পর সেলুলোজ অ্যাসিটেট্ শীট্টা যেটুকু বড় ছিল সেটা কাঁচি দিয়ে আস্তে আস্তে পৃষ্ঠায় সমান করে কেটে দিতে হবে। যে ঘরে অথবা পরীক্ষাগারে এই কাজগুলি করা হবে লক্ষ্য রাখতে হবে সেখানে যেন ভালভাবে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে কারণ অ্যাসিটোন বাষ্পের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। এছাড়াও সব সময়ই মনে রাখা দরকার অ্যাসিটোন খুবই দাহ্য পদার্থ অতএব কাজকর্মের সময় যথেষ্ট সাবধানতা

অবলম্বন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই একই পদ্ধতিতে টিস্যু কাগজের বদলে সিফন অথবা রেশমী কাপড়ের ব্যবহার করা চলে।

পরীক্ষাগারে টিস্যু কাগজ সহযোগে সারানর পদ্ধতি—ক্ষতিগ্রস্ত পৃষ্ঠা থেকে কিছুটা বড় আকারের দু'টুকরো মোম কাগজ (wax paper) নিয়ে তার একটা টুকরো টেবিলে পেতে তার উপর ক্ষতিগ্রস্ত কাগজটি রাখা হবে। এবার নরম এবং চওড়া ব্রাশের সাহায্যে ডেক্সট্রিন আঠার প্রলেপ লাগাতে হবে কাগজের উপর। সমানভাবে কাগজের উপর আঠা লাগাবার পর তার উপর টিস্যু কাগজ আস্তে আস্তে টানটান করে লাগাতে হবে—পৃষ্ঠার এক প্রান্ত থেকে আলতো চাপে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এমনভাবে কাগজকে মসৃণ করা হবে যাতে কাগজ এবং টিস্যু কাগজের মধ্যে কোথাও বাতাস না থাকে। এবার পৃষ্ঠাকে শুকোবার জন্য খোলা অবস্থায় রেখে দিতে হবে। পরে অন্য মোম কাগজটি পৃষ্ঠার ওপর রেখে সম্পূর্ণ কাগজটি উল্টে অপর দিকটাতেও একই ভাবে টিস্যু কাগজ লাগাতে হবে। সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবার পর পৃষ্ঠাটি ১/২ দিন চাপের মধ্যে রাখা দরকার।

সিফন সহযোগে সারান—সিফন দিয়ে সারানর জন্যও ডেক্সট্রিন আঠা ব্যবহার করা হয়। এই ক্ষেত্রে নজর রাখতে হবে সিফনের টুকরো যাতে কোনো জায়গাতেই কুঁচকে না থাকে। এ ব্যাপারে কাজের সুবিধার জন্য কাপড়টি টানটান করে পেতে নিতে হবে। প্রয়োজনবোধে মাঝখান থেকে পাশের দিকে আলতো করে কাপড়টিকে টানটান করা উচিত। এবার তার ওপর নরম ব্রাশ-দিয়ে আঠার প্রলেপ লাগাতে হবে। টিস্যু কাগজের ল্যামিনেশনের মতই এক্ষেত্রেও দুদিকেই সিফন লাগাতে হবে। দুদিকই সারানর পর শুকিয়ে গেলে দুই এক দিনের জন্য কাগজটি চাপের মধ্যে রাখতে হবে।

পলিথিন ল্যামিনেশন—১৯৭০ সালে পলিথিন ল্যামিনেশন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হবার পর থেকে এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে নানা দেশে। সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফয়েল ল্যামিনেশনের মতই এটিতে পলিথিনের পাতলা চাদর তাপ এবং চাপ প্রয়োগে জুড়তে হয়। এই পলিথিন চাদরের স্থূলতা ·০৩—·০৪ মিলিমিটারের মত হয়ে থাকে। এই কাজের জন্য যন্ত্রের চাপ দেবার প্লেটের তাপমাত্রা ১২০°—১৩০° সেঃ এর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। দামী যন্ত্রের অভাবে সাধারণ ইস্ত্রি গরম করে তার সাহায্যেই কাজটা সেরে নেওয়া চলে। আমাদের দেশে পলিথিন সহজলভ্য, অতএব সহজেই দরকার মত এই পদ্ধতির ব্যবহার করা সম্ভব।

কাগজের, পাণ্ডুলিপি অথবা অন্য যা কিছুরই ল্যামিনেশন করা হোক না কেন, এটা মনে রাখা দরকার যে কাজটা এমন ভাবে করতে হবে যাতে

(১) কাগজের পাণ্ডুলিপির নমনীয়তা কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

(২) সারানর জন্য যা করা হোক না কেন পদ্ধতিটি যেন এমন হয় যাতে প্রয়োজনে বিপরীত প্রক্রিয়া (reversible) ঘটানো যায়।

(৩) এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে কাগজ / পাণ্ডুলিপির রং যেন পরিবর্তিত না হয়।

(৪) পাণ্ডুলিপির পাঠযোগ্যতা যেন কোন ভাবেই ক্ষুন্ন না হয়।

(৫) সারানর কাজে এমন কিছুই ব্যবহার করা চলবে না, যেটা মূল পাণ্ডুলিপির মাধ্যমের সঙ্গে কোন ধরণের বিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

(৬) সারানর ফলে মূল কাগজের স্থূলতা অথবা ওজনের বড় ধরণের কোন হেরফের যেন না হয়।

বিশেষ কয়েক ধরণের মাধ্যম, যেমন তালপাতা, পার্চমেন্ট, বার্চজাতীয় গাছের ছাল, অত্যন্ত পুরানো কাগজের পুঁথির ক্ষেত্রে ল্যামিনেশনের বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এর জন্য সেলুলোজ ট্রাইঅ্যাসিটেটের পাতলা চাদর ব্যবহার করা হয়। ৬০° সেঃ তাপমাত্রায় ১ থেকে ২ মিনিটের মধ্যে এই ল্যামিনেশন সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

এনক্যাপসুলেশন (Encapsulation)—এই পদ্ধতিতে তাপ, চাপ অথবা কোন রাসায়নিক প্রয়োগ ছাড়াই সেলুলোজ অ্যাসিটেট্, পলিইথেইন অথবা পলিয়েস্টারএর খাপের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ কাগজ অথবা পাণ্ডুলিপি পুরে দিয়ে ধারটি অথবা ধারগুলি কৃত্রিম রাসায়নিক আঠা অথবা আঠালো টেপের সাহায্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে বাইরের আবহাওয়ার দূষণ অথবা অন্য ক্রমাবনতিকারক পদার্থের এবং ছত্রাক, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পায় অথচ দরকার মত সহজেই এই রক্ষাকারী আবরণ থেকে পাণ্ডুলিপি বা কাগজটি সহজেই বার করে নেওয়া যায়। শুধুমাত্র ক্রমাবনতিই এতে রুদ্ধ হয় না এর ফলে কাগজটি কিছুটা মজবুতও হয়ে পড়ে।

কৃত্রিম আঠা অথবা আঠালো টেপ ব্যবহারে কিছু অসুবিধার জন্য সাম্প্রতিক কালে প্রান্তগুলো বন্ধ করে দেবার জন্য কয়েক ধরণের যন্ত্রের উদ্ভাবন করা হয়েছে যার মাধ্যমে কোথাও তাপ প্রয়োগে, কোথাও বা শব্দোত্তর কম্পন (ultrasound vibration) প্রয়োগে প্রান্তগুলো বন্ধ করা হয়ে থাকে। স্বভাবতই এই সব যন্ত্র যথেষ্ট মূল্যবান এবং খুব বড় গ্রন্থাগার ছাড়া অন্য সকলেরই আর্থিক ক্ষমতার বাইরে।

গ্রন্থাগারের বিবিধ কাজে ব্যবহৃত নানাধরণের আঠা

আঠার ব্যবহার বহুদিনের। সেদিক থেকে এটি একটি পুরানো জিনিষ হলেও গত কয়েক দশকে এই বিষয়ে নানাধরণের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। বাজারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নানাধরণের কৃত্রিম আঠা পাওয়া যায়, ফলে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন জাগে সবচেয়ে সাফল্যের সঙ্গে কোন আঠা কি কাজে ব্যবহার করা যাবে? প্রশ্নটা যত ছোট উত্তরটা কিন্তু ততটা সহজ নয়। সেই উত্তর খুঁজবার আগে নানাধরণের আঠা সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করে নেওয়া যাক।

আঠার সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয় বই বাঁধাইয়ের কাজে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঁধাইয়ে ব্যবহৃত আঠা বইয়ের ক্ষতি করে। আঠা সাধারণতঃ কাগজের মধ্যে কোন ক্ষতির সৃষ্টি না করলেও আঠার সংস্পর্শে আসলে কাগজ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। অধিকাংশ আঠাই শুকিয়ে গেলে অত্যন্ত শক্ত হয়ে যায় এবং ধারালো কোনের (ধারের) সৃষ্টি করে ফলে ঐ অংশ কোন কারণে বাঁকালে ফেটে যেতে পারে। ব্যবহারের পক্ষে এই ধরণের আঠা উপযোগী নয়।

আঠার কাজ হচ্ছে দুটি কাগজকে অথবা অন্য মাধ্যমকে জুড়ে দেওয়া। এই জোড়ার কাজটা রাসায়নিক (chemical) অথবা ভৌতিক (mechanical) যে কোনভাবেই হতে পারে। ভৌতিকভাবে জুড়ে যাবার ব্যপারটা ঘটে এইভাবে—এই আঠা যার উপরে লাগানো হয়েছে সেই কাগজের উপরের তলের ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি করে এবং আঠা শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গর্তের মধ্যে ছোট ডাম্বেলের আকারের সংযোজকের রূপ নেয়। এরই মাধ্যমে দুটি কাগজ জুড়ে যায়। আঠার সাহায্যে জোড়ালাগা কাগজের অংশের পার্শ্বচ্ছেদ (ross sectron) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে এটি নজরে আসে।

কোন আঠা রাসায়নিকভাবে কাজ করলে সেটি বোঝা যায়, যদি আমরা দুটো কাগজ নিয়ে একটি সাধারণ পরীক্ষা করি। কাগজ দুটির মধ্যে একটি পরিষ্কার সাধারণ কাগজ, অন্যটি মোমের আস্তরণযুক্ত। দুটি কাগজের উপরই পাতলা আঠা প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে সাধারণ কাগজটি ভিজলেও

মোম কাগজের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। কারণ মোমের আস্তরণ আঠাকে কাগজের উপর প্রতিক্রিয়া করতে দিচ্ছে না। আঠা যদি উচ্চমানের হয় তবে এরদ্বারা জুড়লে সেই জোড় হয় অত্যন্ত মজবুত এবং স্থায়ী। টেনে এই জোড় খুলতে গেলে কাগজই ছিড়ে যায় অথচ জোড় খোলে না।

কোন আঠাকে ভাল আঠা তখনই বলা চলে, যখন সেটির মাধ্যমকে অর্থাৎ কাগজকে ভালভাবে ভেজাতে সক্ষম হয়, কারণ তা না হলে জোড় মজবুত হতে পারে না—যেমনটি ঘটে মোমকাগজের সাথে সাধারণ কাগজকে আঠা দিয়ে জুড়বার চেষ্টা করলে। এরজন্য আঠাটি উপযুক্তভাবে পাতলা হওয়াও দরকার, যাতে যে দুটো মাধ্যম (যেমন কাগজ) এর দ্বারা জোড়া হবে সেগুলোর উপরে সহজেই এটি ছড়িয়ে পড়ে তাকে ভিজিয়ে দিতে পারে। এছাড়া আঠা এমন হওয়া দরকার যাতে প্রয়োগের পর সহজেই এবং অল্প সময়ের মধ্যেই শুকিয়ে যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে আঠা দিয়ে জোড়ার ব্যাপারে তিনটি ধাপ বা পর্যায় আছে, যেমন—প্রথম তরল অবস্থা (যাতে লাগাতে সুবিধা হয়), দ্বিতীয় যথা-যথ প্রয়োগের পর কাগজ দুটিকে নির্দিষ্ট অবস্থায় রাখা এবং শেষ পর্যায় শুকিয়ে যাবার ফলে মজবুতভাবে জুড়ে যাওয়া। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়টি বিভিন্ন রকমের আঠার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়, যেমন প্রাণীজ আঠা ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে ঘনত্ব লাভ করে এবং শেষে শুকিয়ে যায়, ভেষজ আঠার মধ্যেকার তরল পদার্থ ক্রমশ বাষ্পীভূত হয়ে শুকোয়। সারানোর কাজে ব্যবহৃত আঠা সাধারণত বাষ্পীকরণের মাধ্যমে শুকোয়। এইভাবে যেসব আঠা শুকোয় তাদের মধ্যে একটা অসুবিধা দেখা যায় সেটা হচ্ছে প্রায়ই শুকোবার সাথে সাথে কাগজ অথবা মাধ্যমটি খানিকটা কুঁচকে যায় এবং এইটি বেশীমাত্রার ঘটলে মাধ্যমটি এবং জোড় দুইই ক্ষতিগ্রস্থ এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। উপযুক্ত আঠা নির্বাচনের সময় আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার, যে মাধ্যম যত শক্ত হবে আঠাটিও তার উপযোগী মজবুত হওয়া দরকার। আবার অতিরিক্ত পাতলা হলে এর প্রয়োগে মাধ্যম বা কাগজ অতিরিক্ত ভিজে গিয়ে প্রসারিত হতে পারে, যার ফলে শুকোবার সময় সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং মাধ্যমকে দুর্বল করে দেয়। এইসব ব্যাপার মনে রেখে বিভিন্ন মাধ্যম এবং নানাধরণের প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত আঠা নির্বাচন করা দরকার।

উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদান অনুসারে আঠাকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে—(১) ভেষজ, (২) জৈব, (৩) কৃত্রিম।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সময় থেকে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত আঠা কিন্তু ভেষজ আঠা—এর মধ্যে ষ্টার্চের আঠাই বেশী প্রচলিত। এর প্রধাণ কারণ এটি যদিও শুকোতে প্রাণীজ আঠার তুলনায় কিছুটা বেশী সময় নেয়, তবুও ভাল আঠার যেসব বিশেষ গুণ থাকা দরকার তার সবগুলিই এতে আছে, উপরন্তু এটি যথেষ্ট সস্তা, সহজলভ্য এবং ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক।

সাধারণভাবে ১ ভাগ ময়দা অথবা ষ্টার্চ ১০ ভাগ জলে ভালভাবে মিশিয়ে উপযুক্তভাবে ফুটিয়ে নিলেই আঠা তৈরী হয়ে যায়। পুরানো এই পদ্ধতিকে আধুনিককালে প্রয়োজন অনুসারে কিছুটা পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত করে নেওয়া হয়েছে, যেমন ছত্রাক ইত্যাদির আক্রমণ প্রতিরোধে নানাধরণের ভেষজ রাসায়নিক উপকরণ এতে মিশিয়ে নেওয়া হয়। ময়দার আঠার তুলনায় ষ্টার্চের আঠা অপেক্ষাকৃত উঁচু মানের এবং অধিকাংশ ত্রুটি থেকে মুক্ত।

সাধারণ ষ্টার্চ থেকে কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে তৈরী আঠায় কয়েকটি বিশেষগুণ বা ধর্ম সংযোজিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে ষ্টার্চকে যদি অ্যাসিড বা অ্যালকালি অথবা অক্সিডাইজিং সামগ্রীর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে নেওয়া যায় তবে ১ ভাগ ষ্টার্চের সাথে ১ ভাগ জল মিশিয়ে আঠা বানানো চলে যেটা ব্যবহারের পক্ষে অতিরিক্ত ঘন হয় না। আরেকটি পদ্ধতিতে খুব অল্প পরিমানে অ্যাসিড সহযোগে মাঝারি আঁচে অথবা অ্যাসিড ছাড়াই উচ্চতাপে ভেজে নিয়ে যথাক্রমে সাদা ডেক্সট্রিন এবং হলুদ বৃটিশ গাম তৈরী করা হয়। এগুলি ঠাণ্ডা জলে সহজে দ্রবণীয় এবং ১ঃ১ মাত্রায় মিশিয়ে ব্যবহারের উপযোগী পাতলা আঠা তৈরী করা যায়। এই ধরণের পরিমার্জিত ষ্টার্চ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাওয়া যায়, যার ফলে ছোটখাট গ্রন্থাগারের পক্ষে তাদের দরকার মত সংগ্রহ করা সহজ।

(১) ভেষজ আঠা প্রস্তুত প্রণালী

(ক) পাতলা ষ্টার্চের আঠা—এই আঠা তৈরী করতে যেসব উপাদানের দরকার সেগুলো হচ্ছে—

ষ্টার্চ	২৫০ গ্রাম
জল	৫ কেজি
লবঙ্গ তেল	৪০ গ্রাম
ন্যাফথল	৪০ গ্রাম
বেরিয়াম কার্বোনেট অথবা লেড কার্বোনেট	৪০ গ্রাম

জলটা প্রথমে গরম করে (৮০° থেকে ৯০° সেঃ) তার মধ্যে আস্তে আস্তে ষ্টার্চ মিশিয়ে ক্রমাগত নাড়তে হবে, যাতে ষ্টার্চ দানা পাকিয়ে যেতে না পারে। ষ্টার্চ সম্পূর্ণভাবে মিশে যাবার পর একইভাবে নাড়তে নাড়তে লেড অথবা বেরিয়াম কার্বোনেট মেশাতে হবে। সম্পূর্ণ মিশে যাবার পর এর সঙ্গে সাফ্রল আর লবঙ্গ তেল মেশাতে হবে—এবার সম্পূর্ণ মিশ্রণটি অল্প আঁচে ছয় থেকে আট ঘণ্টা ফুটতে দিতে হবে। তারপর আঠা তৈরী হয়ে যাবে। একই পদ্ধতিতে ২৫০ গ্রাম ষ্টার্চের বদলে ২৫০ গ্রাম ময়দা ব্যবহার করা চলে।

(খ) **ষ্টার্চের আঠা**—এই আঠা তৈরী করতে নীচের উপাদানগুলির দরকার হবে—

ষ্টার্চ	২০০ গ্রাম
জল	১ লিটার
তুঁতে (কপার সালফেট)	২—৩ গ্রাম
গ্লিসারিন	২ গ্রাম

জল গরম করে আস্তে আস্তে ঐ জলে ষ্টার্চ মিশিয়ে ক্রমাগত নাড়তে হবে যাতে দানা বেঁধে না যায়। এবার কম আঁচে ঘণ্টা ছয়েক ফুটালেই আঠা তৈরী হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে যাবার পর এতে গ্লিসারিণ মেশাতে হবে। এক্ষেত্রেও ষ্টার্চের বদলে সমান পরিমাণে ময়দা ব্যবহার করা চলে।

(গ) **ময়দার আঠা**—তৈরী জন্য দরকার—

ময়দা	২৫০ গ্রাম
জল	১ লিটার
ফরমালিন	১০ ফোটা

জল গরম করে আস্তে আস্তে তার মধ্যে ময়দা মেশাতে হবে এবং ক্রমাগত নাড়তে হবে। ময়দা সম্পূর্ণ মিশে যাবার পর কম আঁচে ঘণ্টা ছয়েক ফুটাতে হবে। আঠা তৈরী হয়ে যাবার পর ক্রমাগত নাড়তে নাড়তে তার সঙ্গে ফরম্যালিন মেশাতে হবে।

(ঘ) **ডেক্সট্রিন আঠা—**

ডেক্সট্রিন (Dextrin)	২·৫ কেজি	(৫ পাউণ্ড)
জল	৪ কেজি	(১০ ,,)
লবঙ্গের তেল (Oil of cloves)	৪০ গ্রাম	(১/২ আউন্স)
স্যাফরল (Sefrol)	৪০ গ্রাম	(১১/২ ,,)
লেড কার্বোনেট অথবা বেরিয়াম কার্বোনেট	৪০ গ্রাম	(২১/২ ,,)

এই উপকরণগুলোর মধ্যে লবঙ্গের তেল, লেড কার্বোনেট-এর ব্যবহার করা হয় ছত্রাক এবং কীটপতঙ্গ প্রতিরোধক হিসাবে। জল গরম করে (৯০° সেঃ) তার মধ্যে আস্তে আস্তে ডেক্সট্রিন মেশাতে হবে এবং সাথে সাথে মিশ্রণটি ক্রমাগত নাড়তে হবে যাতে দানা পাকিয়ে না যায় এবং মিশ্রণটি ভালভাবে মিশে যায়। ডেক্সট্রিন সম্পূর্ণভাকে মিশে যাবার পর বেরিয়াম কার্বোনেট অথবা লেড কার্বোনেট মেশাতে হবে এবং ক্রমাগত নাড়তে হবে। সবশেষে মেশাতে হবে লবঙ্গ তেল এবং স্যাফ্রল। উপকরণগুলি মিশিয়ে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা কম আঁচে ফোটালে আঠা তৈরী হয়ে যায়।

(ঙ) **কার্বোক্সিমিথাইল সেলুলোজ আঠা**—কার্বোক্সিমিথাইল সেলুলোজ ১ কেজির সাথে ৫ লিটার ঈষৎ উষ্ণ জল মিশিয়ে তৈরী হয়। এই আঠা সাধারণত বার্চজাতীয় ছালের তৈরী পাণ্ডুলিপির সারানর কাজে ব্যবহৃত হয়।

(২) জৈব আঠা প্রস্তুত প্রণালী

নানাধরণের প্রাণীর চামড়া, হাড় ইত্যাদি উপকরণ থেকে প্রাণীজ আঠা তৈরী হয়। চামড়া তৈরীর সময় অপ্রয়োজনীয় টুকরো থেকেই সাধারণত এধরণেও আঠা তৈরী হয়। চুণে ভিজিয়ে লোম অপসারণের পর আরো বেশী পরিমাণ চুণে এগুলো ভিজিয়ে রেখে দিতে হবে, যতদিন পর্যন্ত এগুলো ফুলে না ওঠে। তারপর বারবার জল পাল্টে এগুলো ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না চুণের শেষ রেশটুকুও ধুয়ে যায়। তারপর জলে গরম করলে আঠা পুরো তৈরী হয়। দরকার মত সব জলটুকু শুকিয়ে নেওয়া চলে, যখন এটি শুকনো এবং শক্ত অবস্থায় থাকে। দরকার মত জলে গুলে নিয়ে এটি ব্যবহারোপযোগী করে নিলেই চলে। নানামানের আঠা এভাবে তৈরী

হয়। সাধারণভাবে বলা চলে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রায় ভালমানের আঠা তৈরী হয়।

ঠিক একই ভাবে হাড় থেকে আঠা তৈরী হয়। এভাবে আঠা তৈরীর সময় হাড়ের মধ্যের অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দূর করার জন্য অ্যাসিডের ব্যবহার প্রয়োজন। ঐসব পদার্থ দূরীভূত হবার পর চামড়ার মতই একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় আঠা তৈরীর জন্য।

জৈব আঠার মধ্যে জিলেটিন, অ্যালবুমেন, কেসিন (casein) ইত্যাদি নানা প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বই বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রেই জৈব আঠা সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়, প্রধানতঃ এটি খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবার জন্য। কারণ এতে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি কাজ করতে সুবিধা হয়। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে বইয়ের পুট (spine) গোল করার বা বাঁকানোর দরকার আছে সেক্ষেত্রে ভেষজ আঠা কাজের পক্ষে অনেক বেশী উপযোগী। গরম জৈব আঠা ভেষজ আঠার তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে কাগজের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে এবং ভৌতিক ভাবে জোড়ার কাজে সহায়তা করে এবং অমসৃণ তলে অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ করে এবং এই কারণে এটি বাঁধাইয়ের কাজে বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সমস্ত জৈব আঠাতেই কম বেশী জিলেটিন থাকে। জিলেটিনের পরিমাণ যত বেশী হয় আঠা তত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। অবশ্য খুব বেশী তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেলে কাজের পক্ষে অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

যদিও এই ধরণের আঠা তৈরীর সময় এতে অ্যাসিড অথবা অ্যালকালির প্রয়োগ করা হয়, তবু উৎপাদিত আঠাতে সাধারণত তার কোন চিহ্ন বা অবশেষ থাকে না। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাজারে এই ধরণের আঠা কঠিন ছোট ছোট দানার আকারে অথবা পাউডার রূপে পাওয়া যায় যা সহজেই ঠাণ্ডা জলে গুলে আঠায় রূপান্তরিত করা যায়। এই ভাবে তৈরী করার সময় এর সাথে খুব অল্প পরিমাণে কার্বলিক অ্যাসিড মিলিয়ে নিলে এটি সহজেই কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে।

কৃত্রিম আঠা প্রস্তুত প্রণালী

গত কয়েক দশকে আমরা দেখছি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নানা ধরণের কৃত্রিম আঠা পাওয়া যাচ্ছে। এদের প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন কাজের উপযোগী করে তৈরী। এদের মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থাগারের কাজের জন্যেও ব্যবহার করা চলে।

অধিকাংশ কৃত্রিম আঠাই প্লাষ্টিক অথবা পলিমার ভিত্তিক। এই আঠা সাধারণত দু'রকমের হয়ে থাকে—থারমো-প্লাষ্টিক এবং থারমো-সেটিং। এগুলি তৈরীতে উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়—ফেনল এবং ফরম্যালডিহাইড মিশ্রণ অথবা ইউরিয়া ও ফরম্যালডিহাইড মিশ্রণ। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে ইউরিয়ার বদলে মেলামাইনের (Melamine) ব্যবহার করা হয়।

থারমো-সেটিং-এর ক্ষেত্রে দরকার হয় অত্যন্ত উচ্চতাপমাত্রার, এই অবস্থায় এ'টি যে রূপ পরিগ্রহ করে তার কোন পরিবর্তন ঘটে না। এমনকি আবার উচ্চতাপ প্রয়োগের ফলেও না। এইভাবে জুড়ে দেওয়া আকারের কোন পরিবর্তন একমাত্র সেটাকে কেটেই করা সম্ভব। কোন দ্রাবকই এটাকে গলাতে পারে না। অতএব এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে এটি গ্রন্থাগার সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপোযুক্ত। সাধারণভাবে প্লাইউড তৈরী, কাঠ জোড়া ইত্যাদি ব্যাপারেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ। এছাড়াও এইটির বিপদজনক অম্লতা গ্রন্থাগার সংগ্রহের উপর এব ব্যবহারের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে এর উপাদানের হেরফের ঘটিয়ে যদি এইসব অসুবিধা দূর করা সম্ভব হয়, তবেই শুধু গ্রন্থাগারে এর ব্যবহারের ব্যাপারে পুনঃবিবেচনার প্রশ্ন উঠতে পারে।

থারমো প্লাষ্টিক অনেক ধরণের হয়ে থাকে। এব মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থাগারে ব্যবহারের উপযোগী—এগুলিব প্রধান উপাদান পলিমার হওয়া সত্ত্বেও এর একটি প্রধান ধর্ম হচ্ছে একবার প্রয়োগের পর দরকার হলে আবার মাঝারি পরিমাণ তাপ প্রয়োগে এই আঠা পুনরায় নমনীয় অবস্থায় ফিরে যায়। নানা ধরণের দ্রাবকেও এটি দ্রবীভূত হয়। কয়েক ধরণের থারমো প্লাষ্টিক রবারের মত নরম আবার কয়েকটি যথেষ্ট শক্ত। এর মধ্যে শুধুমাত্র যেগুলো গ্রন্থাগারে ব্যবহারের উপযোগী, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পলিভিনাইল এ্যাসিটেট্—বিশেষ ভাবে এর তরল রূপে। এটি আঠা হিসাবে হয়ত ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত ষ্টার্চ অথবা জৈব আঠার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে। এটি অত্যন্ত স্থায়ী, যেটা গ্রন্থাগার সংরক্ষণের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় গুণ। সাধারণ অবস্থায় এটি প্রায় স্বচ্ছ, দানাদার পদার্থ যেটা তাপ প্রয়োগে (১০০° সেঃ থেকে কম) নরম হয়ে যায়। তাছাড়া নানাধরণের দ্রাবক যথা ডাইবুটিল থ্যালেট (Dibutyl Phthalate) প্রয়োগে নরম ও তরল হয়ে যায়। দ্রাবকে (জল-ছাড়া) দ্রবীভূত অবস্থায় অবশ্য এটি ব্যবহারের পক্ষে ততটা উপযোগী থাকে না।

তরল অবস্থায় পলিভিনাইল অ্যাসিটেটে' তরল এবং কঠিন আনুপাতিক

(ratio) মিশ্রণের মান জৈব আঠার মতই উঁচু হওয়া সত্ত্বেও এর তরলতা এত বেশী থাকে যে ব্রাশের মাধ্যমে সহজেই এটি প্রয়োগ করা সম্ভব। বই বাঁধাইয়ে বিদেশে এর বহুল ব্যবহার সুরু হয়ে গেছে। আমাদের দেশেও এর ব্যবহার আগামী দিনে যে বাড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর আরেকটা সুবিধা হচ্ছে ব্যবহারের প্রয়োজন অনুসারে, সহজেই জল মিশিয়ে এটিকে পাতলা করে নেওয়া চলে, অথচ একবার শুকিয়ে যাবার পর এটি সম্পূর্ণ পচনহীন ও জলপ্রতিরোধক হয়ে যায়। এর ব্যবহারে মাধ্যমে জুড়বার জন্য চাপের কোন দরকার হয় না। সিল্ক (সিফন), টিস্যু কাগজ, নাইলন, টেরিলিন ইত্যাদি জুড়বার কাজে এমনকি সাধারণ আঠার তুলনায় এটি অত্যন্ত বেশী উপযোগী। সেজন্য ল্যামিনেশনের কাজে এর বহুল ব্যবহার চালু আছে। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, এটি যেহেতু কাগজের তুলনায় জলের দ্বারা কম ক্ষতিগ্রস্থ হয় সে জন্য কাগজের দুদিকেই এর ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। যদি কখনও এক-দিকে ব্যবহার করা হয় তবে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এটি ব্যবহারের ব্যাপারে আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে, এর সহজেই ব্রাশে শুকিয়ে গিয়ে ব্রাশটিকে ব্যবহারের অনুপযুক্ত করে দেওয়া। এই অসুবিধা প্রতিরোধ করা সম্ভব ব্রাশে লেগে থাকা অতিরিক্ত পদার্থ মেথিলেটেড স্পিরিট, অ্যাসিটেন, ইথাইল অ্যাসিটেট ইত্যাদি যে কোন দ্রাবকে (যেগুলো সব সময় হাতের কাছে রাখা দরকার) ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে। সবচেয়ে সুবিধাজনক ব্যবস্থা হচ্ছে কাজ করার সময় হাতের পাশে একটা পাত্রে জল রাখা এবং ব্যবহারের পর ব্রাশটি ঐ পাত্রে ডুবিয়ে দেওয়া।

অন্য কয়েক ধরণের আঠা

অন্য কয়েকধরণের আঠা যেমন গাম অ্যারাবিক কাগজ জুড়তে সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হলেও গ্রন্থাগারের কাজে এর ব্যবহারে অসুবিধা হচ্ছে এটি অতি সহজে আর্দ্রতা শুষে নেয় এবং সেহেতু স্থায়ী জোড়ার কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত।

রবার সলিউশন যা সাধারণত ন্যপথা অথবা কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড থেকে তৈরী হয়—গতশতাব্দীর শেষে (মোটামুটি ১৮৮০ নাগাদ) বই বাঁধাইয়ের কাজে কিছুদিন ব্যবহৃত হয়েছিল। ব্যবহারের দিক থেকে এবং ব্যবহারের পরই এটি পুটএ যে নমনীয়তা সঞ্চার করে সেজন্য ধারণা করা হয়েছিল যে এটি এই কাজের পক্ষে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। কিন্তু পরে বোঝা যায় যে এর স্থায়িত্ব অত্যন্ত সীমিত। ফলে নানা প্রাথমিক সুবিধা থাকা সত্বেও এর ব্যবহার কমে গেছে।

তেলরং এবং জলরংএর ছবি সংরক্ষণ সম্বন্ধে দু'চার কথা

অনেক গ্রন্থাগার, বিশেষতঃ যেগুলোতে নানাধরণের প্রাচীন সংগ্রহ আছে, সেখানে বিভিন্ন কারুশিল্পকর্মও স্থান পেতে দেখা যায়। এর মধ্যে তেলরং এবং জলরংএর ছবিই প্রধান। স্বাভাবিক ভাবেই এদের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যার কথাও এসে পরে সংরক্ষণের সার্বিক আলোচনায়, যদিও এ ধরণের কারুশিল্প সংরক্ষণের কাজটি বিশেষধরণের প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞানের প্রয়োগ সাপেক্ষ। এই ব্যাপারে নানাধরণের ভ্রান্ত ধারণা চালু থাকায় অনেক বড় ধরণের ক্ষয়ক্ষতি ঘটে যেতে দেখা যায়।

যেসব গ্রন্থাগার কোন সংগ্রহশালার সাথে যুক্ত সেক্ষেত্রে কারুশিল্পের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বভাবতই সংগ্রহশালার উপরই বর্তায়। কিন্তু অন্যক্ষেত্রে যেখানে কারুশিল্পসংগ্রহের পরিমান অল্প, সেক্ষেত্রে তার সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রন্থাগারেরই। অথচ এই ধরণের উপকরণ সাধারণভাবে গ্রন্থাগারের আর পাঁচটা সংগ্রহের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং কোন অবস্থাতেই গ্রন্থাগারবিদ্যার পঠনপাঠনে এ সম্বন্ধে সামান্যতম আলোচনার অবকাশ বা সম্ভাবনা থাকে না। সেজন্য কার্যক্ষেত্রে এই ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হ'লে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। অতএব এই সংগ্রহ সম্বন্ধে খুবই সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করা যাক যাতে অন্ততঃ বিষয়টি সম্বন্ধে মোটামুটি কিছুটা ধারণা করে রাখা সম্ভব হয়।

কারুশিল্পের মধ্যে প্রধানতঃ তেলরং অথবা জলরং-এর ছবিই বেশী সমস্যার সৃষ্টি করে বা করতে পারে। প্রথমে দেখা যাক সাধারণত এগুলি সংরক্ষণের জন্য কি কি ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এবং সেগুলি সঠিক কিনা। তেল রং অথবা জলরং যাতেই ছবি আঁকা হোক না কেন, ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় টাঙিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখার ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই তার উপর ধুলো, বালি, ময়লা পড়ে এবং জমে। গ্রন্থাগারের আর পাঁচটা জিনিষের মত এটিরও ঝাড়পোছ দরকার। এসব সত্ত্বেও প্রায়ই দেখা যায় ছবিগুলো ক্রমশঃ বিবর্ণ হয়ে আসে, তেলরং-এর

ক্ষেত্রে কখনও কখনও রং উঠে আসে, কখনও বা ছত্রাকের আক্রমণের লক্ষণ দেখা যায়।

ধুলো ময়লা পরিষ্কারের জন্য অনেক সময় ছবি জলে ধোয়া, অথবা জলে কাপড় বা তুলো ভিজিয়ে ঘসে পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এসব করা উচিত নয়। আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা ধুলো ময়লা এতে উঠে যায়, এবং ছবি কিছুটা পরিষ্কার হলেও, এতে কিন্তু বড় রকমের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। জলরং-এর ক্ষেত্রে জলে রং সম্পূর্ণ ধুয়ে যেতে পারে। তেলরং-এর ক্ষেত্রে জল ছবির রং-এর সূক্ষ্ম ফাটলের মধ্যে দিয়ে ঢুকে ছবির ক্যানভাস বা কাগজ বা অন্য মাধ্যমকে (যার ওপর আঁকা হয়েছে) সেঁতসেঁতে করে দিতে পারে, ফলে সেটা ফুলে উঠে, সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হতে পারে, যার ফলস্বরূপ উপরের রং-এর আস্তরণ আলগা হয়ে যেতে থাকে, এবং ছত্রাকের আক্রমণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। অনুরূপ কারণেই সাবান বা ডিটারজেন্ট মেশানো জলে ক্ষতির সম্ভাবনা আরো বাড়িয়ে দেয়।

অনেকে বলে থাকেন যে তেলরং-এর ছবি পরিষ্কার করার জন্য আলু অথবা পেঁয়াজ অর্ধেক করে কেটে, কাটা দিক দিয়ে আস্তে আস্তে ঘসে ছবি পরিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু এটিও অত্যন্ত বিপদজনক ব্যবস্থা কারণ এই সব আনাজের রস যদি ছবির রং-এর স্তরে অনুপ্রবেশ করে তবে তার ফলে ছবির অপরিসীম ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।*

তেলরং-এর ছবিতে যে রং ব্যবহার করা হয় সেগুলি সাধারণত বয়সের সাথে সাথে ক্রমশ বিবর্তিত হয় এবং ৭০/৭৫ বছর পরে যথেষ্ট শক্ত হয়ে যায়, তখন চট্ করে কোন স্বল্পশক্তিসম্পন্ন রাসায়নিক দ্রাবকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বয়সের (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক আঁকা) ছবির ক্ষেত্রে এই ধরণের ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশী থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই এদের ক্ষেত্রে অধিকতর সাবধানতা গ্রহণ করা দরকার।

ছবি পরিষ্কার করা বা সারানো যেকোন কাজই করা হোক, তারজন্যে সরাসরি কোন বাঁধাধরা কার্যসূচী তৈরী করে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ প্রতিটি ছবির এমনকি একই ছবির বিভিন্ন অংশের সমস্যা এবং তার সমধান ভিন্নতর। একক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাথমিক যে জিনিষের প্রয়োজন সেটি হচ্ছে যথেষ্ট ধৈর্য, সমস্যা

* Kelly, Francis. Art restoration. Newton Abbot, David & Charles, 1971. p 162-3

বোঝার আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতালব্ধ আত্মবিশ্বাস প্রত্যেক আঁকিয়েরই রং এবং মাধ্যম নির্বাচন, এবং কাজ করার নিজস্ব ধারা থাকে। তার উপর এসব ছবির সংরক্ষণের পদ্ধতিও অনেকটা নির্ভরশীল।

অধিকাংশ তেলরং-এর ছবির উপর আস্তরণ হিসাবে কোন না কোন ধরণের বার্নিশের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সময়ের সাথে সাথেই এই বার্নিশ ক্রমশ হলুদ হয়ে, পরে হাল্কা বাদামী হয়ে যাওয়ায় এর স্বচ্ছতা বিঘ্নিত হয়, এবং ছবির বাইরের রূপ ও আবেদন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই ধরণের ক্ষেত্রে ছবি ভালভাবে পরিষ্কার করার অর্থই হচ্ছে ঐ বার্নিশের সম্পূর্ণ অপসারণ। ছবির সংরক্ষণের ব্যাপারে এটি প্রধানতম সমস্যা। কিন্তু এই অপসারণে কোন দ্রাবক ব্যবহার করা হবে সেটা নির্ভর করে ব্যবহৃত বার্নিশের চরিত্রের এবং তার বর্তমান অবস্থার উপর। যে সব ক্ষেত্রে বার্নিশ খুবই ভঙ্গুর হয়ে উঠে আসছে, সেক্ষেত্রে সাবধানে নরম ব্রাসের সাহায্যে প্রায় উঠে যাওয়া ঐ বার্নিশের আস্তরণকে ছবির উপর থেকে নামিয়ে দিতে হবে। অন্যক্ষেত্রে ছবির একদম ধারে যে অংশ ফ্রেমের আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়বে সে অংশের উপর অল্প অল্প করে বিভিন্ন অপসারক দ্রাবকের ব্যবহারের দ্বারা দেখতে হবে কোনটি ব্যবহার করা সমীচীন। অত্যন্ত দুর্বল দ্রাবকের প্রয়োগে খুব আস্তে আস্তে বার্নিশ পরিষ্কার হতে পারে কিন্তু তার একটা কুফলও আছে। দীর্ঘ সময় ধরে প্রয়োগের ফলে এর রেশ নরম হয়ে যাওয়া বার্নিশের আস্তরণ ভেদ করে ছবির ক্ষতি করতে পারে। মাঝারি ক্ষমতাসম্পন্ন রাসায়নিক দ্রাবকের ক্ষেত্রে যেহেতু রাসায়নিকের প্রয়োগ অত্যন্ত স্বল্পসময় স্থায়ী, সেহেতু এক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা অনেক সীমিত হয়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখার জন্য জায়গা নির্বাচনের সময় সাধারণত অত্যন্ত হাল্কা রংএর অংশকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত, কারণ সেক্ষেত্রে রাসায়নিকের প্রতিক্রিয়া বেশীভালভাবে বোঝা যায়। গাঢ় রং বিশেষতঃ কালো, বাদামী ইত্যাদির ক্ষেত্রে ময়লার সঙ্গে খানিকটা রং উঠে এলেও সেটা সহজে ধরা সম্ভব নয়।

যদিও বলা হয়েছে কোন একটা পদ্ধতি সব ছবির পক্ষে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, তবু সাধারণভাবে সবসময়ই কয়েকটি বিষয়ে নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। উপযুক্ত দ্রাবক নির্বাচন এবং তার পরের কাজ অর্থাৎ পরিষ্কার করার জন্য নীচের বিষয়গুলি যথাযথভাবে অনুকরণের চেষ্টা করা উচিত।

(১) ছবি পরিষ্কার করার জন্য ছবিটি প্রথমে ফ্রেম থেকে সাবধানে খুলে উপযুক্ত টেবিলে পেতে নিতে হবে।

(২) যে কোন দ্রাবকই ব্যবহার করা হোক না কেন, ব্যবহারের আগে দেখে নিতে হবে যে সেটা সমসত্ত্ব (homogeneous) মিশ্রণ কিনা, দরকার হলে মিশ্রণকে যথাযথভাবে মিশিয়ে নেবার জন্য ভাল করে ঝাঁকিয়ে নিয়ে তবেই ব্যবহার করতে হবে।

(৩) মিশ্রণটি খানিকটা পরিষ্কার তুলোয় অল্প পরিমাণে লাগিয়ে নিতে হবে,

(৪) এবার দ্রাবক লাগানো তুলোটি ছবির নির্বাচিত অংশের উপর আলতো করে ঘসতে হবে। হাতের গতি বৃত্তানুসারী (Circular motion) হওয়া দরকার; হাত যেন কোন অংশের উপর থেমে না থাকে এবং দ্রাবক যেন সর্বত্র সমপরিমাণে ছড়িয়ে যায়।

(৫) যখনই দেখা যাবে তুলোটি কিছুটা ময়লা হয়েছে, তখনই সেটি পাল্টে নতুন তুলো নিয়ে আগের মত দ্রাবক প্রয়োগ করতে হবে। কাজ এভাবেই চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আকাঙ্খিত ফললাভ হয়। মনে রাখতে হবে কাজটা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আলতোভাবে করতে হবে, নতুবা দ্রাবকের তৈলাক্ত অথবা অনুরূপ উপাদান ছবির রংএর স্তরে অনুপ্রবেশ করে ক্ষতিসাধন করতে পারে।

(৬) প্রতিবার প্রয়োগের পর লক্ষ্য করতে হবে তুলোর উপর রংএর দাগ লেগেছে কিনা। রংএর রেশ দেখা মাত্রই পরিষ্কাব করা বন্ধ করতে হবে।

(৭) যখন দেখা যাবে তুলোতে আর ময়লা উঠছে না তখন দ্রাবক প্রয়োগ বন্ধ করে পরিষ্কার শুকনো তুলো দিয়ে সম্পূর্ণ ছবিটা মুছে নিতে হবে যাতে ব্যবহৃত দ্রাবকের কোন রেশ না থাকে। এখানে আরেকটি কথা বলে নেওয়া ভাল, যতক্ষণ পর্যন্ত ছবির উপর বার্নিশের আস্তারণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তুলো দিয়ে ঘসবার সময় ছবির উপরিভাগ কিছুটা পিচ্ছিল অনুভূত হয়, কিন্তু একবার আস্তরণটি উঠে যাবার পর সেটি কিছুটা খসখসে হয়ে যায়।

(৮) এই অবস্থায় ছবির উপরিভাগ কিছুটা নরম বা চট্চটে হয়ে যায়। সে'ট ঠিক করার জন্য ধুলোবালিমুক্ত পরিবেশে ঘরের মধ্যে খোলা অবস্থায় রেখে দিলে আস্তে আস্তে ছবিটি তার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে অর্থাৎ চট্চটে ভাবটা চলে যাবে।

(৯) প্রয়োজনবোধে আবার নতুন বার্নিশের আস্তরণের প্রয়োগ করতে হবে।

(১০) সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবার পর আবার আগের মত ফ্রেমে ছবিটা লাগিয়ে নিতে হবে।

দ্রাবককে অপেক্ষাকৃত তরল অথবা কমশক্তিশালী করার জন্য স্পিরিটের ব্যবহার করা হয়। মূল দ্রাবক হিসাবে আমোনিয়া, সেলোসল্ভ (cellosolve), ইথাইল অ্যালকোহল, মিথাইল অ্যালকোহল, টোলিউন, তারপিন তেল, জাইলিন (xylene) ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত দ্রাবক হচ্ছে স্পিরিটের মিশ্রণে তরলীকৃত অবস্থায় অ্যাসিটোন এবং আইসো-প্রোপাইন অ্যালকোহল। পুরানো বার্নিশের ক্ষেত্রে যদিও স্পিরিটের প্রায় কোন প্রতিক্রিয়াই নেই তবু নতুন বার্ণিশকে এটি নরম করে দেয়।

যেহেতু ব্যবহৃত দ্রাবকের মধ্যে অনেকগুলিই ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে, সেহেতু কাজের সময় দস্তানা পরে নেওয়া দরকার। এছাড়াও ঘরে যথেষ্ট বাতাস চলাচলের সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত, কারণ বাষ্পীভূত অবস্থায় কয়েকটি দ্রাবক, যদি বাতাসে এদের উপস্থিতি একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করে যায়, প্রশ্বাসের সাথে দেহে ঢুকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যে কোন রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজ করার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

ছবিতে যেসব রক্ষাকারী বার্নিশ 'ব্যবহৃত হয় তাকে আমরা দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি তেল নির্ভর, অপরটি স্পিরিট নির্ভর। তেল নির্ভর বার্নিশে অপেক্ষাকৃত শক্তধরণের রজন ব্যবহার করা হয়, যথা কোপাল (copal), অ্যামবার (amber) ইত্যাদি।

শক্ত রজন সাধারণত উচ্চতাপমাত্রায় তেলের সঙ্গে মেশানো হয়ে থাকে। এই বার্নিশে ব্যবহৃত তেল আস্তে আস্তে শুকেবার ফলে বার্নিশ শুকোতে অপেক্ষা-কৃত বেশী সময় লাগে। এই ধরণের বার্নিশ টেকসই ও স্থায়ী। মাঝারী শক্তিসম্পন্ন দ্রাবক সহ্য করার ক্ষমতা এর থাকে।

স্পিরিট নির্ভর বার্নিশে সাধারণত অপেক্ষাকৃত নরম রজন ব্যবহার করা হয়, যেমন স্যান্ডারাক অথবা ম্যাসটিক (যেগুলো অ্যালকোহল অথবা তার-পিনটাইনে দ্রবনীয়)। এই বার্নিশ সহজে ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং অপেক্ষাকৃত সহজেই অপসারণযোগ্য। এই বার্নিশে ব্যবহৃত স্পিরিট বাষ্পীভূত হয়ে যাবার মাধ্যমে শুকিয়ে যায়।

ছবির ক্ষেত্রে ছত্রাকের আক্রমণ ছবির ক্যানভাস বা অনুরূপ মাধ্যমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সেঁতসেঁতে আবহাওয়ায় আক্রমণের বিস্তার এবং ক্ষতি দ্রুততর হয়। আক্রমণের সুরু হবার প্রাথমিক অবস্থায় ছত্রাকনাশকের প্রয়োগের মাধ্যমে

এর প্রতিকার করতে হবে, নতুবা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপক আক্রমণের ফলে ক্যানভাস ইত্যাদি সম্পূর্ণ পচে যেতে পারে। ৫% ফরম্যালডিহাইডের দুর্বল মিশ্রণ ব্রাশের সাহায্যে আস্তে আস্তে প্রয়োগ করা চলে। যদি আক্রান্ত স্থানের পরিমান অনেকটা হয়ে থাকে তবে ব্রাশের বদলে স্প্রেয়ারের মাধ্যমে স্প্রে করে ছত্রাবনাশক প্রয়োগ করাই সুবিধাজনক।

ছবির পিছনদিকের ক্যানভ্যাসকে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে রক্ষাকারী কাঠের পাত অথবা অনুরূপ কিছু লাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এরফলে খোঁচালাগা, চাপ লাগা ইত্যাদি ছাড়াও অতিরিক্ত আর্দ্রতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

পুরানো, বিবর্ণ বার্নিশের অপসারণের পর আবার নতুন বার্নিশের দরকার হয়ে পরে। যদিও অনেক সময় বলা হয় যে ছবি কাচের মধ্যে রাখলে সংরক্ষণের সুবিধা হয়, কারণ অত্যুৎসাহী দর্শকের হাত, বিরূপ আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া এরদ্বারা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিকোন থেকে বলতে গেলে বলা চলে, কাচের মধ্যে রাখার তুলনায় বার্ণিশের আস্তরণের মধ্যে ছবি রাখাই বাঞ্ছনীয়, কারণ কাচের উপর আলো প্রতিফলনের জন্য এবং কাচের মাধ্যমে ছবিটি দেখার ফলে রংএর যে আপাতবিকৃতি ঘটে সেগুলো ছবির আসল রূপ উপভোগের পক্ষে বাধা হয়ে দাড়ায়।

নতুন বার্নিশ লাগাবার সময় মনে রাখা দরকার যে এই বার্নিশ যেন রক্ষাকারী আস্তরণের কাজ করা ছাড়াও ছবিটি প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগের সহায়ক হয়। সেজন্য এই আবরণ যথেষ্ট শক্ত, মজবুত অথচ অপেক্ষাকৃত মৃদু রাসায়নিক দ্রাবকের সাহায্যে অপসারণযোগ্য হওয়া উচিত। এটি যেন সহজে ফেটে যাওয়া বা ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া বা ফুলে ওঠার মত দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়। বার্ণিশ কোনভাবে ছবির সার্বিক সৌন্দর্যের হানি করা দূরে থাকুক, এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়। সেদিক থেকে বিচার করে কোন একটি বার্নিশের নাম করা খুবই শক্ত, যার এই সবগুলি গুণ আছে। যে বার্নিশগুলো সহজে অপসারণযোগ্য, সেগুলো ততটা মজবুত নয়। আবার সময়ের সাথে সাথে প্রায় সব বার্নিশই কমবেশী হলদেটে হয়ে যায়। তবু তার মধ্যেও কৃত্রিম রজন MS_2A অথবা কিটোন এন (Keytone N) সহযোগে তৈরী বার্নিশ যথেষ্ট উপযোগী। এছাড়াও পলিভিনাইল অ্যাসিটেটের ব্যবহারের পক্ষেও অনেকেই মত প্রকাশ করে থাকেন, তবে এর প্রধান অসুবিধা হচ্ছে এটি অপসারণের জন্য অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাসায়নিক দ্রাবকের প্রয়োজন হয়।

তেলরংএর ছবির তুলনায় জলরংএর ছবি অনেক সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। জলরংএর ছবি যদি ২৫/৩০ বছরের পুরানো হয়ে থাকে, তবে তার রং জলে ততটা সহজে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। এই ধরণের ছবির উপর কোন দাগ লাগলে সাধারণভাবে ক্লোরামিন টি (Chloramine-T) পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সেটি সারান দরকার। এর ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে "পুঁথি/পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির সংরক্ষণ" অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে (৯২ পৃঃ)। অত্যন্ত দুর্বল কাগজের ক্ষেত্রে একটি পরিষ্কার ব্লটিং কাগজের উপর (ব্লটিংএর দিকে) আঁকা ছবিটি রেখে কাগজের উপর (ছবির বিপরীত দিকে) ক্লোরামিন টি মিশ্রণ স্প্রের মাধ্যমেও দাগ আস্তে আস্তে অপসারণ করা সম্ভব। যেহেতু এই রাসায়নিকটি অত্যন্ত ধীর গতিতে কাজ করে সেজন্য যথেষ্ট ধৈর্য সহকারে কাজ করতে হবে।

জলরংএর ছবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাগজের (সাধারণত হাতে তৈরী কাগজের) উপর করা হয়। কাগজ এবং জলরংএর উপাদান সহজেই আর্দ্রতা শুষে নিয়ে ছত্রাকের আক্রমণের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। সেহেতু এটি অতিরিক্ত আর্দ্রতা থেকে দূরে রাখা উচিত। এই ধরণের ছবি কাচের মধ্যে বাঁধিয়ে রাখলে অপেক্ষাকৃত বেশীদিন অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা সম্ভব। তীব্র অথবা কড়া আলো থেকে এধরণের ছবি দূরে রাখা দরকার কারণ দীর্ঘদিন কড়া আলোর মধ্যে থাকলে অনেক রংএর গাঢ়ত্ব এবং কখনও কখনও রংই কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যাবার ফলে মূল ছবিটির আবেদন নষ্ট হয়ে যায়।

কাগজের উপর কালিতে আঁকা ছবিতে, কালির অম্লতাজনিত কারণে কাগজের ক্ষতি হতে প্রায়ই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের আঁকা কয়েকটি ছবিতে এই ধরণের সমস্যা দেখা দিয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি ভারতের জাতীয় মহাফেজখানার সাহায্যে সরান এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কালি এবং কাগজের অম্লতা দূর করা এবং কাগজের দুর্বলতা দূরকরার উপায় সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

একটা কথা এখানে মনে করিয়ে দেওয়া হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে যেহেতু এই চিত্র সংরক্ষণের কাজটি অত্যন্ত শক্ত এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ সাপেক্ষ সেজন্য কোন অত্যন্ত মূল্যবান ছবি সংরক্ষণের আগে কাছাকাছি কোন সংগ্রহশালার (যেমন পূর্বভারতের ক্ষেত্রে কলিকাতায় অবস্থিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম অথবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল) চিত্র সংরক্ষকের পরামর্শ অথবা সাহায্য নিতে পারা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে নতুনদিল্লির জাতীয় মহাফেজখানার সঙ্গেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বাঁধাই

হাতেলেখা, ছাপা অথবা প্রায় ছাপা পাণ্ডুলিপি, বই ইত্যাদির ক্ষেত্রে পৃষ্ঠাগুলো একত্রিত করে স্থায়ী মলাটের মধ্যে যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাই হচ্ছে বাঁধাইয়ের কাজ বা উদ্দেশ্য।

প্রায় সব গ্রন্থাগারে সব সময়ই কিছু না কিছু বই পাওয়া যাবে, যেগুলো ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে (পাতাগুলো বই থেকে খুলে আসছে, মলাট আলাদা হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে ইত্যাদি) সেগুলো সংরক্ষণের জন্য বাঁধাই করা দরকার। আবার হয়ত এমন বই আছে যার বড় একটা ব্যবহার হয় না, কিন্তু যেটি দুর্লভ এবং মূল্যবান। হয়ত সংগ্রহের সময়ই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে ক্রমাবনতিজনিত অথবা অন্য কোন কারণে দুর্বল এবং জীর্ণ অবস্থাতেই গ্রন্থাগারে এসে পেঁীছেছে—এরও সংরক্ষণের জন্য অন্যান্য পদ্ধতি অনুসরণ ছাড়াও বাঁধাই করে নিতে হবে।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বাঁধাইয়ের কাজ, তার পরিমান ইত্যাদি বিভিন্ন হয়ে থাকে। এই প্রয়োজন, পরিমান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বাঁধাই বিভাগ কিরকম এবং কত বড় হবে, তারজন্য কত আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা থাকবে ইত্যাদি। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এইসব তারতম্য থাকা সত্ত্বেও মূল বাঁধাইয়ের পদ্ধতি একই রকম, এবং তার মধ্যে বড় একটা হেরফের থাকে না, অর্থাৎ সেই একই—পাতাগুলি সংগ্রহ করা (gathering), রক্ষাকারী ব্যবস্থা (guarding), সেলাই করা, পুট তৈরী করা (rounding and backing), বোর্ড লাগানোর মাধ্যমে মলাটের কাজ করা ইত্যাদি। এর প্রতিটি কাজই একের পর এক হাতে করা হয়। কাজ যদি উঁচুমানের করতে হয় তবে শুধু ভাল এবং দক্ষ কারিগরের দরকার তাই নয়—দরকার উঁচুমানের উপকরণের অর্থাৎ ভাল সুতো, বোর্ড, চামড়া ইত্যাদির, কারণ বাঁধাই করার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বইটি আরো মজবুত করে তোলা, যাতে এটি আরো স্থায়ী হয়ে উঠতে পারে।

বাঁধাইয়ের ব্যাপারে বিশদ আলোচনার আগে কাগজ সম্বন্ধে অর্থাৎ কাগজের উপাদান, প্রস্তুত প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনায় যা জেনেছি তার অতিরিক্ত

আরো দুই/একটি বিষয়ে—যেমন আকার ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে নেওয়া দরকার। কাগজের আকার নানাধরণের হয়ে থাকে। তবে সাধারণভাবে কয়েকটি কাগজের আয়তন এবং নাম নীচে উল্লেখ করা হল—

ফুলস্ ক্যাপ	৪৩·২ × ৩৪·৪ সেমি	(১৭″ × ১৩½″ ইঞ্চি)
ডিমাই	৫৭·২ × ৪৪·৫ „	(২২½″ × ১৭½″ „)
মিডিয়াম	৫৮·৫ × ৪৫·৮ „	(২৩″ × ১৮″ „)
রয়েল	৬৩·৫ × ৫০·৮ „	(২৫″ × ২০″ „)
ক্রাউন	৫০·৮ × ৩৮·১ „	(২০″ × ১৫″ „)
ইম্পিরিয়্যাল	৮৬·২ × ৫৫·৯ „	(৩০″ × ২২″ „)

ডবল সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে যেদিকের মাপটা ছোট সেদিকটা দ্বিগুণ হয় এবং কোয়াড্রুপলের (quadruple) ক্ষেত্রে (সাধারণভাবে একে কোয়াডও (quad) বলা হয়) দুদিকের মাপই দ্বিগুণ হয়। অর্থাৎ ডবল ক্রাউনের মাপ হচ্ছে ২০″ × ৩০″, কোয়াড ক্রাউনের মাপ হচ্ছে ৪০″ × ৩০″। একটি ক্রাউন কাগজ ভাজ করলে দুটো পাতা অর্থাৎ চারটে পৃষ্ঠা হয় একে বলে ফোলিও (folio)। দুবার ভাজ করলে চারটে পাতা অর্থাৎ আট পৃষ্ঠা হয়—যাকে কোয়ার্টো (quarto) বলে; তিনবার ভাজ করলে আটটি পাতা অর্থাৎ ষোল পৃষ্ঠা পাওয়া যায়, যাকে অক্টেভো (octavo) বলা হয়; বইয়ের আকার এই ভাবেই প্রকাশ করা হয়, যেমন ক্রাউন অক্টেভো।

বাঁধাইয়ের কাজ করতে গেলে কাগজের এই সব মাপজোক যেমন জানা দরকার তেমনি জানা দরকায় আধুনিক মাপ এবং নামগুলো। আন্তর্জাতিক মানক সংস্থা (International Standards Organisation) (ISO) কাগজের আকারের একটা মান নির্ধারিণ করে দিয়েছেন ১ বর্গ মিটারের উপর ভিত্তি করে, যার অংশগুলি একই ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যাতে ছোট করা (reduction) অথবা বড় করা (enlargement) সহজতর হয়। এই ধরণের মাননির্ণয় করার ফলে মুদ্রণ শিল্পে, বাঁধাইয়ের এবং অনুরূপ কাজের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি তৈরীর ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে একটা উৎকৃষ্ট সহযোগী পরিবেশ গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক ঐ মাপগুলো হচ্ছে—

A (সাধারণ ছাপা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত)	১১৮·৯ × ৮৪·১ সেমিঃ
B (পোষ্টার, চার্ট, ম্যাপে ব্যবহৃত)	১৪১·৪ × ১০০·০ সেমিঃ
C (খাম ইত্যাদির জন্য)	১২৯·৭ × ৯১·৭ সেমিঃ

পুরো অর্থাৎ ভাজ না করা অবস্থায় A মাপের কাগজ (আয়তন এক বর্গমিটার) Ao নামে পরিচিত। সেটিকে ১ ভাজ করলে আমরা পাই A_1(৮৪'১ × ৫৯'৪ সেমিঃ), দুটি ভাজ করলে A_2(৫৯'৪ × ৪২'০ সেমিঃ) ; তিন ভাজ করলে A_3(৪২'০ × ২৯'৭ সেমিঃ) ; চার ভাজ করলে A_4(২৯'৭ ×

আন্তর্জাতিক মানকসংস্থার কাগজের মাপ
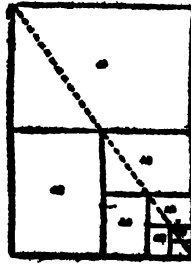
২১'০ সেমিঃ) ইত্যাদি। কাগজ কাটার আগে মূল কাগজ আয়তনে একটু বড় থাকে, সে কারণে মূল কাগজ বোঝাবার জন্য আকারের আগে R ব্যবহার করা হয় RAo-র আকার ১২২'০ × ৮৬'০ সেমিঃ।

কাগজের বর্ণনায় আরেকটি জিনিষ যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়, সেটা হচ্ছে কাগজের পাউণ্ড ওয়েট (pound weight) যেটা থেকে বোঝা যায়, এক রিম কাগজের ওজন। এটা কিলোগ্রাম মাপেও ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু কাগজের আকারের বিভিন্নতা ফলে একই কাগজ একেক সময় একেক মাপের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়। আধুনিক কালে যে ভাবে কাগজের ওজনের প্রকাশ করা হয় সেটা হচ্ছে প্রতি বর্গমিটারের গ্রামের এককে ওজন (grams per square metre অর্থাৎ gsm)। এই ব্যবস্থা অনেক সুবিধাজনক। যে কাগজের ওজন ২২০ জি. এস. এম. অথবা তার উপরে সেটাকে আর কাগজ না বলে বোর্ড বলা হয়।

বই ছাপাবার সময় পৃষ্ঠাগুলো এক বিশেষ ক্রমে সাজানো হয় যাতে ভাজ করার পর পৃষ্ঠারক্রম ঠিক থাকে। এই বিশেষ ক্রমটি হচ্ছে আটপেজী ফর্মার ক্ষেত্রে ৮, ১, ৫, ৪ এবং উল্টোদিকে ২, ৭, ৩, ৬। যোলপেজী ফর্মার ক্ষেত্রে ১, ১৬, ১৩, ৪, ৮, ৯, ১২, ৫ এবং উল্টো দিকে ৭, ১০, ১১, ৬, ২, ১৫, ১৪, ৩। সাজানোর এই ক্রম জানা থাকলে ছাপা ফর্মা ভাজ

করা সহজ হয়ে যায়। সাধারণত অবশ্য গ্রন্থাগারে ফর্মা ভাজের দরকার হয় না, কারণ এখানে ফর্মা ভাজ করা অবস্থাতেই বইয়ের মধ্যে বইয়ের আকারেই থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই ফর্মায় ১৬ পৃষ্ঠা অর্থাৎ ৮ পাতা থাকে। অবশ্য এর চেয়ে বড় আকারের (১২ অথবা ১৬ পাতা) ফর্মাও হতে পারে।

বাঁধায়ের বিস্তৃত আলোচনার আগে বাঁধানো বইয়ের বিভিন্ন অংশগুলো কি কি সেটা জেনে নেওয়া যাক। নীচের তিনটি ছবিতে বাঁধানো বইয়ে যে সব

বাঁধানো বইয়ের বাইরের বিভিন্ন অংশ
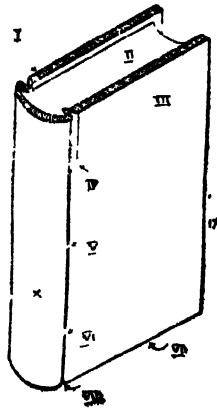
I পিছনে মলাটের বোর্ড, II বইয়ের উপরের দিক, III সামনের মলাটের বোর্ড, IV বাঁধাইয়ের খাঁজ বা ফ্রেঞ্চ গ্রুভ, V পুট এবং বোর্ডের সংযোগস্থল, VI সংযোগ-স্থলের বাইরের দিক, VII বইয়ের নীচের অংশ, VIII বইয়ের পিছনের প্রান্ত, IX বইয়ের সামনের দিক, X মসৃণ পুট।

অংশ থাকা সম্ভব তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি অংশের নিজস্ব কাজ এবং প্রয়োজন আছে বইটিকে মজবুত করে তুলতে। বাঁধাইয়ের কাজের প্রতি ধাপ করার সময় সেটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার যাতে প্রতিটি অংশ যথাযথ ভাবে হয়।

গ্রন্থাগারে বাঁধাইয়ের কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুনর্বাধাই-এর সময় করা হয়। সেজন্য বইটি বাঁধাবার কাজ সুরু করার আগে অথবা বাঁধাইয়ের প্রথম ধাপ হিসাবে বইটির সব পৃষ্ঠা ঠিক আছে কিনা সেটা দেখে নিতে হবে—যদি

কোন পট (প্লেট) বা মানচিত্র (ম্যাপ) না থাকে অথবা কোন পৃষ্ঠা না থেকে

বাঁধাই বইয়ের পুটের বিভিন্ন অংশ
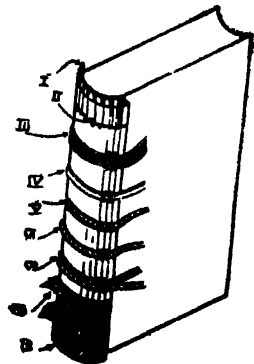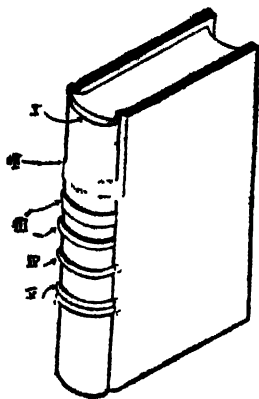
I পুটের সবচেয়ে উপরের অংশ বা হেড ক্যাপ, II টেপের অবসান, III উপস্তর বিন্যাস (সাধারণ এবং উঁচু), IV উঁচু দাঁড়, V উঁচু দাঁড়ির সমষ্টি

I হেড ব্যাণ্ড বা শিরজা, II শিরজাকে স্বস্থানে রাখার জন্য ব্যবহৃত টান, III রেশমা বা টেপ, IV চামড়া/ভেলামের ফিতে, V খাঁজে বসান দাঁড়, VI উঁচু দাঁড়, VII উঁচু দাঁড়ির সমষ্টি, VIII প্রথমস্তরে ব্যবহৃত গজ কাপড়, IX ক্রাফট কাগজের দ্বিতীয়স্তর

থাকে বা ছেঁড়া থাকে বা পৃষ্ঠায় ছাত্রাক বা অন্য কোন দাগ থাকে তবে সেটা লক্ষ্য করে রাখতে হবে।

এবারে একে একে ফর্মাগুলো আলাদা করতে হবে এমনভাবে, যাতে কাগজে বা ভাজে যতটা সম্ভব কম চাপ পড়ে বা ক্ষতি হয়। প্রকাশকের বাঁধাই হলে মলাটটা খুলে পুট থেকে ইঞ্চিখানেক বাদ দিয়ে বোর্ডটা কেটে নিতে হবে, যাতে পুস্তানি (endpaper), টেপ, পুটে লাগানো কাপড় খুলে ফেলা যায়। পুটের আঠা যদি ভঙ্গুর হয়ে গিয়ে থাকে তবে সহজেই সেটার অপসারণ সম্ভব। এবার আস্তে আস্তে প্রথম ফর্মাটি দেখে নিয়ে, তার সেলাইয়ের সুতোটি কেটে আলাদা করে নিতে হবে। অনেক সময় বইয়ের প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা পুরো একটা ফর্মার আকারে নাও থাকতে পারে। পট, সম্মুখচিত্র ইত্যাদি খোলার পর যথাযথভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে, কারণ তা না হলে যেহেতু এতে কোন পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া নেই, সেজন্য মিশে গেলে পরে সাজাতে অসুবিধা হবে। এভাবে

একেকটা ফর্মা সাবধানে খুলতে হবে। খুলতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে আঠা যথেষ্ট শক্ত ও মজবুত হওয়ায় কাজে অসুবিধা হচ্ছে তবে দুদিকের মলাটের বোর্ড খুলে ফেলে, পুটের ওপরের আবরণ খুলে ফেলতে হবে। এবার বইয়ের দুদিকে দুটো বোর্ড দিয়ে ফিনিশিং প্রেস (finishing press) এ আটকে পুটে পুরু করে পাতলা আঠা লাগিয়ে কিছুক্ষণ (মিনিট দশেক) রেখে দিয়ে ছুরির পেছন দিকটা দিয়ে চেছে নিলেই আঠা নরম হয়ে উঠে আসবে। দরকার হলে এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করা চলে, যতক্ষণ পর্যন্ত পুটের সব আঠা উঠে না যায়।

পুটের বিভিন্ন স্তর
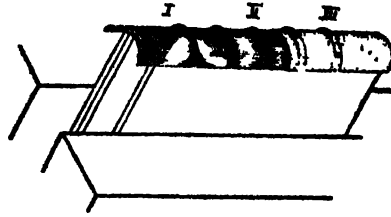
I প্রথম স্তর (কাপড়), II দ্বিতীয় স্তর (ক্রাফট কাগজ), III তৃতীয় স্তর (চামড়া)

এবার প্রতিটি ফর্মার গায়ে লেগে থাকা শক্ত হয়ে যাওয়া আঠা সুতোর টুকরো ইত্যাদি পরিষ্কার করে নিতে হবে। এই ফর্মাগুলো এরপর নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে সাজিয়ে রাখতে হবে। বইয়ের সামনে এবং সবশেষের কয়েকটি ফর্মা পুটের দিকটা দেখা যাবে কিছুটা বাঁকা, এটার কারণ হচ্ছে বাঁধাইয়ের সময় পুটকে গোলাকার করার জন্য চাপের প্রয়োগ। ঐ ফর্মাগুলো খুলে নেবার পর দু তিন ফর্মা একসাথে লোহার পাটাতনের ওপর রেখে হাল্কা ভাবে হাতুড়ী দিয়ে পিটিয়ে ঐ অংশটি সোজা করে নিতে হবে (নতুন অবস্থায় যেমনটি ছিল)। যদি মনে হয় কাগজটি দুর্বল তবে (অথবা আর্ট পেপারের ক্ষেত্রে) সেক্ষেত্রে ঐ অংশ পরিষ্কার কোন বর্জ্য কাগজে (waste paper) মুড়ে তবে ঠুকতে হবে।

যেসব ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ফর্মার পুটের দিকের অংশ ছিঁড়ে গেছে অথবা বাঁধাইয়ের পক্ষে যথেষ্ট শক্ত নয়, সেক্ষেত্রে "বণ্ড" কাগজ দিয়ে অংশটিকে সারানর মাধ্যমে মজবুত করে তুলতে হবে। কাগজের আঁশের দিশা (grain direction) দেখে নিয়ে ফর্মার দৈর্ঘ্যের চেয়ে একটু লম্বা এবং সরু মোটামুটি ১০ মিমি চওড়া টুকরো কেটে নিয়ে, তার উপর ভালভাবে আঠা

লাগাতে হবে (একদিকে বাড়তি লম্বা অংশ বাদ দিয়ে) বড় পরিষ্কার বর্জ পাতলা অথচ শক্ত কাগজের উপর রেখে তারপর ফর্মাটি আস্তে আস্তে এর উপর রাখতে হবে এমনভাবে, যাতে আঠা লাগানো প্রান্তটি ফর্মার প্রান্তের সঙ্গে মিশে যায় এবং পাতলা কাগজের অর্ধেকটা ফর্মাতে চাপা পড়ে। এবার নীচের বড় কাগজটি তুলে এমনভাবে উপরে চেপে দিতে হবে যাতে খণ্ডকাগজটি টানটানভাবে এবং সোজাভাবে ফর্মাতে সেঁটে যায়। এরপর বাড়তি অংশটি কেটে দিতে হবে। দুর্লভ এবং মূল্যবান বইয়ের ক্ষেত্রে জাপানী টিসু কাগজ ব্যবহার করা হয় ফর্মার পুটের অংশকে মজবুত করে তোলার জন্য।

কোন কোন বইয়ে বিচ্ছিন্ন (loose) মানচিত্র, পট ইত্যাদি থাকে, সেগুলো একত্রে এবং সুরক্ষিত ভাবে রাখার জন্য বইয়ের পিছনের মলাটের সাথে খাপ (pocket) করে দেওয়া যেতে পারে। পট, মানচিত্র ইত্যাদির মোট আয়তন অনুসারে খাপের নক্সা করা হয়। যদি খুব বেশী মোটা হয়ে যায় তবে বইয়ের পুট তৈরী করার সময় ঐ খাপের কথা মনে রেখে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বইয়ের বাঁধাই খোলার সময়ই বলা হয়েছে যদি কোন পাতা না পাওয়া যায় সেটা লিখে রাখতে হবে। এবার বাঁধাইয়ের কাজ সুরু করার আগে ঐসব পাতার অনুলিপি (photocopy) জোগাড় করে নির্দিষ্ট জায়গাতে ঢুকিয়ে দিতে হবে। দুর্লভ, মূল্যবান বইয়ের ক্ষেত্রে চেষ্টা করতে হবে ঐ হারিয়ে যাওয়া পাতাটি খুঁজে বার করা।

এবার দেখা যাক্ ছেঁড়া পাতা সম্বন্ধে কি করা হবে। ছেঁড়া অংশটি আস্তে আস্তে সঠিক অবস্থায় রেখে ভোতা সূঁচ দিয়ে চাপ দিয়ে কোনাগুলো মিলিয়ে দেবার পর সরু তুলি দিয়ে পাতলা করে ছেঁড়ার উপর আঠা বুলিয়ে দিতে হবে। এবার জাপানী টিসু কাগজ ছেঁড়ার তুলনায় একটু বড় করে কেটে নিয়ে ঐ আঠা লাগানো অংশের উপর টানটান করে পেতে বসিয়ে দিতে হবে। ঠিক একই ভাবে পাতার অন্য দিকেও টিসু কাগজ লাগিয়ে বাতাসে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিতে হবে। সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবার পর বাড়তি টিসু কাগজ ঘসে তুলেদিতে হবে। যদি মনে হয় যে আঠা প্রয়োগে পাতার রং নষ্ট হয়ে দাগ ধরতে পারে তবে কৃত্রিম আঠা ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে টিসু কাগজটি কাচের শীটের উপর পেতে নিয়ে ব্রাশের সাহায্যে তার উপর কৃত্রিম আঠা লাগাতে হবে। পলিভিনাইল অ্যাসিটেট আঠা নিয়ে তার সঙ্গে সমপরিমান জল মিশিয়ে পাতলা করে সেটা ব্যবহার করতে হবে।

শুকিয়ে যাবার পর টিস্যুটি কাচে সেটে থাকবে। এবার মেথোঅক্সিমেথল নাইলনের সঙ্গে ২ গ্রাম (Methoxymethol nylon) ক্যালাটোন সি. বি.

ছেড়া পাতা সারানর ব্যবস্থা
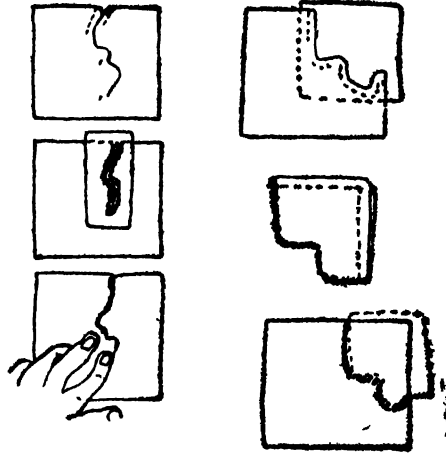
Calaton C. B.) ১০০ মিলিলিটার ইথানলে (Ethanol) ৬০° সেঃ তাপে মিশ্রণ তৈরী করতে হবে (যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করা দরকার কারণ পদার্থ দু'টিই খুবই দাহ্য এবং কোন অবস্থাতেই এটি যেন আগুনের শিখার সংস্পর্শে না আসে)। ঐ গরম মিশ্রণ টিস্যুর উপর লাগানোর সঙ্গে 'সঙ্গে টিস্যু কাগজ কাচের থেকে আলাদা হয়ে যায় (ক্যালটোন পলিভি-নাইল অ্যাসিটেট্‌কে গলিয়ে দেয়)। এবার ঐ কাগজ তুলে সিলিকোন রিলিজ কাগজএর (silicon release paper) মধ্যে রেখে দিতে হবে। দরকারমত ছেঁড়া অংশ জুড়বার জন্য প্রয়োজনীয় আকারে কেটে নিয়ে নির্দিষ্ট অংশের উপর রেখে তার উপর সিলিকন রিলিজ কাগজ রেখে উপর থেকে গরম ইস্ত্রি চালালেই এটি সহজেই জুড়ে যাবে।

পক্ষান্তরে টিস্যু কাগজের বদলে অতি সুক্ষ্ম নাইলন গসামার কাপড় (nylon gossamer fabric) ব্যবহার করা চলে। এটি খুবই পাতলা এবং স্বচ্ছ, সেজন্য ব্যবহারের পর বোঝা যায় না কোথায় লাগানো হয়েছে। মসৃণ কাচের সীটের উপর চওড়া ব্রাশ দিয়ে পলিভিনাইল অ্যাসিটেট আঠা সমপরিমাণ জলে মিশিয়ে পাতলা করে সেটা লাগাতে হবে। এবার ঐ আঠার উপর

গসামার কাপড়টি পেতে দিয়ে শুকনো ব্রাশ দিয়ে টানটান করে দিতে হবে। পুরো টানটান করার পর কাপড়টি খুলে আঠার দিকটি উপরে রেখে সরিয়ে রেখে আবার আগের মত করে আঠা কাচের উপর লাগিয়ে তার উপর কাপড়টি আবার টানটান করে পাততে হবে যাতে আঠা লাগানো দিকটা আঠার দিকে থাকে। ঐ অবস্থায় রেখে শুকোতে দিতে হবে। পুরো শুকিয়ে গেলে অল্প টানলেই কাচ থেকে কাপড় আলাদা হয়ে যাবে। এই কাপড়কে সিলিকান রিলিজ কাগজের মধ্যে রেখে দেওয়া হবে। দরকার মত নির্দিষ্ট আকারে কেটে নিয়ে যথাস্থানে টুকরোটি রেখে সিলিকন রিলিজ কাগজের উপর দিয়ে গরম ইস্ত্রির সাহায্যে জুড়ে দিতে হবে।

কাগজের আঠা লাগাবার সঠিক পদ্ধতি
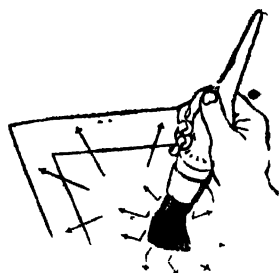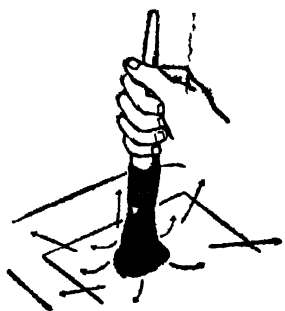
যদি পৃষ্ঠার কোন অংশ ছিঁড়ে হারিয়ে গিয়ে থাকে তবে একই ধরণের ওজন অর্থাৎ একই রং এবং একই আঁশ সম্বলিত কাগজ (যদি সম্ভব হয় একই বয়সের) এর টুকরো জোগাড় করে সেটাকে হারিয়ে যাওয়া অংশের তুলনায় একটু বড় করে (প্রতি ২মিমি এর মত) কেটে নির্দিষ্ট অংশে স্থাপন করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে যাতে লেখা বা ছাপা অংশ যতটা কম ঢাকা পড়ে ততই ভাল (কিন্তু অল্প কিছুটা ঢাকা পড়বেই)। যদি মনে হয় এতে পাঠযোগ্যতার বেশী ক্ষতি হচ্ছে, তবে নতুন কাগজটি বড় না রেখে (অর্থাৎ হারিয়ে যাওয়া অংশের সমান আকারে) কেটে জাপানী টিস্যু কাগজের সাহায্যে জুড়ে দিতে হবে।

যখনই কোন পাতা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে বা ছিড়ে যায় তখন সারানোর জন্য জাপানীটিস্যু কিংবা রেশমী কাপড় বা নাইলন গসামার কাপড় যেটাই ব্যবহার করা হোক না কেন সেটা পাতার দুই দিকেই প্রয়োগ করতে হবে।

অত্যন্ত দুর্বল কাগজকে মজবুত করার জন্য তার দুদিকেই টিস্যু বা রেশমী কাগজ প্রয়োগ কিভাবে করা হয় সেটা দেখা যাক। কাচ অথবা ফোর-মাইকার উপরে পাতলা টেরিলিন কাপড় রেখে তার উপর রেশমী-কাপড়ে বা জাপানী টিস্যু কাগজ টানটান করে রেখে তার ওপর ব্রাশ দিয়ে সমান ভাবে সব জায়গায় পাতলা আঠা লাগাতে হবে। পরে এর উপর পাতাটি রেখে তার উপর আবার ব্রাশ দিয়ে আঠা ভালভাবে লাগানোর পর টিস্যু কাগজ বা রেশমী কাপড় পেতে টানটান করে দিতে হবে যাতে ভেতরে কোন বাতাস না থেকে যায়। শুকিয়ে গেলে সারানো পাতাটা কাঁচের ওপর থেকে তুলে টেরেলিন কাপড়টি টেনে খুলে নিতে হবে। এখানে টেরিলিন কাপড় ব্যবহার করা হয়েছে যাতে কাগজ কাচে সেটে না যায় তার জন্য।

পাতার প্রান্ত ভাঁজ হয়ে থাকলে সেই অংশটা ভেজা স্পঞ্জ ব্যবহার করে ভিজিয়ে নিয়ে খুলে চাপের মধ্যে রাখতে হবে।

সাধারণভাবে দেখা যায় পুরানো বইয়ের পাতায় নানা ধরণের দাগ লেগে ময়লা হয়ে গেছে। বইটি যদি যথেষ্ট মূল্যবান হয় তবেই তার পেছনে সময় ও পরিশ্রম খরচ করে পরিষ্কারের ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত। এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাব-ধানতা অবলম্বনের দরকার আছে। নতুবা বইয়ের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়। এই ব্যাপারে নীচে উল্লেখ করা পদ্ধতিগুলি ক্রমানুসারে ব্যবহার করা চলে সতর্কতার সঙ্গে। প্রথমটির তুলনায় পরেরটি যেহেতু সামান্য বেশী ক্ষতিকারক হতে পারে, সেহেতু যতটা দরকার ঠিক ততটুকই প্রয়োগ করা উচিত, তার বেশী নয়।

(১) নরম ব্রাশের সাহায্যে ধুলো ময়লা পরিষ্কার করতে হবে।

(২) নরম রবারের দানা কাগজের উপর ছড়িয়ে তুলো দিয়ে ঘসতে হবে।

(৩) নরম রবারের পর অপেক্ষাকৃত কম নরম রবারে ঘসে পরিষ্কার করতে হবে।

(৪) কাগজ যদি যথেষ্ট শক্ত হয়, তবে খুব সাবধানতার সঙ্গে সবচেয়ে সূক্ষ্ম শিরিষ কাগজ দিয়ে আলতো করে ঘসতে হবে।

কাগজে অথবা ভোলামে তেলচিটে দাগ তোলার ব্যাপারে কার্বন টেট্রাক্লো-রাইড ব্যবহার করা চলে এতে জলরং অথবা কালির কোন ক্ষতি হয় না। সহজেই বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য এর কোন রেশ মাধ্যমের মধ্যে থাকে না। তুলোয় এটি অল্প করে লাগিয়ে নিয়ে সেটা দিয়ে পাতাটি মৃদু চাপে মুছে

পরিষ্কার করে নেওয়া যায়। তুলোয় যদি অনেকটা রাসায়নিক নেওয়া হয়। তবে মাধ্যমের ক্ষতি হতে পারে। এটি বাষ্পীভূত অবস্থায় শরীরের ক্ষতিকারক, সেজন্য এটি ব্যবহারের সময় নাকে রুমাল বেঁধে নেওয়া দরকার। সম্ভব হলে খোলা জায়গায় অথবা এমন ঘরে যেখানে হাওয়া চলাচলের ভাল ব্যবস্থা আছে, সেখানে বসে এটা নিয়ে কাজ করা উচিত। মনে রাখতে হতে এটি খুবই দামী।

কালির দাগ তুলতে ১0% সাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণের প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু এটি ব্যবহারের পর পাতাটি ৩০ মিনিট বহমান জলে ধুয়ে নিতে হবে যাতে অ্যাসিডের কোন রেশ না থাকে। পরে পাতাটি সাইজ (size) করে নিতে হবে।

কোন পাতা তরল দ্রাবকে ডোবাবার আগে পরীক্ষা করে নিতে হবে এর দ্বারা কালির বা ব্যবহৃত রংএর কোন ক্ষতি হতে পারে কিনা। খুব সরু ব্রাসে করে তরল দ্রাবক পাতার কোন লেখার এক প্রান্তে ছোঁয়াতে হবে এর মিনিট দশেক পর আতস কাঁচের মাধ্যমে লক্ষ্য করতে হবে এর রং ছড়িয়ে পড়েছে কিনা। যদি ছড়িয়ে না থাকে তবে বুঝতে হবে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। আর যদি ছড়িয়ে থাকে তবে নাইলন মিশ্রণের প্রয়োগে সেটা স্থায়ী করে নিতে হবে।

কাগজের ওপর ছত্রাক ঘটিত দাগ তোলার জন্য নীচের তিনটি মিশ্রণের মধ্যে যে কোনটি ব্যবহার করা চলে। এ ছাড়া অন্য কোন মিশ্রণ ব্যবহার না করাই উচিত।

(ক) প্রতিলিটারে ১ থেকে ৫ গ্রাম সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, (খ) (খ) প্রতি লিটারে ১ থেকে ৫ গ্রাম ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড অথবা (গ) প্রতিলিটারে ৫ থেকে ২০ গ্রাম ক্লোরামিন টি মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে। শেষোক্ত মিশ্রণটি অত্যন্ত ধীরে কাজ করে এবং অত্যন্ত উপযোগী। বেশী দাগ ধরা পাতা একটি বড় ট্রেতে মিশ্রণের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত মিশ্রণের রং হলুদ হয়ে যায়। মিশ্রণের রং হলুদ হয়ে গেলে বুঝতে হবে মিশ্রণের শক্তি নিঃশেষিত, তখন নতুন মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। পাতা এই ভাবে পরিষ্কার করার পর তিন ঘণ্টা বহমান জলে ধুয়ে, তারপর শুকিয়ে নিয়ে সাইজ করতে হবে।

বানিজ্যিক ভিত্তিতে দানার অথবা পাতার আকারে জিলেটিন কিনতে পাওয়া যায়। এটি ভাল মানের কাগজকে পুনরায় সাইজ করার জন্য ব্যবহার করা

হয়। ৪ লিটার গরম জলে 50 গ্রাম অনুপাতে জিলেটিনের মিশ্রণ তৈরী করতে হবে। কাগজ পরিষ্কার করা বা অন্য কারণে জলে ধোয়ার পর অতিরিক্ত জল উন্নতমানের ব্লটিং কাগজে শুষে নিয়ে সেই প্রায় শুকনো কাগজ গরম মিশ্রণের মধ্যে ১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে। তারপর মিশ্রণ থেকে তোলার পর অতিরিক্ত মিশ্রণ আবার ব্লটিং কাগজে শুষে নিয়ে, কাগজটি হয় ঝুলিয়ে অথবা দুটি মোমকাগজের মাঝে চাপে রেখে শুকিয়ে নিতে হবে।

আরেকভাবেও সাইজ করা যায়। ২৫0 গ্রাম পার্চমেন্ট অথবা ভেলামের টুকরো ১½ লিটার জলে ১½ ঘন্টা অল্প আঁচে গরম করতে হবে। তৈরী মিশ্রণ পাতলা মসলিন কাপড়ে ছেঁকে ঐ মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে ৪0° সেঃ তাপমাত্রায়।

এছাড়া দ্রবণীয় নাইলন পাউডারের ৫% মেথিলেটেড স্পিরিটে মিশ্রণ তৈরী করে সেই মিশ্রণ নরম এবং দুর্বল কাগজের ক্ষেত্রে সাইজিং-এর জন্য ব্যবহার করা চলে। দ্রবণীয় কালি, জলরং ইত্যাদি যে কাগজে ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপর জল প্রয়োগের আগে নরম ব্রাশের সাহায্যে এই মিশ্রণে প্রলেপ দিয়ে নিলে কালি ইত্যাদি জলে নষ্ট হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

পেন্সিলে লেখা পাণ্ডুলিপি এবং আঁকা ছবি স্থায়ী করার জন্য ৬00 সিসি জলে ১৫ গ্রাম ইজিনগ্লাস-এর (Izinglass) মিশ্রণের প্রয়োগ করা দরকার।

পাতাগুলো পরিষ্কার করে, সারান এবং মজবুত করে এবার সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবার পর কম করে ২৪ ঘন্টার জন্য জোরালো চাপে রাখতে হবে। সূক্ষ্ম বাঁধাইয়ের জন্য চাপে আরো বেশী সময় রাখা দরকার—অন্তত সাত দিন। চাপের মধ্যে থাকার ফলে বইটি যখন তার ন্যূনতম অবস্থায় এসে যায়, একমাত্র তখনই বাঁধাই করা চলে। চাপে থাকার ফলে পাতার মধ্যেকার বাতাস বের হয়ে যায় এবং পাতাগুলো চাপে ঠিকভাবে থাকে।

বই চাপে রাখার সময় সবচেয়ে বড় আকারের বইটি নীচে তারপর আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে সবচেয়ে ছোটটি সবার উপরে রাখতে হবে। প্রথম চাপে রাখার কয়েক ঘন্টা পর চাপ আরো কিছুটা বাড়িয়ে দিতে হবে কারণ ঐ সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত বাতাস বের হয়ে যাওয়ায় অবস্থাটা আরো চাপ বাড়াবার অনুকূল হয়ে উঠে।

বইয়ের মধ্যে ছোট আকারের পট কিংবা হাতে লেখা পুঁথির ক্ষেত্রে এমন অলঙ্করণ যদি থাকে যেগুলো কাগজের চেয়ে কিছুটা উঁচু, তবে দরকার মত

মৃদু চাপ দিতে হবে কারণ বেশী চাপ দিলে অলংকরণ অথবা কাগজ কিংবা দুইয়েরই অপূরণীয় ক্ষতি হবে। চাপ দেবার সময় সর্বদা মনে রাখতে হবে ঐ চাপ যাতে বইয়ের বা তার কোন অংশের ক্ষতি না করতে পারে। খুব পুরানো হাতে তৈরী কাগজের পুঁথির ক্ষেত্রে চাপে রাখার আগে পাতাগুলো অল্প আর্দ্র করে নেওয়া উচিত তার ফলে চাপে কাগজের আঁশগুলো ছড়িয়ে চেপে যায়। নতুন ছাপা কাগজের ক্ষেত্রে যদি মনে হয় চাপে কালির জন্য একটা পাতা পাশেরটির সঙ্গে জুড়ে যাবে (যে ব্যাপারটি আর্ট কাগজে ছাপা, বিশেষতঃ রঙ্গীন পটের ক্ষেত্রে বেশী ঘটে থাকে) তবে প্রতি দুটি পাতার মধ্যে টিসু বা পাতলা কাগজ দিয়ে তবে চাপ দিতে হবে যাতে জুড়ে না যায় (interleaving)।

পুস্তানি

পুস্তানির (endpaper) কাজ—এটির মলাটের দিকের অংশ, মলাটকে বাইরের দিকে বাঁকিয়ে যাওয়ার (যেটা বাইরের দিকে লাগানো কাগজ বা কাপড় ইত্যাদির টান হবার সম্ভাবনা থাকে) হাত থেকে রক্ষা করে অপর অংশটি বই খোলা বন্ধ করার সময় প্রথম ফর্মার উপর চাপজনিত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায়। অতএব বোঝা যাচ্ছে এদের উপস্থিতি শুধুমাত্র অলংকরণের জন্য নয়। এরা বাঁধাইকে আরো শক্ত করতে সাহায্য করে। পুস্তানি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে নানাভাবে তৈরী হয়েছে, ঘটেছে তার নানা বিবর্তন। বাঁধাইয়ের প্রথম যুগে এটি ছিল খুবই সাদাসিধে এবং সেযুগের পুস্তানি বাঁধাইকে মোটেই মজবুত করার কাজে সহায়তা করতে পারতো না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কারিগর এর উন্নয়নে প্রভূত অবদান যুগিয়েছে।

পুস্তানির কাগজ হওয়া দরকার মজবুত এবং উচ্চমানের, হাতে তৈরী না হলেও চলবে, কারণ ঐ ধরণের কাগজ ব্যবহারে কয়েকটি অসুবিধা আছে, যেমন সাঁটতে বা প্রসারিত করতে (streched) অসুবিধা হয়। সাধারণভাবে কার্ট্রিজ কাগজ এ ব্যাপারে যথেষ্ট উপযোগী। তবে নানা ধরণের কাগজ পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে বিশেষ বিশেষ বাঁধাইয়ের জন্য উপযোগী কাগজটি নির্বাচন করা হয়।

পুস্তানি যদি রঙ্গীন হয় তবে তার রং নির্বাচন করতে হবে মলাটের রং-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

সবচেয়ে সস্তা এবং অত্যন্ত দুর্বল পুস্তানি যেটি সাধারণত প্রায় সব প্রকাশকে বাঁধাইয়ে (publishers binding) ব্যবহৃত হয় সেই পুস্তানিতে কোন সেলাই থাকে না, শুধুমাত্র প্রথম ফর্মার সঙ্গে পুটের দিকে সামান্য অংশ (৩ মিমি) আঠা দিয়ে আটকানো থাকে।

অপেক্ষাকৃত কয়েকটি টেকসই এবং মজবুত বাঁধাইয়ের সহায়ক পুস্তানি সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যাক। এই ধরণের একটি পুস্তানি ফর্মার মত বইয়ের সঙ্গে সেলাই করা তো হয়ই, তা ছাড়াও প্রথম ফর্মার সঙ্গে অল্প আঠা দিয়ে জোড়া হয়। এই পুস্তানিতে চারটি পাতা থাকে যার মধ্যে দুই আর তিন নম্বর পাতা একটা আরেকটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় ফলে সেটি মোটা পাতায় রূপান্তরিত হয়। মোটা বইয়ের পক্ষে এটি চললেও অপেক্ষাকৃত সরু বইয়ে এই মোটা পাতাটা দৃষ্টিকটু লাগে। সেলাইয়ের সময় লক্ষ্য করা দরকার যাতে বোর্ডে লাগাবার পাতাটিতে ফুটো না হয়।

গ্রন্থাগারের উপযোগী বাঁধাই (library binding) এর জন্য যে পুস্তানি খুবই উপযুক্ত (কারণ এটি যেমন মজবুত তেমনি পরিপাটি) সেটিতে ৫ সেমি চওড়া পুটের দিকে কাপড় ব্যবহার করা হয়, যদিও সেটা বাইরের দিক থেকে দেখা যায় না। কাপড়ের বেশী অংশই বোর্ডের এবং বোর্ডের উপর লাগানো কাগজের মধ্যে থেকে যায়। অন্য অংশটি প্রথম ফর্মা এবং তার সংলগ্ন পুস্তানির কাগজের পুটের প্রান্তটি যেখানে আঠা লাগিয়ে জোড়া হয় সেখানে থাকে। এই পুস্তানিটিও ফর্মার সাথে সেলাই করে জোড়া হয়।

এই ধরণের পুস্তানির একটি রকমফের আছে যেটিতে কাপড়টি বাইরে থেকে দেখা যায়। যদিও এটি দেখতে ভালো লাগে না তবু এটি খুবই মজবুত। এটিতে দুটি পাতা থাকে যার মধ্যে দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ পঞ্চম একসাথে জোড়া থাকে। তৃতীয় এবং চতুর্থের পুটের দিকটা কাপড়ের তৈরী (৩·৭৫ সেমি অর্থাৎ ১½ ইঞ্চি) সেটা সেলাই করে ফর্মার সাথে আটা হয়। এইখানেই কাপড় বাইরে থেকে দেখা যায়। এখানে কি ধরণের কাপড় ব্যবহৃত হবে সেটি নির্ভর করে বইটি কতটা মোটা তার উপর।

এইবার সেলাই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার আগে পুটের দিকটা একটু দেখে নেওয়া যাক। বাঁধাই সুরুর প্রথমযুগ থেকে আজ পর্যন্ত পুটের চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন পুটের চেহারা আগেকার তুলনায় আরো বেশী গোলাকার হয়েছে, যাতে প্রায় প্রতি ফর্মার পুটে সমান চাপ পড়ে

(আগে বইয়ের সামনের এবং সবচেয়ে পেছনের গোটা দু তিন ফর্মার উপর সবচেয়ে বেশী চাপ পড়ত)। কিন্তু বইয়ের চেহারা, বিশেষত সেটা কত মোটা, তার উপরই পুটের চেহারা অনেকটাই নির্ভর করে। তাছাড়া কাগজের নমনীয়তা ও সেটা কতটা মোটা, ফর্মা সেলাই করতে কি ধরণের (মোটা না সরু) সুতো ব্যবহার করা হয়েছে ইত্যাদিও এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় অংশ নিয়ে থাকে। বই খুব পাতলা হলে বা যে বাঁধাইয়ে পুটটা সোজা রাখা হয় সেক্ষেত্রে পুট বাঁকা করার জন্য বর্তুলীকরণ (rounding) এর দরকার হয় না। সাধারণত যেসব বইয়ের পুটের অংশ সারানো হয়েছে বা

পুটের বর্তুলীকরণের প্রথম ধাপ
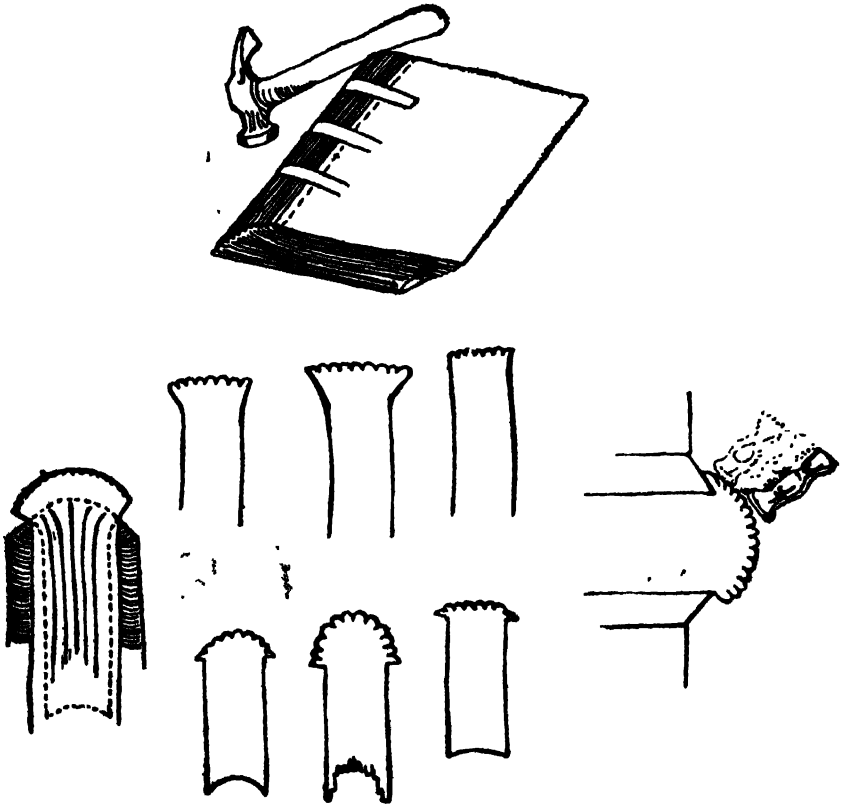
ডান দিক থেকে বাঁয়ে : (১) সঠিক পুটে মলাট ধরে রাখার উপযুক্ত খাঁজ থাকে। (২) প্রথমে কম তারপর অতিরিক্ত এবং শেষে সঠিক বর্তুলীকরণ, (৩) সঠিক বর্তুলীকরণের জন্য হাতুড়ীর ব্যবহার।

বাঁধাইতে মোটা সুতো ব্যবহার করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে পুট মোটা হয়ে যায়। এর প্রতিকার হিসাবে সারানোর জন্য মজবুত অথচ জাপানী টিসু ব্যবহার করে হাতুড়ীর মৃদু আঘাতের মাধ্যমে পুটের অবস্থা অপরিবর্তীত রাখা সম্ভব। ভাল বাঁধাইয়ের জন্য সব সময়ই চেষ্টা করতে হবে যাতে পুট অকারণ অতিরিক্ত মোটা না হয়ে পড়ে।

সেলাই

এবারে সেলাই। সেলাইটা ফ্রেমে লাগিয়ে করাটাই সুবিধাজনক। ফ্রেমে টেপ বা সুতলি (যেটা ব্যবহার করা হবে) লাগিয়ে তৈরী করে রাখা সুবিধাজনক। দরকার মত ফ্রেমের উপরের কাঠটি (crossbar) নামিয়ে নিতে হবে

যথাযথ সেলাইয়ের জন্য সূঁচে সুতোর ব্যবহার, কয়েকধরণের বাঁধন এবং সঠিক সেলাইএর পদ্ধতি
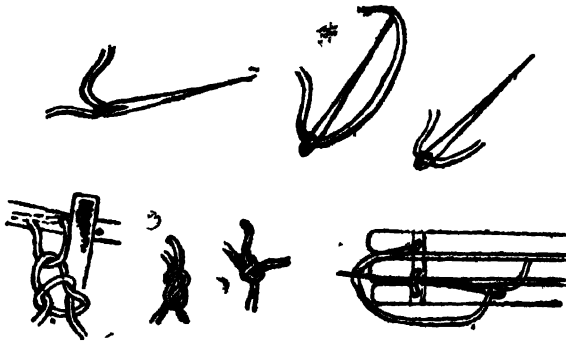
বইয়ের পুট অনুসারে। লক্ষ্য রাখা দরকার টেপ বা সুতলী যাই হোক না কেন, সেটা যেন বেশ টানাটান থাকে।

বাঁধাইয়ে নানা ধরণের সেলাই করা হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি আলাদা ধরণের বইয়ের (মোটা, সরু, মজবুত, কম মজবুত) জন্য। এর মধ্যে কয়েকটা যথেষ্ট মজবুত, অন্যগুলো ততটা নয়। কয়েকটা করতে যথেষ্ট মেহনত এবং সময় লাগে এবং স্বাভাবিক ভাবেই কাজও হয় মজবুত। অন্য কয়েকটা ঠিক তার উল্টো।

সব ধরণের সেলাই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। উল্লেখ-যোগ্য কয়েকটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যেতে পারে। সরু পুস্তিকার জন্য উপযোগী সেলাইয়ের ক্ষেত্রে বইয়ের পুটের পাশে তিনটি অথবা পাঁচটি অথবা আরো বেশী ফুটো করে নেওয়া হয়। এবার ঐগুলোর মধ্য দিয়ে সুতো টেনে শক্ত করে সেলাই করা হয় (ছবিতে দেখান আছে)। এই ধরণের সেলাই

সাধারণ বা বটীকর সেলাই ঃ
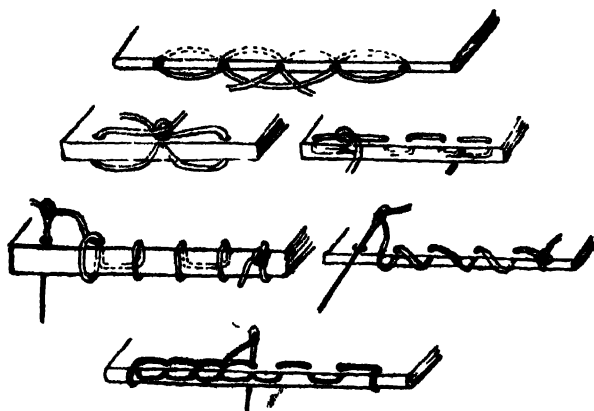
জোইপেটা

সাধারণত কম মূল্যবান বইয়ের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই ধরণের সেলাই করা হলে বাঁধানো বইয়ের পাতাগুলো পুরোপুরি খোলা যায় না; খুলতে অসুবিধা হয়। পুটে চাপ পড়ে। ফলে বাঁধাইয়ের সুরু আথবা কাগজ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে বা ছিড়ে যায়। ভাল বাধাইয়ের জন্য সবচেয়ে উপোযোগী জুস সেলাই। যেহেতু এই পদ্ধতিতে প্রতি ফর্মা তার পরের ফর্মার সাথে করে সেলাই করা দরকার হয়ে পড়ে সেহেতু এটি পরিশ্রম এবং সময় সাপেক্ষ। টেপ সহযোগে এইভাবে সেলাই করা বইয়ের বাঁধাই সবচেয়ে মজবুত হয়।

গ্রন্থাগারে এই ধরণের বাঁধাই-এর প্রয়োগ হওয়া উচিত এবং এই কারণে আমরা এ ধরণের বাঁধাইকে গ্রন্থাগারের পক্ষে উপযোগী বাঁধাই বলতে পারি।

জুস সেলাইয়ের নানা ধরণের রকমফের আছে যেমন কোন ধরণের

পুরু উঁচু দড়ি সহযোগে সেলাই
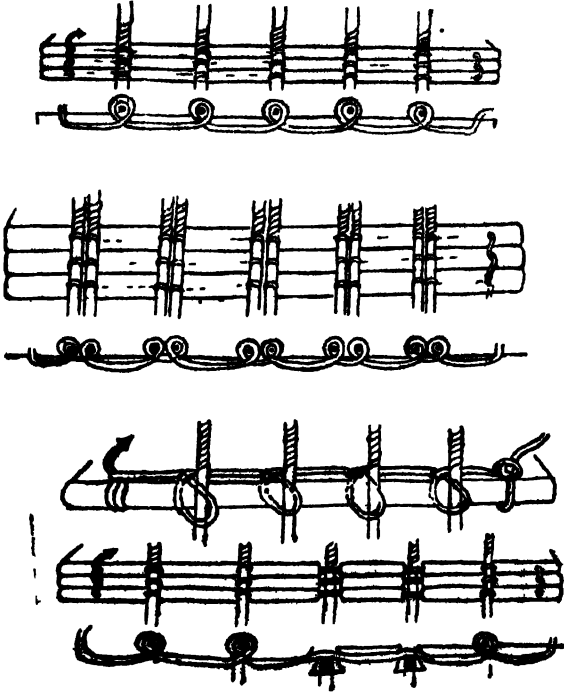
সেলাইয়ে এক সাথে তিনটি ফর্মা, কোথাও চারটি ফর্মা একসাথে জুড়ে নেওয়া সম্ভব। সাধারণ জুস সেলাইয়ের জন্য সূঁচে লম্বা সূতো

কেটল স্টীচ
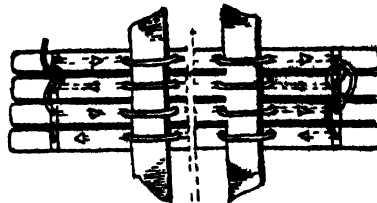
লাগিয়ে একেকটা করে ফর্মা হয় অথবা আট বা তারও বেশী ফোঁড় দিয়ে সেলাই করা হয়। একটা ফর্মা সেলাইয়ের পর সেই সূতো দিয়ে পরবর্তী ফর্মা, এমনি

ভাবে সব ফর্মাগুলোকে একত্রে সেলাই করে দেওয়া হয়। সেলাই এবং বাঁধাই মজবুত করার জন্য তসমা বা টেপের পরিবর্তে সুতলিও ব্যবহার করা হয় কখনও কখনও। এইগুলির সংখ্যা দুই বা ততোধিক হতে পারে। সংখ্যা যাই হোক না কেন এগুলি পুটের ওপর বইয়ের দুই প্রান্ত থেকে সমান দূরে আড়াআড়িভাবে রেখে সেলাই করা হয়। এগুলির প্রধান কাজ হচ্ছে বইয়ের সঙ্গে মলাটটিকে শক্ত করে আটকে রাখতে সাহায্য করা। সে কারণে পুটের চেয়ে এই সুতলির মাপ প্রতি দিকে অন্তত ৩·৭৫ সেমিঃ (দেড় ইঞ্চি) লম্বা রাখা হয়, সেটা মলাটের বোর্ডের মধ্যে ঢুকিয়ে শক্ত করে আটকে দেওয়া হয়। পুটে ঐ সুতলি দুইভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রথমটিতে এটি পুটের উপরে লাগানো থাকে এর ফলে যদিও বাঁধাই শক্ত হয় তবু পুটের উপর উঁচু হয়ে থাকে সে কারণে পুট মসৃণ হয় না। অন্যভাবে প্রয়োগে পুট মসৃণ হয় কারণ পুটে আড়াআড়ি ভাবে করাত চালিয়ে খাঁজ কাটা হয় যার মধ্যে সুতলি ঢুকে যায়।

সেলাইয়ের রকমফের
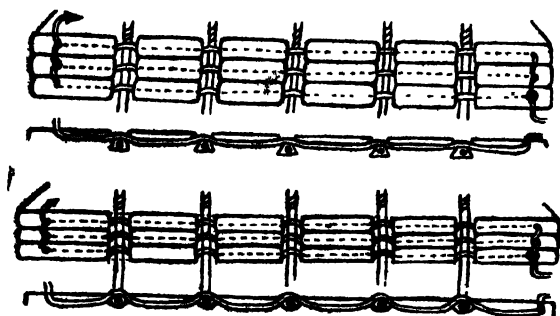
কিন্তু এই ভাবে প্রয়োগ বইয়ের ফর্মার পুটের অংশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং একবার সেলাইয়ে সুতোটি যদি কোন ভাবে ছিঁড়ে যায় তবে বাঁধাই খুলে আসে। যেহেতু পুট বর্তুলীকরণ এবং মসৃণ করার জন্য দ্বিতীয় পদ্ধতি সুবিধা-জনক সে জন্য এর ব্যবহারই বেশী প্রচলিত। কিন্তু গ্রন্থাগারের বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ না করাই উচিত।

যে সব বইয়ে ফর্মার বদলে শুধু আলগা কাগজের সমষ্টি থাকে অথবা যেখানে ফর্মার পুটের দিকের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় জুস সেলাই

অসম্ভব, সেক্ষেত্রে ঐ সমস্যার সমাধান করা চলে দুইভাবে। প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে পুটের অংশে মজবুত অথচ পাতলা কাগজ দিয়ে ঐ অংশকে জুস সেলাইয়ের

সেলাইয়ের রকমফের
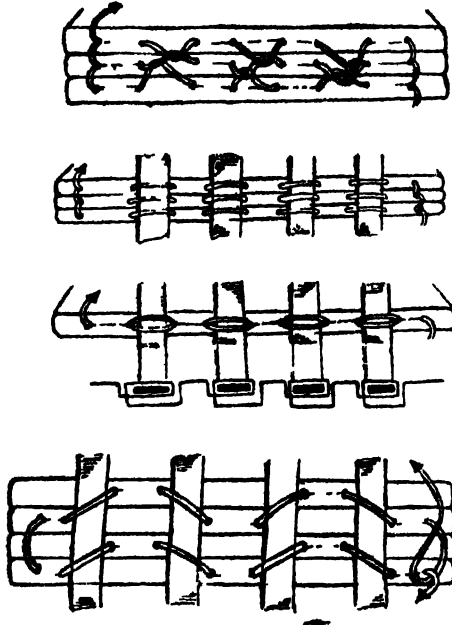
উপরি ক্রশ সেলাই, নীচে নানাধরণের টেপ সহযোগে সেলাই

উপযুক্ত করে নিযে তারপর জুস সেলাই করা হয়। কিন্তু এতে পুটের দিকটা মোটা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে যদি না জাপানী টিসু ব্যবহার করে পিটিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু এটি যেহেতু অত্যন্ত খরচ এবং সময় সাপেক্ষ সেজন্য খুব মূল্যবান বই ছাড়া এর প্রয়োগ বড় একটা হয় না। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতিটির ব্যবহার করা হয়। এতে যে ধরণের সেলাই করা হয় সেটা লেইপেটা বা লেপটা সেলাই (overcasting) নামে পরিচিত। এর জন্য শক্ত অথচ সরু সুতো ব্যবহার করা হয় পুটের প্রান্ত থেকে ৩ মিলিমিটার (⅛ ইঞ্চি) দূরে ছুঁচের ফোঁড় দিয়ে সেলাই করা হয়। সেলাই পুটের প্রান্ত থেকে যত দূরে হবে হবে বইটা পেতে খুলতে তত বেশী অসুবিধা হবে। অবশ্য লেইপেটা সেলাই করা বই কোন অবস্থায়ই জুস সেলাই করা বইয়ের মত পেতে খোলা সম্ভব নয়।

এই পদ্ধতিতে আট-দশটা পাতা এক সাথে সেলাই করে জুড়ে নেওয়া হয়। এইভাবে পাতাগুলো আলাদা আলাদা গোছে রূপান্তরিত করার পর সবগুলোকে

সেলাইয়ের রকমফের
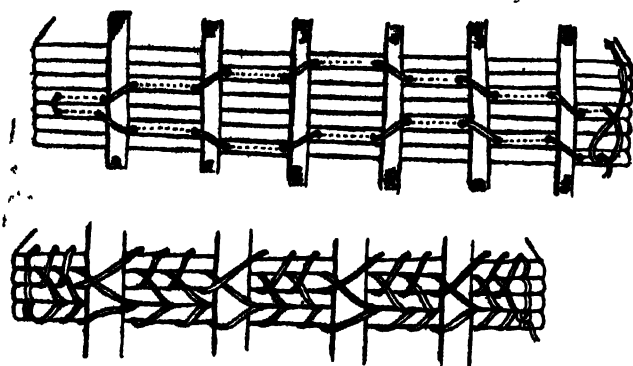
একত্রিত করে সেলাই করা হয়। এই পদ্ধতিকে কিছুটা মজবুত করার জন্য গুচ্ছকরণের সময় পুটে টেপ বা তর্শমা দিয়ে সেলাই করা চলে। এই ধরণের সেলাইয়ে পাতাগুলোকে ধরে রাখার ব্যাপারে আঠা একটা মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে।

পুট তৈরীর পদ্ধতি

ফর্মা সেলাই হয়ে যাবার পর পুটের ওপর যথাযথভাবে নমনীয় আঠা প্রয়োগ করতে হয়, যাতে পুটের তো বটেই প্রতি ফর্মাই এই আঠাতে জুড়তে পারে। এই আঠা শুকোবার আগেই পুটকে হাতুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে পিটে বর্তুলাকার করা হয়। কিন্তু তার আগেই সেলাই শেষ হবার পর বইয়ের পাতাগুলো যন্ত্রের সাহায্যে কেটে সমান করে নেওয়া হয়। লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে কাটার সময় দরকার মত ন্যূনতম অংশই বাদ যায়, কারণ অতিরিক্ত কাটা হলে বইয়ের চেহারা এবং পৃষ্ঠার আয়তনের সাথে ছাপার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কাটার জন্য বইটিকে যথাযথ ভাবে যন্ত্রে রেখে সেটিকে পুরো চাপে আটকে রাখা হয়। কাগজ যদি দুর্বল হয় অথবা যন্ত্রের ব্লেড (Blade) যদি যথেষ্ট ধারালো না হয় তবে কাটা মসৃণ হয় না এবং দেখতে

অত্যন্ত বিশ্রী লাগে। সে কারণে ব্যবহারের আগে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিত ব্লেড যথেষ্ট ধারালো কিনা এবং যথাযথ ভাবে আটকানো আছে কিনা ইত্যাদি। বই কাটার জন্য চাপে রাখার সময় দু'দিকে দু'টি বোর্ড দিয়ে নিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বাঁধাইয়ের জন্য ব্যবহৃত বোর্ড বইয়ের পাতার আয়তনের চেয়ে একটু বড় আকারের হওয়া দরকার। যদিও গিলোটিন ধরণের কাটার যন্ত্রের দাম সবচেয়ে বেশী তবু সম্ভব হলে এটিই ব্যবহার করা উচিত কারণ তাতে ভাল ফল পাওয়া যায়। যথেষ্ট এবং যথাযথ ভাবে চাপ প্রয়োগ করা না হলে গিলোটিন ব্যবহারের সব সুফল পাওয়া সম্ভব নয়।

বিভিন্ন বাঁধাইয়ে মলাটের নমনীয়তা
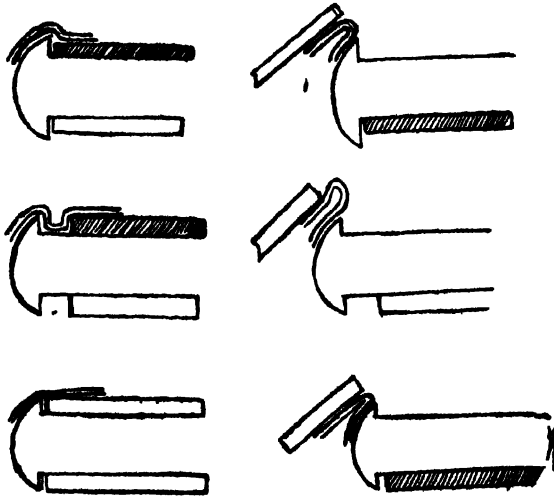
উপরে—প্রকাশক বাঁধাই, মাঝে—গ্রন্থাগার বাঁধাই, নীচে—নমনীয় বা ফ্লেক্সিবল বাঁধাই

আগেই বলা হয়েছে বাঁধাইয়ের মান এবং স্থায়িত্ব সেলাইয়ের উপর যথেষ্ট নির্ভর করে। সেলাই ছাড়া অন্য যে জিনিষের উপর এটি নির্ভরশীল সেটা হচ্ছে যথাযথভাবে পুট তৈরী করা যেমন বর্তুলীকরণ (rounding)। যেসব বইয়ের পুটে বর্তুলীকরণ করা হয় না সেটি ব্যবহারের জন্য খুলতে বা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা না হলেও সেটি যখন তাকের ওপর দাঁড় করানো থাকে তখন মধ্যাকর্ষণের ফলে বইয়ের পাতাগুলো সামনের দিকে (পুটের বিপরীত

দিকে) ঝুঁকে পড়তে চায়। যার ফলে তশমা বা ব্যবহৃত সুতলীর উপর চাপ পড়ে, ফলে সেটি দুর্বল হয়ে ছিঁড়ে যেতে পারে। কিন্তু পুট যদি বর্তুলাকার করা থাকে তবে চাপ সব জায়গায় সমানভাবে পড়ায় বাঁধাই ক্ষতিগ্রস্থ হবার

পুটের বিভিন্ন রূপ

অত্যন্ত কম বর্তুলীকৃত   প্রথম এবং শেষের দিকের ফর্মায় অতিরিক্ত চাপ   সঠিক বর্তুলীকৃত

সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। সেজন্য স্থায়ীভাবে বাঁধাই করার জন্য বর্তুলীকরণ অত্যন্ত জরুরী। কতটা বাঁকানো হবে তার কোন সঠিক মান বর্ণনা করা না চললেও মোটামুটি বলা চলে যে পুটটি বৃত্তের একতৃতীয়াংশের আকার ধারণ করে। অভিজ্ঞতা থেকেই সঠিক পরিমাণে এবং সঠিকভাবে বর্তুলীকরণ সম্ভব। বইয়ের ঠিক মাঝের ফর্মাটি অপরিবর্তীত রেখে ডান এবং বাঁয়ে দুদিকের ফর্মা ক্রমশ বাইরের দিকে বাঁকেয়ে দিতে হবে হাল্কা হাতুড়ীর ঠোকায়। হাতুড়ীর ব্যবহার এবং চাপের পরিমাণ সঠিক হয় একমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। বিভিন্ন ধাপ ছবির মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তুলীকরণ প্রয়োজনের চেয়ে কম অথবা অতিরিক্ত করলে সেটা বইয়ের স্বাস্থ্য এবং স্থায়ীত্বের পক্ষে ক্ষতিকারক। অতিরিক্ত হয়ে গেলে বই পেতে খোলা সম্ভব নয় না। বই যদি যথেষ্ট মোটা না হয় তবে বর্তুলীকরণ সম্ভব নয়।

বইয়ে বাঁধাইয়ের জন্য ব্যবহৃত বোর্ড কত মোটা বা শক্ত হবে সেটা নির্ভর করে বইয়ের ওজন এবং গড়নের উপর। বইয়ের প্রথম ফর্মা থেকে পুটের সর্বোচ্চ প্রান্তটি প্রকাশক বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে মলাটের বোর্ডের পুরুত্বের দেড়গুণ হয়ে থাকে যাতে মলাটের কাপড়টি আঁটসাটভাবে মলাটটিকে ধরে রাখতে পারে। গ্রন্থাগার বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে এটি বোর্ডের সমান উচ্চতা সম্পন্ন হয়। কিন্তু বোর্ড পুটের থেকে একটু সরিয়ে লাগানো থাকে যাতে মধ্যে একটি

খাঁজের সৃষ্টি হয়, ফলে মলাট খোলার সময় মলাটের পুটের দিকের প্রান্তে কোন চাপ পড়ে না।

বাঁধানো বই ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে ফর্মার পুটের অংশ এবং মলাটের পুটের মধ্যে বইয়ের ঠিক উপরে এবং নীচের ফর্মার গায়ে নাগানো আছে (head band) বা বাতি বা শিরজা। এর কাজ শুধুমাত্র অলঙ্করণ নয়, বইয়ের পুটকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারেও এর প্রয়োজন আছে। প্রায়ই দেখা যায় যে কিছু কিছু ব্যবহারকারী তাক থেকে বই নামাবার সময় বইয়ের মলাটের বা বাঁধাইয়ের পুটের অংশের উপর চাপ দিয়ে বই টানছেন। এটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক অভ্যাস। বইয়ে যদি মজবুত উপরে শিরজা বা বাতি (head band) লাগানো থাকে তবে সেটা এইধরণের ক্ষতিকারক অত্যাচারের হাত থেকে বইকে কিছুটা রক্ষা করতে পারে, শিরজা নানা রকমের হয়ে থাকে বিভিন্ন যুগে এর চেহারা অল্প বিস্তর পাল্টেছে কিন্তু সংক্ষেপে এখানে মজবুত শিরজা (head band) সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। এই ধরণের মজবুত (headband) শিরজার জন্য সময় এবং পরিশ্রম দুইয়েরই দরকার হয়। এটি সরু রেশমী সুতোর সাহায্যে পুটের সঙ্গে সেলাই করে জোড়া হয় (বিশেষতঃ গ্রন্থাগার বাঁধাইএর ক্ষেত্রে যেখানে পুরো চামড়া বাঁধাই হয়)। বাজারে তৈরী কৃত্রিম শিরজা পাওয়া যায় যেগুলো পুটের উপর এঁটে দেওয়া হয়। এগুলো ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ এটি বাঁধাইয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক শূন্য, শুধুমাত্র অলঙ্করণের জন্য ব্যবহৃত হয়। মজবুত করার জন্য সরু চামড়া দিয়ে সরু সুতলি বা দড়িকে (Cord) মুড়ে নিয়ে আঠা দিয়ে যথাযথ স্থানে এবং পুটের উপর শক্ত করে আটকে দেওয়া চলে। আরো মজবুতভাবে আটকানোর জন্য রেশমী সুতোর সাহায্যে সেলাই করে বইয়ের সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়।

বাঁধাইয়ের বিভিন্ন পর্যায়

এরপর বাঁধাইয়ের শেষ পর্যায়ে তিন ধরণের পদ্ধতি সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় যথা খাপ বাঁধাই (case binding) বা প্রকাশকের বাঁধাই, গ্রন্থাগারের বাঁধাই (library binding), নমনীয় বাঁধাই (flexible binding) গ্রন্থাগার বাঁধাই আবার দুরকমের কাপড়ের এবং চামড়ার। নমনীয় বাঁধাইও দুরকমের অমসৃণ পুট এবং মসৃণ পুট তিন ধরণের বাঁধাই করা বইয়ের ছবি থেকে (২৮৯ পৃঃ) এই পদ্ধতিগুলির তফাৎ কিছুটা বোঝা যাবে। এগুলোর পার্থক্য আরো স্পষ্ট করে জানা যাবে এই পদ্ধতিগুলোর বিভিন্ন ধাপের তুলনামূলক বিশদ আলোচনা থেকে যেটা এখানে সংযোজিত হল।

দ্বিতীয় ধরণের বাঁধাইয়ের কাজের নানা ধাপের তুলনামূলক আলোচনা

প্রকাশক বাঁধাই	বইয়ের সব পৃষ্ঠা আছে কিনা পরীক্ষা করে ফর্মাগুলি পুরানো বাঁধাই থেকে যথাযথভাবে খুলে আস্তে করে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে পুরানো বাঁধাইয়ের খাঁজগুলি সমান করে নিতে হবে। দরকার মত সারানোর পর ফর্মাগুলি চাপের মধ্যে রাখা হবে পরে সেলাইয়ের জন্য তৈরী করে পুটে খাঁজ কাটতে হবে। পুস্তানি তৈরী করতে হবে।	
গ্রন্থাগার বাঁধাই		
কাপড়	ঐ	×
চামড়া	ঐ	×
নমনীয় বাঁধাই		
মসৃন পুট	ঐ	পুটের উপরের দড়িগুলোর (cord) জন্য বইয়ের পুটে করাতের সাহায্যে খাঁজ কাটতে হবে।
অমসৃন পুট	ঐ	×

×	ফ্রেমে এটে সেলাই করার পর পুস্তানি লাগাতে হবে। বইর পুট বাদে অন্য তিনদিকে কাটার জন্য দাগ দিতে হবে। পুট তৈরী করতে কতটা অংশ লাগবে সেটিও দাগ দিয়ে নিতে হবে। এরপর পুটের দিকটা ঠুকে সমান করার পর তার বিপরীত দিকটা কেটে নিতে হবে। এবার পুটে আঠা লাগিয়ে বর্তুলীকরণ করতে হবে, যাতে প্রত্যেক অংশের বাঁকটা সমান এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এরপর বইয়ের উপরের এবং নীচের অংশ আগের নির্দ্ধারিত দাগ অনুসারে কাটতে হবে।	মলাটের জন্যে বোর্ড কাটা হবে
প্রথম এবং শেষ ফর্মা লেইপেটা সেলাই করতে হবে।	ঐ	মলাটের জন্য বিশেষ-ধরণের দ্বিস্তর বিশিষ্ট মজবুত বোর্ড মাপমত কেটে প্রস্তুত রাখতে হবে।
ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ

বোর্ডগুলি পুটের বিপরীত দিকে, উপরে এবং নীচে তিনদিকেই ৩ মিমি হিসাবে বড় রাখা হবে। কিন্তু পুটের প্রান্ত থেকে ৭ মিমি ছোট হবে।	পুট মজবুত করার জন্য মোটা কাগজ অথবা পাতলা বোর্ড নির্দিষ্ট মাপে কাটতে হবে।	×
ঐ	×	পুটের সঙ্গে লাগানো সুতলী/টেপের মজবুত অংশটি (যেটি মলাটের বোর্ডকে বইয়ের সঙ্গে শক্ত করে আটকে রাখবে) আটকানোর জন্য বোর্ডের মধ্যে প্রয়োজনীয় খাঁজ তৈরী করতে হবে।
ঐ	×	×
ঐ	×	×
ঐ	×	×

×	×	×
	কাঁপাপুট তৈরীর জন্য পুটের উপর শক্ত ক্রাফট কাগজের তিনটি স্তরের মধ্যে আঠা দিয়ে লাগাতে হবে। আঠা শুকিয়ে গেলে উপরের এবং নীচের দিকে পুটের ২.৫ সেমি ছোটকরে কেটে ঐ ত্রিস্তরযুক্ত কাগজ কেটে বাদ দিতে হবে।	
×	ঐ	×
বোর্ডের নির্দিষ্ট স্থানে পুট থেকে ২২ মিমি ভিতরের দিকে ফটো করে পুটের দড়িগুলো (cord) লাগাতে হবে।	ঐ	বোর্ডের সঙ্গে জুড়বার বাঁধনগুলো মজবুত করতে হবে। বোর্ড সরিয়ে পুটের বিপরীত এবং বইয়ের উপর এবং নীচের দিকটা ভাল করে মসৃণ করে দরকার হলে সোনার জলে অলংকৃত করতে হবে।
ঐ	ঐ	ঐ

পাতলা সুতোর অথবা রেশমী কাপড় আঠা দিয়ে পুটের উপর লাগিয়ে দ্বিতীয় স্তর হিসাবে ক্র্যাফট কাগজ তার উপর লাগাতে হবে।

বোর্ড লাগানোর পর বইটি চাপে রেখে শক্ত আকার দিতে হবে এবং পুট পরিষ্কার করতে হবে। শিরজাগুলো সেলাই করে পুটের সঙ্গে লাগাতে হবে।	ঐ	দরকার মত এর উপরে শিরিষ কাগজে ঘসে আরো কয়েকস্তর কাগজ লাগানো যেতে পারে।
ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ

বোর্ডগুলো যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে। দরকার অনুসারে কাপড় কেটে মলাট মোড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মলাটের ভিতরের দিকটা এবার সম্পূর্ণ করা হবে।	×	×
ঐ	×	মলাটের ভিতরের দিকটা ঠিক করতে হবে (বোর্ড চেঁছে উপযুক্ত রূপ দেওয়া ইত্যাদি)। পুস্তানির কাগজের অংশ (যদি সেটা থাকে) যথাস্থানে জোড়ার পর বোর্ডের ভিতরের দিকে পুস্তানির যথাযথ অংশটি লাগিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং এর বাড়তি অংশ কেটে বাদ দিতে হবে।
কাপড়ের বদলে চামড়া কেটে মলাট মোড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।	মলাটের প্রান্তগুলো চামড়ায় মুড়ে নিতে হবে। পুটে বেশ টান টান করে চামড়া লাগানো হবে। পুটের মাথার এবং নীচের দিকে চামড়া মুড়ে যথাযথ রূপ দিতে (head cup) হবে।	ঐ
ঐ		
ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ

	পুটের মলাটের উপর বইয়ের নাম ইত্যাদি লেখার ব্যবস্থা করতে হবে।	তৈরী থাপের মধ্যেকার' বাড়তি তশমা, কাগজ ইত্যাদির অংশ কেটে পরিষ্কার করতে হবে। থাপের পুটের অংশকে যথাযথ রূপ দেবার জন্য পাতলা বোর্ড লাগানো হবে। এবার থাপের মধ্যে বইটি স্থাপন করে সেটার সাথে আটকে দেওয়া হয়।	
×	ঐ	×	
মলাটের উপরের মাঝের অংশে (যেখানে চামড়া থাকবে না) কাপড় লাগাতে হবে।	ঐ	পুট এবং অন্যান্য অংশের চামড়া পালিশ করতে হবে।	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

সব বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রেই তৈরী বই এবার কিছু সময়ের জন্য চাপের মধ্যে রাখতে হবে।
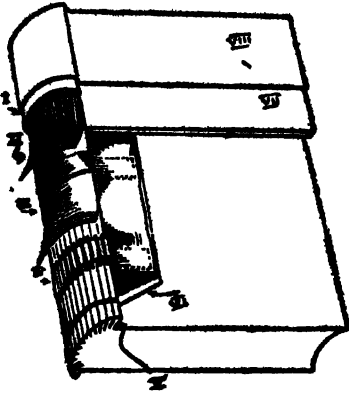
প্রকাশক বাঁধাই

I পুট শক্তকারক বোর্ট পুটের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে না, II ক্রাফট কাগজের (দ্বিতীয়) স্তর, III গজ কাপড়ের (প্রথম) স্তর, IV টেপের উপর দিয়ে করা সেলাই V বোর্ড লাগাবার জন্য বোর্ডের দেড়গুণ উঁচু খাঁজ, VI বর্জ কাগজের অংশ, VII স্ট্র বোর্ড, VIII কাপড়ের ঢাকা মলাট।
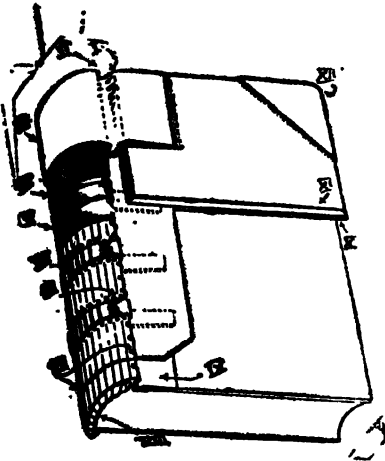
লাইব্রেরী বাঁধাই

I ফ্রেঞ্চ গ্রুভ, II ভাঁজের জন্য অতিরিক্ত চামড়া, III শক্ত করে মোড়া পুট, IV ক্রাফট কাগজের স্তর, V গজ কাপড়ের স্তর, VI টেপের উপর দিয়ে সেলাই, VII অতিরিক্ত (মজবুতকারী) সেলাই, VIII প্রথম ও শেষ ফর্মার লেইপেটা সেলাই, IX শিরজা, X মজবুতকারী পুস্তানী, XI দ্বি-স্তর বোর্ড, XII বাঁধাইয়ের চৌকো প্রান্ত, XIII বইয়ের শক্ত প্রান্ত।
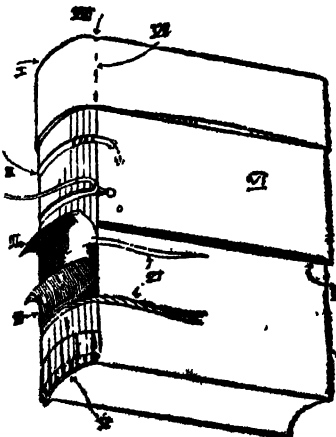
নমনীয় বাঁধাই

I হেড ক্যাপ, II পুটে খাঁজ কেটে ঢোকানো দড়ি, III গজ কাপড়ের স্তর, IV ক্রাফট কাগজের স্তর, V শিরজা, VI বোর্ডে আটকাবার জন্য সুতলীর বাড়তি অংশ, VII চামড়ার (খুলতে সুবিধার জন্য) খাঁজ, VIII বোর্ডের শেষ প্রান্ত (পুটের দিকের), IX বোর্ডের ভিতরের দিকের কার্টিজ কাগজের স্তর।

পুটে বইয়ের নাম ইত্যাদি লেখার জন্য আলাদা আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রকাশক বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে পুটে নাম লেখার কাজটা সারতে হবে বইটি খাপে ঢোকানোর আগেই। পুটে নাম লেখার ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম মেনে চলা দরকার। কি লিখতে হবে সেটা প্রথমে পরিষ্কার করে লিখে নিতে হবে। সাধারণত বইয়ের পুটে জায়গার অভাবের জন্য সংক্ষিপ্ত নামই ব্যবহার করা হয় যেমন "গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং তার বিভিন্ন দিক" এই নামের বদলে পুটে শুধুমাত্র "গ্রন্থাগার পরিচালনা" এইটুকুই ব্যবহার করা হবে। নামটি লেখা হবে নীচে থেকে উপরের দিকে।

খণ্ড কাগজের উপর নামটি লিখে নিয়ে সেটা পুটে অথবা উপর (যেখানে নাম ছাপা হবে) যথাযথ স্থানে রেখে তার নীচে সোনালী পাতা ঢুকিয়ে দিতে হবে এমনভাবে যাতে সোনালী অংশ উপরের দিকে থাকে। এবার ছাপার জন্য দরকারী টাইপগুলো ধারকে (holdar) লাগিয়ে গরম করতে হবে, মাঝারি আঁচে। উপযুক্ত তাপমাত্রায় মৃদু চাপেই ছাপা হয়ে যাবে কিন্তু কম তাপমাত্রায় চাপ এবং সময় দুইই বেশী লাগে আবার অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলে কাপড়ের (অথবা চামড়া) ক্ষতি হতে পারে। সঠিক তাপমাত্রা নির্ণয় অভিজ্ঞতার ফল। তবে সঠিক তাপমাত্রায় হাতলে একফোটা জল দিলে সেটা আস্তে আস্তে বাষ্পীভূত হয়। যে তাপমাত্রা এই কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী সেটা হচ্ছে ৭৯° সে থেকে ৯৩° সেঃ।

চামড়ার উপর অনুরূপভাবে সোনালী লেখা ফোটাবার জন্য প্রথম চামড়াতে ঠিক কোন জায়গাতে লেখা হবে সেটা স্থির করে সেখানে প্রথমে গরম টাইপের দ্বারা আলতোভাবে ছাপটা তোলা হবে। গরম টাইপের বদলে ঠাণ্ডা টাইপের সাহায্যে চাপ দিয়েও এই কাজটা করা সম্ভব। এরপর চামড়ার উপরিভাগ লেখার উপযোগী করে তোলার জন্য এক ধরণের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। প্রধানতঃ গালা ব্যবহার করে এই মিশ্রণ কৃত্রিমভাবে তৈরী করা সম্ভব। এই মিশ্রণই আজকাল বেশী ব্যবহৃত হয় কারণ এটি ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক—মিশ্রণটি রেখে দিলে নষ্ট হয়ে যায় না। আগেকার দিনে একধরণের প্রাণীজ পদার্থের মিশ্রণ এতে ব্যবহার করা হত—একভাগ ডিমের সাদার (albu nen) সঙ্গে দুভাগ পরিশোধিত জল এবং আধ ভাগ ভিনিগার ব্যবহার করে মিশ্রণটি তৈরী করে সেটিকে ১২/১৪ ঘণ্টা রেখে দিয়ে হলুদ রং মিশিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা হয়। অন্য আরেক ভাবেও এটি তৈরী করা হয় যেমন—

শুকনো ডিমের সাদার গুড়ো একভাগের সঙ্গে চারভাগ জল দিয়ে রেখে দেওয়া হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না গুড়ো সম্পূর্ণ গলে যায় তারপর রং মিশিয়ে এটি ব্যবহার করা হয়। প্রাণীজ মিশ্রণের অসুবিধা এটি তৈরী করার পর বেশীদিন রাখা সম্ভব নয়। এই মিশ্রণটি চামড়া বা কাপড়ের উপর প্রয়োগের ফলে সহজেই এবং ভালভাবে সোনালী লেখার (অর্থাৎ ছাপার) কাজটা করা সম্ভব হয়।

সংরক্ষণের প্রশাসনিক দিক

প্রত্যেক গ্রন্থাগারের সংরক্ষণের প্রয়োজন বিভিন্ন—যেটা নির্ভর করে সংগ্রহের আকার, প্রাচীনত্ব, উপাদান, গ্রন্থাগারে অনুসৃত নীতি ইত্যাদির উপর। অতএব প্রত্যেক গ্রন্থাগারিককে তার প্রয়োজন, এবং সামর্থের দিকে নজর রেখে সংরক্ষণ বিভাগের পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ন করতে হয়। প্রাচীন সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাসভিত্তিক পুঁথিসংগ্রহসমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগারের জন্য যে ধরণের সংরক্ষণের ব্যবস্থা দরকার—অন্য একটি গ্রন্থাগার যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান যেমন পরমাণু বিজ্ঞান অথবা মহাকাশ বিজ্ঞানের বিষয়ে সংগ্রহ রাখা আছে সেটাকে প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। যদিও সংরক্ষণের এমন কয়েকটি দিক আছে যেগুলো সব ধরণের গ্রন্থাগারের পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য। কয়েক ধরণের বিশেষ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন। সংগ্রহ এবং তার ব্যবহারের ধারার উপরও সংরক্ষণের পদ্ধতির নির্বাচন যথেষ্ট নির্ভরশীল।

সংরক্ষণ বিভাগ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেবার আগে কয়েকটি বিষয়ে নজর দিতে হবে যেমন—

(ক) সংগ্রহের আয়তন বড় কি ছোট।

(খ) সংগ্রহে পুরানো সংগ্রহের পরিমান।

(গ) সম্পূর্ণ সংগ্রহ কি সংরক্ষণ করা হয় না পুরানো সংগ্রহ ক্রমান্বয়ে নতুন সংগ্রহের সাহায্যে প্রতিস্থাপিত (replaced) হয়।

(ঘ) সংগ্রহ কি ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়।

(ঙ) সংগ্রহের গড় ব্যবহার কি রকম—যথেষ্ট / মাঝারি / কম।

(চ) ব্যবহারকারীরা অধিকাংশই কি গবেষক বা ছাত্র অথবা হাল্কা পড়াশুনায় আগ্রহী সাধারণ পাঠক।

(ছ) সংগ্রহের আয়তন কি বিপুল যাতে নানা ধরণের উপাদান রয়েছে।

(জ) সংগ্রহের স্বাস্থ্যের অবস্থা (যেমন সেগুলির একটা বড় অংশ খুবই দুর্বল অথবা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ ইত্যাদি)।

যদি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এই ধরণের সমীক্ষা চালানো যায় তবে সেটা থেকেই বোঝা যাবে গ্রন্থাগারটির ঠিক কি ধরণের সংরক্ষণ বিভাগের প্রয়োজন আছে। তাছাড়াও ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে আবার কোন কোন দিকে অধিকতর নজর দেবার প্রয়োজন সেটা ঠিক করতে হবে। ঠিক এই পর্যায়ে যদি কোন সংরক্ষণ বিশারদের উপদেশ নেওয়া সম্ভব হয় তবে সেটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে খুবই মূল্যবানবলে প্রমানিত হতে পারে। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের মতামত যদি লিখিত প্রতিবেদনের (report) আকারে পাওয়া যায় তবে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে রাজি করাবার ব্যাপারে সেটি খুব সাহায্য করে, বিশেষ করে আর্থিক অনুদান অথবা কর্মী নিয়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে। কোন কোন পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞের দ্বারা ভাষণ, বক্তৃতামালার ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মীদের সংরক্ষণের ব্যাপারে আরো উৎসাহীত করে তোলা সম্ভব।

সংরক্ষণেব ব্যাপারে গ্রন্থাগার ভবন এবং তার ভেতরের আবহাওয়া এক বিরাট ভূমিকা পালন করে কারণ এর উপরেই নির্ভর করে সংগ্রহের স্বাস্থ্য এবং ক্রমায়নতির বীজ। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে শহর অঞ্চলের পুরানো ভবনে বিশাল সংগ্রহ থাকলে যে বিপুল সংরক্ষণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তার তুলনায় নবনির্মিত শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ভবনে রাখা মাঝারি আকারের গবেষণা সহায়ক গ্রন্থাগাবের সমস্যা প্রায় নগণ্য। ভবণের বয়স, তার অবস্থা বিভিন্ন তলের বিন্যাস (floor plan), সংগ্রহের মঞ্চ বিন্যাস (shelving & storage), শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই সংরক্ষণের সমস্যার উপর কম বেশী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। সে জন্য সংরক্ষণ বিভাগেব পরিকল্পনা রূপায়ণের আগে প্রয়োজনের দিকটা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বিশেষ করে ভবন, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সংগ্রহের সাধাবণ অবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে পরীক্ষা করা দরকার।

গ্রন্থাগারের নিজস্ব পরিচালনা পদ্ধতির উপর সংরক্ষণ বিভাগের রূপরেখা নির্ভরশীল। এটি যদি কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে তাবে সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালন পদ্ধতি এখানেও প্রতিফলিত হবে। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব সংরক্ষণ বিভাগের পরিকল্পনার সময় মনে রাখা প্রয়োজন। যে সব গ্রন্থাগারের শাখা আছে অথবা সংগ্রহ একাধিক স্থানে ছড়িয়ে আছে, সেখানে সংরক্ষণের সমস্যাটা হয় কিছুটা বিশেষ ধরণের।

যে সময়ে গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ বিভাগ খোলার জন্য পরিকল্পনা করা হবে বা হচ্ছে, সেই গ্রন্থাগারে আগে সংরক্ষণের সঙ্গে জড়িত কাজগুলো (যেমন বাঁধাই ইত্যাদি) কিভাবে করা হ'ত, তার উপরও ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সমস্যা কিছুটা নির্ভরশীল। যেমন যদি গ্রন্থাগারে পুরানো কাগজ সংরক্ষণের ব্যবস্থার বদলে সেগুলোর মাইক্রোফিল্ম কিনে রাখার বন্দোবস্ত থাকে তবে তার জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা অন্য রকম করতে হবে। গ্রন্থাগারে যদি পেপার ব্যাক বই কেনার নীতি থেকে থাকে, তবে বাঁধাইয়ের সমস্যাটা অনেক গুরুত্বর আকার ধারণ করবে। এতদিন পর্যন্ত অত্যন্ত দুর্বল এবং ক্ষতিগ্রস্ত বই সম্বন্ধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলোও অনুধাবনযোগ্য।

গ্রন্থাগার সংগ্রহের পূর্ণ পর্যালোচনার পর, ভবনের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি এবং পরিবেশের বর্তমান এবং সাম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা মনে রেখে আমাদের এগোতে হবে, সংরক্ষণের পরিকল্পনার জন্য। পরিকল্পনা যথাযথভাবে কার্যকরী করা তখনই সম্ভব হবে যখন পরিকল্পনার স্তরেই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, কর্মীবৃন্দ সকলকেই এর সাথে যুক্ত করা হয়। গ্রন্থাগারের সর্বস্তরের কর্মীদের সংরক্ষণের পরিকল্পনার এবং তার রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমেই সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। প্রতিটি পদক্ষেপ যখন প্রত্যেক কর্মীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় অর্থাৎ কাজটির কি প্রয়োজন, সেটি কতটা জরুরী ইত্যাদি— তখন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বস্তরে সহযোগীতা আরো বেশী স্বতস্ফূর্ত হয়ে ওঠে।

পরিকল্পনার সময় বিভাগের প্রতিটি কাজের অগ্রগণ্যতা (priority) নির্ধারণ করে দিতে হবে, কারণ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এটি ভিন্ন হয়ে থাকে, যেহেতু এগুলি ভবনের অবস্থা, সংগ্রহ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। সংরক্ষণের কাজ বিরাট এবং বলা চলে এর কোন শেষ নেই— সেজন্য এর বিভিন্ন স্তরের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজটি করার সময় মনে রাখা দরকার যে যেসব ব্যবস্থাগুলি দীর্ঘমেয়াদী এবং যার ফল খুব আস্তে আস্তে এবং ক্রমশ পাওয়া যাবে, তার থেকে সেসব কাজ গুলো আগে করা দরকার, যেগুলো থেকে তাৎক্ষনিক উপকার পাওয়া সম্ভব। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে অর্থনৈতিক সেখানে এটাই স্বাভাবিক যে সংরক্ষণ বিভাগের জন্য আমাদের যতটা আর্থিক সঙ্গতির দরকার তার খুব অল্পই কার্যক্ষেত্রে আমরা জোগাড় করতে পারব। সেজন্য দামী দামী প্রক্রিয়া বা যন্ত্রপাতির (যদিও সেগুলো হয়ত খুবই

কার্যকরী) দিকে নজর না দিয়ে, আমাদের সেদিকেই বেশী নজর দেওয়া উচিত যাতে সহজে কমখরচে সংগ্রহের ক্রমাবনতি রোধ করার দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া যায়।

পরিকল্পনা স্তরের গ্রন্থাগারের প্রতিটি কাজ এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতনভাবে পর্যালোচনা করা দরকার, কারণ এর মাধ্যমেই একমাত্র দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাগুলো প্রণয়ন সম্ভব। গ্রন্থাগারে প্রতিটি কাজ বা পদ্ধতি যা থেকে সংগ্রহের ক্রমাবনতি সূচিত হয় বা হতে পারে সবগুলিই সংরক্ষণ পরিকল্পনাদ্বারা সংশোধিত বা প্রতিহত করতে হবে। পরিবেশের ক্রমাবনতিকারক প্রতিক্রিয়া কমানোর চেষ্টা থেকে সুরু করে (যেমন ঘরের মধ্যে যাতে রোদ না ঢোকে তার জন্য দরজা জানালায় পর্দা লাগানো), কর্মীদের সংরক্ষণ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার জন্য শিক্ষাদান, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদি সবই সংরক্ষণের কার্যসূচীর মধ্যেই পড়ে। ঠিক তেমনি সংরক্ষণের দুর্বলতা দূর করার জন্য চলমান নানা প্রচেষ্টা যেমন বই বাঁধাই, সারান, ল্যামিনেশন অথবা বিঅম্লীকরণ ইত্যাদিও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেরূপ সংগ্রহের কোন অংশ পুনরুদ্ধার, সারান ইত্যাদির অযোগ্য হযে পড়লে তাতে লিপিবদ্ধ অথবা অন্যভাবে নথীভুক্ত (recorded) তথ্য ভিন্নতর মাধ্যমে ধরে রাখার ব্যবস্থা করাও (যেমন, প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া খবরের কাগজ মাইক্রোফিল্মের মাধামে সঞ্চয় করা) সংরক্ষণের আরেকটি রূপ।

গ্রন্থাগারের আকার, সংগ্রহ, আদর্শ ইত্যাদি উপর নির্ভর করে একক সংরক্ষণ বিভাগের পরিকল্পনা করতে হবে, যেখানে প্রত্যেকটি বিভাগের সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় কাজ সমূহ করা হবে। অন্য আরেক ধরণের ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিভাগ তার নিজস্ব বিভাগীয় কাজ সমূহ সংরক্ষণের উপদেশ মূল আদর্শ এবং ন্যূনতম মান অনুসারে সংরক্ষণ বিভাগের অনুযায়ী করার ব্যবস্থা করবে। সংরক্ষণের কার্যকরী ব্যবস্থা নিরূপন এর ব্যপকতার মতই বিবিধ।

পরিকল্পনা যেভাবেই করা হোক না কেন একে সত্যিকারের কার্যকরী রূপদেবার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন এই কাজের সর্বময় কর্তৃত্ব এমনভাবে ন্যস্ত করা যাতে পরিকল্পনার সুষ্ঠু প্রয়োগের পথে বাধা সৃষ্টি না করে। কার্যক্ষেত্রে খুব বড় অথবা খুব ছোট গ্রন্থাগার ছাড়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সংরক্ষণ বিভাগ খোলার ব্যবস্থা করার অনেক অসুবিধা আছে যথেষ্ট শক্ত। কারণ সংরক্ষণের

সঙ্গে এত বিবিধ ধরণের কাজকর্ম জড়িত (যেমন প্রবেশ প্রস্থান দ্বারের সুরক্ষার ব্যবস্থা থেকে ভিডিও ক্যাসেটের উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি) যে সেই সবগুলিকে একই ছত্রছায়ায় আনা খুবই শক্ত। ফলে সংরক্ষণের নীতি-নির্দেশকের মুখ্য ভূমিকা প্রধান গ্রন্থাগারিকের উপরই বর্তায়। এইধরণের পরিস্থিতিতে একটি সবাত্মক সংরক্ষণ নীতি চালু করাই বাঞ্ছনীয় এবং পুনরুদ্ধারকরণ সহ সারান ইত্যাদি কাজ উপযুক্ত সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞের অধীন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগের উপর অর্পন করাই দরকার। বিশেষজ্ঞকে বিভিন্ন বিভাগের সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সাহায্য করতে এবং উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করতে হবে। গ্রন্থাগারের অন্যান্য বিভাগের (যেমন সূচীকরণ বা গ্রন্থপঞ্জী বিভাগ) মত সংরক্ষণ বিভাগ শুধুমাত্র নিজস্ব বিভাগের উপর নির্ভরশীল নয়। এর সাফল্য নির্ভর করে এই বিভাগের সাথে অন্যান্য সব বিভাগ এবং গ্রন্থাগারের সব কর্মী এমনকি ব্যবহারকারীদের সহযোগিতা এবং সক্রিয় সাহায্যের উপর।

যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্রন্থাগারের সব কাজের মধ্যে সংরক্ষণের দিকটার যথেষ্ট স্বীকৃতি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর যথাযথ বিকাশ সম্ভব নয়। এই বিভাগের সূত্রপাতের সুরুতেই গ্রন্থাগারের কর্মীদের মধ্যে এর প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে হবে।

এরপর স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন এসে পড়ে সেটা হচ্ছে সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারের কতটা ব্যয় যুক্তিযুক্ত। সাধারণভাবে বলা চলে যে এর পেছনে যে বিরাট কিছু খরচ করতেই হবে সেটা কিন্তু সঠিক নয়। সাধ্যমত খরচ এবং কার্যকরী প্রচেষ্টা সংরক্ষণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ধাপ—ক্রমাবনতি রোধ বা বিলম্বিত করার কাজ এর দ্বারা ভালভাবেই করা সম্ভব।

পৃথক সংরক্ষণ বিভাগ খোলার আগেই প্রত্যেক গ্রন্থাগার এই বাবদ কিছু না কিছু খরচ সব সময়ই করে থাকে, যেমন বই বা পত্রপত্রিকা বাঁধাই ইত্যাদি। একটি সম্পূর্ণ বিভাগে এই ধরণের সব কাজ একত্রিত করার ফলে এর কার্যকারীতা এবং উৎকর্ষ দুয়েরই উন্নতি ঘটে। এছাড়াও ভবিষ্যতে সংরক্ষণ কর্মসূচীর বিস্তৃতির পথ প্রশস্ত করে।

সংগ্রহের পরীক্ষা এবং তার পুনরুদ্ধারকরণ সম্বন্ধে উপদেশ দেবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ এবং এর রিপোর্টে উল্লেখ করা সুপারিশাবলী অনুসারে কাজ করলে সুফল পাওয়া সম্ভব।

আমাদের মত উন্নয়নশীল, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে সর্বাত্মক সংরক্ষণের কাজে প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়া আর্থিক এবং অন্যান্য দিক থেকে বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ক্রমাবনতি প্রতিরোধক ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ সুরু করে আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়াই সমীচীন, কারণ এতে যন্ত্রপাতি এবং অর্থের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

যেসব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারে একই সাথে সর্বাত্মক সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধারকরণ এবং সারান ইত্যাদি কাজ সুরু করা হয় সেখানে উপকরণাদির জন্য যতটা অর্থের দরকার তার চেয়ে বেশী অর্থের দরকার হয় সরাসরিভাবে এই সব কাজ করা এবং তার পরিচালন ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত কর্মীদের নিয়োগে। ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় বিভাগ গঠিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ পদই খালি রেখে দেওয়া হয়েছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসাহী কর্মীদের স্বল্পকালীন শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেবার পর তাদের মাধ্যমে কাজটা চালিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। নতুন "পদে" (দায়িত্বে) এই কর্মীরা অনেক সময় উৎসাহিত হয়ে কাজ করেন। অবশ্য গ্রন্থাগারের বাইরের বাণিজিক সংস্থার (যেমন কীটানিরোধক বাঁধাই ইত্যাদি) সাহায্যে যথেষ্ট সাফল্যের সাথে অপেক্ষাকৃত কম খরচে মোটামুটি কাজ চালিয়ে নেওয়া গেলেও এব্যাপারে ক্রমোন্নতির পথ সব সময়ই খোলা থাকে।

সংরক্ষণ বিভাগের প্রধান আর্থিক দায়িত্বের মধ্যে কর্মীদের মাহিনা, দুষ্প্রাপ্য বইপত্তরের সংরক্ষণের জন্য মাইক্রোফিল্ম জেগোড়ের খরচ অর্থাৎ এর দাম ইত্যাদি, পুনরুদ্ধারকরণ এবং সারান ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির দাম, প্রয়োজনীয় নানা ধরণের রাসায়নিক, এবং অন্যান্য উপাদানের দাম ইত্যাদি। এর সাথে জড়িত কিছু কিছু খরচ অবশ্য অন্যান্য বিভাগের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। যেমন সংরক্ষণের সহায়ক প্রতিলিপিকরণে খরচ সাধারণত সংরক্ষণ বিভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। গ্রন্থাগারটি যদি কোন বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের অংশবিশেষ হয়ে থাকে তবে গ্রন্থাগার ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ, অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা, শীতাতপনিয়ন্ত্রন ইত্যাদির খরচ অধিকাংশ সময়েই মূল প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত থাকে। সে সব ক্ষেত্রে অবশ্য কয়েকধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় যেমন ভবনের কোন পরিবর্তন ঘটাতে হলে গ্রন্থাগারের বাইরের অনেককেই সেটা সম্বন্ধে বুঝিয়ে রাজী করার পরই শুধু

কাজে হাত দেওয়া সম্ভব। এই রাজী করানোর কাজটি যথেষ্ট শক্ত। সেটা আরো বেশী শক্ত হয়ে পড়ে যদি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ এবং সংবেদনশীল না হয়। যেমন যদিও এটা পরীক্ষিত সত্য যে গ্রন্থাগার সংরক্ষণের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত তাপমাত্রা হচ্ছে ২২°—২৩° সেঃ (৭০° ফাঃ) কিন্তু শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে এই তাপমাত্রায় বেঁধে রাখার ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রাজী করানো যথেষ্ট শক্ত।

গ্রন্থাগার সংরক্ষণের খরচের একটি প্রধান কারণ অবহেলা। মঞ্চে ঠিক ভাবে না রাখলে অতি সহজেই বইপত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায় যার ফলে নতুন করে সেটির বাঁধাই করানোর দরকার হয়ে পড়ে। যে সব গ্রন্থাগারে ফেরৎ আসা বই মাটিতে ফেলে রাখা হয় সেসব ক্ষেত্রে বইয়ের ক্রমাবনতি ত্বরান্বিত হয়ে থাকে। সংরক্ষণের খরচও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। এথেকে সহজেই বলা চলে উপযুক্ত ক্রমাবনতি নিরোধক ব্যবস্থা সংরক্ষণের বাজেটকে অনেকটা সীমিত করতে পারে। গ্রন্থাগার সংগ্রহের মধ্যে দেশের অমূল্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রয়েছে সেটা মনে রেখে সংরক্ষণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

সংরক্ষণ বিভাগের প্রধান কাজগুলি হচ্ছে—

(১) সংরক্ষণের নীতি নির্দ্ধারণ করা।

(২) প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বা দুর্যোগের সম্মুখীন হবার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

(৩) পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত মান নির্ণয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগ।

(৪) পরিবেশ সম্বন্ধে অনুশীলন ;

(৫) তথ্য সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা (যেমন অত্যন্ত দুর্বল এবং ব্যবহারের অনুপযোগী সংগ্রহ সাধারণের ব্যবহারের সামগ্রী থেকে সরিয়ে রাখা)

(৬) মাইক্রোফিল্ম করার ব্যবস্থা করা যাতে দুর্বল সংগ্রহ গবেষণাকারীরা সরাসরি ব্যবহার না করেও এর তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। প্রয়োজনে স্থানীয় অন্যান্য গ্রন্থাগারের সাথে এ ব্যাপারে সহযোগী ব্যবস্থাও করা যেতে পারে ;

(৭) ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে মাইক্রোফিল্মের জন্য চুক্তি ;

(৮) মাইক্রোফিল্ম ও পুনর্মুদ্রণকারকদের সঙ্গে সহযোগীতা ;

(৯) গ্রন্থাগারের উপযোগী বাঁধাইয়ের মান নির্ণয় এবং প্রয়োজন বোধে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা ;

(১০) ব্যাপক বিঅম্লীকরণমান স্থির করা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(১১) সংরক্ষণের ব্যাপারে অন্যান্য গ্রন্থাগার সমূহের সঙ্গে কার্যসূচীভিত্তিক সহযোগীতা ;

(১২) মূল্যবান এবং দুর্লভ সংগ্রহের গ্রন্থাগারের ভিতরে এবং বাইরে এর ব্যবহার, প্রদর্শনী ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন ;

(১৩) গ্রন্থাগার কর্মী এবং ব্যবহারকারীদের সংরক্ষণ সম্বন্ধে সচেতন এবং অবহিত করার জন্য নানাধরণের কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগ ; প্রভৃতি।

এই বিভাগের পুনরুদ্ধারকরণ এবং সারান সম্বন্ধে কার্যাবলী হচ্ছে—

(১) ধূপন পদ্ধতির প্রয়োগ ;

(২) মঞ্চে পুস্তক রাখার সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ ;

(৩) বাঁধাইয়ের জন্য বইপত্র নির্দিষ্ট করা ;

(৪) পুস্তিকা সংরক্ষণের জন্য বাঁধাই ;

(৫) সাধারণ বইয়ের উপযোগী অল্প খরচে সারান ;

(৬) দুর্লভ বইয়ের জন্য ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম ভাবে সারান ;

(৭) ব্যবহারের জন্য চামড়া যথাযথভাবে তৈরী করা ;

(৮) সাধারণ রক্ষাকারীখাপ (protective forder) তৈরী এবং দরকার মত খাপের ব্যবহার (encasement) এবং উন্নততর সংরক্ষণ সহায়ক সারানর ব্যবস্থা ;

(৯) সংরক্ষণের জন্য এনক্যাপসুলেশন ;

(১০) গ্রন্থাগারে যেসব সামগ্রীর সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই সেগুলি সংরক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ ;

(১১) প্রয়োজন মত বইয়ের স্বাস্থ্যের উন্নয়নের ব্যবস্থা ;

(১২) প্রয়োজন মত বাঁধাই বইয়ের চামড়া সুরক্ষার জন্য চামড়ারক্ষাকারী মিশ্রণ প্রয়োগ ;

(১৩) দরকার মত নতুন কেনা বইয়ের বাঁধাই ;

(১৪) বিঅম্লীকরণ ;

(১৫) পুরানো বাঁধাইয়ের সারান ;

(১৬) সংরক্ষণের জন্য পুনরায় বাঁধান ;

(১৭) নথীকরণ (documentation) ;

(১৮) প্রয়োজন মত উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা / বিশ্লেষণের ব্যবস্থা ;

(১৯) সংরক্ষণের সহায়ক হিসাবে প্রতিলিপিকরণের ব্যবস্থা ;

(২০) প্লাষ্টিক ধর্মী পদার্থের (মাইক্রোফিল্ম মাইক্রোফিস, ভিডিও টেপ ইত্যাদি) যথাযথ সংরক্ষণ ;

সংরক্ষণ বিভাগে যে বিভিন্নধরণের কর্মীর দরকার হতে পারে সেগুলো হচ্ছে—

(ক) পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারিক

(খ) পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ (c nservator)

(গ) আংশিক পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারকর্মী (টাইপিষ্ট/কারণিক)

(ঘ) সংরক্ষণ প্রকর্মী (টেক্‌নিশিয়ান) / রসায়নবিদ (কেমিষ্ট)

(ঙ) দপ্তরী

(চ) সাহায্যকারী, ইত্যাদি

বিভাগের কাজকর্মের জন্য সাধারণ অফিস ঘর ছাড়াও দরকার উপযুক্ত পরীক্ষাগার এবং প্রয়োগশালার।

সাধারণ গ্রন্থাগার, স্কুল অথবা কলেজ গ্রন্থাগারের পক্ষে ব্যাপক সংরক্ষণ বিভাগের কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু বিরাট কোন গ্রন্থাগার যার সংগ্রহে প্রচুর দুর্লভ এবং মূল্যবান পুঁথিপত্তর রয়েছে, যেগুলো দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস বা অন্যান্য বিষয়ে জাতীয় সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, সে ধরণের গ্রন্থাগারের সঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণ সংরক্ষণ বিভাগ থাকা উচিত। এই ধরণের বিভাগের প্রাথমিক উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে থাকে—

(১) বই, কাগজ ইত্যাদির ক্রমাবনতির ফলে ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া রোধ করার ব্যবস্থা।

(২) ভঙ্গুর বা প্রায় ভঙ্গুর সামগ্রীর পুনরুদ্ধারকরণ এবং যথাযোগ্য সারাই।

(২) জলে ক্ষতিগ্রস্থ সামগ্রীর পুনরুদ্ধারকরণ।

(৪) কীটপতঙ্গ / ছত্রাকাদির আক্রমণ বা সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে সংগ্রহকে রক্ষা করার ব্যবস্থা।

(৫) ময়লা, দাগধরা এবং প্রায় ঝাপসা হয়ে যাওয়া দলিল, দস্তাবেজ সমূহের পুনরুদ্ধারকরণ।

(৬) বিভিন্ন দুর্ঘটনা বা বিপদ থেকে (যেমন অগ্নিকাণ্ড, বন্যা ইত্যাদি) সংগ্রহকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা।

(৭) পরিবেশের ক্রমাবনতিকারক উপাদানগুলির হাত থেকে সংগ্রহকে বাঁচাবার ব্যবস্থা।

(৮) পুনরুদ্ধারকরণ এবং সারান—সংগ্রহ যাতে আবার ক্রমাবনতির শিকার না হয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি।

এইসব কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে যা যা দরকার তারমধ্যে উপযুক্ত পরীক্ষাগার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এই পরীক্ষাগার যত উন্নত প্রযুক্তি-সম্পন্ন এবং উপযুক্ত বিশারদ দ্বারা পরিচালিত হয়, কাজ ততই ভালো হবে। এর প্রধান কাজগুলোর মধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমের উপাদান, তার বর্তমান অবস্থা, পুনরুদ্ধারকরণের জন্য সঠিক রাসায়নিক পদার্থ এবং পদ্ধতির নির্বাচন, কোন কোন ক্ষতিকারক পদার্থ সংগ্রহের কি ধরণের কতটা ক্ষতি সাধনে সক্ষম এবং তার প্রতিকারে কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেটা নির্দেশ করা ইত্যাদি।

এ ছাড়াও দরকার দক্ষ কারিগরদের নিয়ে গঠিত পুনরুদ্ধারকরণ প্রযুক্তিশালা এবং একটি উন্নত সারান এবং বাঁধাইয়ের কর্মশালা, যেটাতে পুনরুদ্ধারকৃত সংগ্রহের সারাই এবং বাধাইয়ের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকবে। সবশেষে উল্লেখ করলেও যার প্রয়োজনে কোন অংশে কম নয় সেই প্রতিলিপিকরণের যথাযথ ব্যবস্থা।

কি কি ধরণের ব্যবস্থা থাকা দরকার সেবিষয়ে আলোচনার পরও একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায় সেটা হচ্ছে এই বিভাগটি কত বড় হওয়া দরকার। এর সবচেয়ে সহজ উত্তর হচ্ছে কাজ অনুসারে বিভাগের আয়তন হওয়া উচিত, কিন্তু সেটা স্থির করা যাবে কিভাবে? কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেবার আগে সমীক্ষার মাধ্যমে স্থির করতে হবে।

শতকরা কত অথবা মোট কত বইয়ের পুনরুদ্ধারকরণ (যথা বিঅম্লীকরণ, কীটপতঙ্গনাশের জন্য ধূপন, আর্দ্রতা হ্রাস অথবা আর্দ্রতা বর্দ্ধন ব্যবস্থা, বাঁধাইয়ের চামড়ার ক্রমাবনতি রোধের জন্য উপযুক্ত মিশ্রণ প্রয়োগ) সারানর প্রয়োজন, দুর্বল কাগজের অবস্থার উন্নতির জন্য ল্যামিনেশনের সাহায্যে নেওয়া অথবা দুর্বল এবং ক্ষতিগ্রস্ত ল্যামিনেশনের বদলে উপযুক্ত

পুস্তকের ল্যামিনেশনের প্রয়োগ, বাঁধাই, এবং মাধ্যমের অবস্থা নির্ণয়ের জন্য বিশ্লেষণ, দুর্বল এবং ভঙ্গুর মাধ্যম যার পুনরুদ্ধারকরণ আর সম্ভব নয় তার জন্য প্রতিলিপিকরণের ব্যবহার ইত্যাদি করতে হবে। এই সমীক্ষার মাধ্যমে দেখতে হবে জরুরী কাজের (যেগুলি অবিলম্বে করতে হবে) পরিমান এবং অদূর ভবিষ্যতে এই ধরণের কাজের চাপ কতটা থাকতে পারে, তারও একটি মোটামুটি হিসাব করে নিতে হবে। এই হিসাবের উপর নির্ভর করবে বিভাগের আকার এবং আয়তন।

আকার বা আয়তন স্থির করা হয়ে গেলে তার উপর নির্ভর করে ঠিক করতে হবে কর্মীর সংখ্যা, কোন বিভাগের জন্য কতজন এবং (কোন ধরণের কর্মী কতজন (রসায়নবিদ, কতজন দপ্তরী, কতজন দক্ষ এবং কতজন অদক্ষ কর্মী) ।

বিভিন্ন কাজের জন্য নানাধরণের যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম রাসায়নিক পদার্থের দরকার হয়—প্রয়োজন অনুসারে তার সম্পূর্ণ তালিকা তৈরী করা দরকার। এর মধ্যে কিছু কিছু জিনিষ আছে যেগুলোর আনুমানিক চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় পরিমান স্থির করা দরকার।

বিভাগের কাজের অনুপাত এবং অন্যান্য সব দিকে লক্ষ্য রেখে পরিপার্শ্বিক কয়েকটা পরিবর্তন করার দরকার হতে পারে, যেমন আলো বাতাস চলাচলের বিশেষ ব্যবস্থা, ধুলো বালির প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি। সেগুলো যতটা সম্ভব বিভাগ স্থাপনের সময়ই করে নিতে হবে।

কিন্তু সবার উপরে এবং আগে যেদিকে নজর দেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে আর্থিক দিকটা—অর্থাৎ সংরক্ষণের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কতটা অর্থের প্রয়োজন হতে পারে—প্রাথমিক উপকরণাদি সংগ্রহের জন্য এবং পরবর্তী কালে ঐ কাজ চালু রাখার জন্য। যদি সেটি পুরোপুরি পাবার সম্ভাবনা না থাকে তবে কতটা ব্যবস্থা করা সম্ভব ইত্যাদি।

সংরক্ষণ বিভাগ

সমীক্ষা এবং সহায়ক কেন্দ্র	পরীক্ষাগার বা প্রয়োগশালা	সারান উপ-বিভাগ	প্রতিলিপিকরণ উপ-বিভাগ	বাঁধাই উপ-বিভাগ

আমাদের দেশে সংরক্ষণের সুবিধা যেহেতু খুব কম গ্রন্থাগারেই আছে সেহেতু প্রায়ই দেখা যায় আশেপাশের (কখনও বা দূরদূরান্তরের গ্রন্থাগারসমূহ, যাদের হাতের কাছে এ ধরণের সুবিধা নেই—তাদের দুর্বল এবং খুব ক্ষতিগ্রস্ত মূল্যবান সংগ্রহ রক্ষার জন্য সহায়তা এবং সাহায্য চেয়ে পাঠায়। এইসব ক্ষেত্রে বৃহত্তর স্বার্থের কথা মনে রেখে—যথাসাধ্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে আর্থিক দিকটার কথাও অবশ্য মনে রাখা দরকার। এই কারণে বড় গ্রন্থাগারের সংরক্ষণ বিভাগের পরিকল্পনার সময় এই ধরণের সহযোগিতাব কথা ভাবা প্রয়োজন। সংরক্ষণ বিভাগের অধীন সব উপ-বিভাগ এবং গ্রন্থাগারের অন্যান্য বিভাগের মধ্যে একটা নিবিড় সহযোগিতার আবহাওয়া তৈরী করা দরকার। একমাত্র তারই মাধ্যমে সংরক্ষণ বিভাগ সবচেয়ে কার্যকরীভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

এই বিভাগের প্রত্যেক কর্মীরই অত্যন্ত দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। যখনই কোন বই বা পুঁথি বা অন্য কিছু এই বিভাগে এসে পৌঁছোয় তখনই বুঝতে হবে যে সেটি যথেষ্ট মূল্যবান এবং অত্যন্ত দুর্লভ। অতএব এটি যথাযথভাবে রাখার দায়িত্ব আছে। এই ধরণের সংগ্রহ যখনই এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরানো হবে তখন কোন খাতায় সেটি লিখে রাখা উচিত। এতে কোন জিনিষ সহজে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা তো থাকেই না উপরন্তু যে কোন সময় সহজেই যাহা দেখে বলে দেওয়া চলে ঠিক তখন সেটি কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে। এটি অনেক সময় অন্য বিভাগেব সঙ্গে অনেক ভুল বোঝাবুঝির হাত থেকে বেহাই দেয়। শুধুমাত্র সরানোর খবরই নয়। এর পুনরুদ্ধার-করণেব বিভিন্ন পর্যায়ে বিবিধ পদ্ধতিব প্রয়োগ এবং তার ফলাফল লিখে রাখাও দরকার। এটা শুধু তখনকার কাজের সুবিধার জন্য দরকার তাই নয়, ভবিষ্যতের কর্মীদের কাছে এ ধরণের লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতার দাম অপরিসীম।

সংরক্ষণ বিভাগের অধিকর্তাকে (Chief Conservator বা Chief Conservation Officer) যতটা কারিগরী বিশেষজ্ঞ হতে হবে তার চেয়েও বেশী হতে হবে পরিচালন বিশারদ—কারণ তাকে কাজ করতে হবে নানাধরণের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে, যারা যে যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারদর্শী, কিন্তু অন্য বিষয়ে তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ—ফলে একটি উপ-বিভাগের সঙ্গে অন্য উপ-বিভাগের সম্বন্ধ সহজেই / সামান্য কারণেই কিছুটা বিষিয়ে যেতে পারে। কারণ প্রায়ই দেখা যায় বিশেষজ্ঞের যে যার সমস্যাগুলি যত সহজে বুঝতে পারেন, অন্যের

সমস্যা বোঝার ব্যাপারটা তাদের কাছে ততই শক্ত এবং সময় স্বাপেক্ষ। এক্ষেত্রে অধিকর্তার দায়িত্ব বিরাট। সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিভাগের মধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দপরিবেশ তাকে গড়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের দিকে তার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তাকে খোঁজ খবর রাখতে হবে সংরক্ষণের ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় (এমনকি বিদেশেও) নিত্য-নতুন যে সব কাজকর্ম বা পরীক্ষানিরীক্ষা হচ্ছে তার উপরও। দরকার মত সেসব খবর পেঁাছে দিতে হবে বিশেষজ্ঞদের কাছে, যাতে তারাও ওয়াকিবহাল হয়ে উঠতে পারেন এবং সেই সাথে সর্বশেষ পদ্ধতির প্রয়োগের সুবাদে অধিকতর ভাল ফল লাভ করতে পারেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে। দরকার হলে এক্ষেত্রে গবেষণারত বিভিন্ন দেশ-বিদেশের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। সংরক্ষণ বিদ্যার ক্ষেত্রে এখন নিত্যনতুন তথ্যের আবির্ভাব ঘটছে—তার সঙ্গে এক নিবিড় যোগাযোগ, তাঁর দায়িত্ব পালনের পথে যথেষ্ট সহায়ক।

সংরক্ষণের দায়িত্ব অনেক। কোন অবস্থাতেই তাড়াহুড়ো করে কোন কাজ করা উচিত নয়, কারণ সামান্যতম ভুলের জন্য কোন অমূল্য সম্পদ চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে আমাদের হাত থেকে। সব কাজই ঠাণ্ডা মাথায় খুব ভেবে চিন্তে এগোনো উচিত। কোন রাসায়নিক প্রয়োগের আগে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিত যে এর প্রয়োগে কোন ছোটখাট ক্ষতি বা দুর্বলতার সৃষ্টির সম্ভাবনাও নেই। সর্বধরণের সাবধানতা অবলম্বনের পরও কোন কাগজ বা অন্য মাধ্যমকে রাসায়নিক প্রয়োগে সারানর চেষ্টা করার আগে ঐটির একটি প্রতিলিপি তৈরী করে রাখতে হবে।

আগেই আমরা দেখেছি সংরক্ষণ বিভাগের মধ্যে পাঁচটি উপ-বিভাগ থাকতে পারে (মাঝারি বা ছোট গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে একাধিক উপ-বিভাগ একত্রে একটি বিভাগ হিসাবে কাজ করতে পারে)। এবার দেখা যাক এই উপ-বিভাগগুলোর প্রত্যেকের কি কি দায়িত্ব।

সমীক্ষা এবং সংরক্ষণ সহায়ক উপ-বিভাগ

(ক) এর প্রধান কাজ হচ্ছে গ্রন্থাগারের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখা সর্বত্র সংরক্ষণ সহায়ক পরিবেশ আছে কিনা—যদি না থাকে তবে সেটার প্রতিকারের পথ নির্দেশ।

(খ) সেই সাথে যে সব সংগ্রহ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অথবা হতে সুরু করেছে, সেগুলিকে সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট বিভাগে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

(গ) বিভিন্ন বিভাগে সংরক্ষণ সম্বন্ধে এরা যথাযথ পরামর্শ দেবেন।

(ঘ৷ এদের সমীক্ষার আওতার মধ্যে থাকবে—আলো-হাওয়া চলাচল ব্যবস্থা, মঞ্চে বই রাখার ব্যবস্থা, ধুলো-ময়লা ঝাড়পোছের ব্যবস্থা, কীটনাশকের যথাযথ ব্যবহার, ছত্রাকাদি অন্যান্য ক্ষতিকারক আক্রমণকারীদের হাত থেকে সংগ্রহকে বাঁচাবার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(ঙ) যদি শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকে তবে সেটি যথাযথভাবে কাজ করছে কিনা। তাপ, আর্দ্রতা, ধুলো, ক্ষতিকারক গ্যাস এবং অন্যান্য পদার্থের উপস্থিতির প্রতিকারে যথাযথ ফলপ্রসূভাবে কাজ হচ্ছে কিনা ইত্যাদি।

(চ) গ্রন্থাগারে (সংরক্ষণ বিভাগ সহ) অবস্থিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে কাজ করছে কিনা—যদি না করে তবে সে ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছ) এছাড়া গ্রন্থাগারের আকস্মিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনাগুলির দিকেও এদের নজর রাখতে হবে যেমন—বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, জলের পাইপ ইত্যাদির থেকে উদ্ভূত বিপদ।

পরীক্ষাগার এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার

সমীক্ষণ উপ-বিভাগ থেকে পাঠানো বইপত্তর, কাগজ ইত্যাদি দরকার মত বিঅম্লীকরণ, ধূপন পদ্ধতির প্রয়োগ, চামড়া সংরক্ষক মিশ্রণ প্রয়োগ, কীট-নাশক প্রয়োগ, সংরক্ষণের নানাধরণের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক যেমন আঠা, কীটনাশক ইত্যাদি তৈরীর কাজ করে এই বিশেষ উপ-বিভাগটি। এছাড়াও সংরক্ষণের উপায় স্থির করার আগে ক্ষতিগ্রস্থ বইয়ের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা (যার মধ্যে উপাদানের বিশ্লেষণ অন্যতম) ইত্যাদিও এর কাজের মধ্যে পড়ে। এইসব পরীক্ষা থেকে ক্রমাবনতির কারণগুলি (উপাদানের সুরু থেকে থাকা ত্রুটিগুলো এবং পরবর্তীকালে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে যে সব ক্রমাবনতিকারক ত্রুটির সূত্রপাত হয়েছে—দুইটিই) নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করা এই বিভাগের পক্ষেই সম্ভব হয়।

এছাড়া পুনরুদ্ধারকরণের জন্য এবং ক্রমাবনতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নতুনতর এবং অপেক্ষাকৃত বেশী ফলদায়ী পদ্ধতি উদ্ভাবনের এই বিভাগে ক্রমাগত

গবেষণার এবং নানাধরণের পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া উচিত। দরকারমত এইসব ক্ষেত্রে গবেষণারত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করাও দরকার হয়ে পড়ে। অনেক সময় গ্রন্থাগার সংগ্রহ বা তার উপাদান সম্বন্ধে গবেষণা না করেও নানা কীটপতঙ্গ ও তাদের স্বভাব এদের উপর নানাধরণের রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো হয়ে থাকে—পরোক্ষ-ভাবে কীটপতঙ্গ প্রতিরোধে এই জ্ঞানের যথেষ্ট দরকার আছে।

নানা আহরিত জ্ঞানের মাধ্যমে এরা অন্যান্য বিভাগ এবং সংরক্ষণ বিভাগের অধীন অন্যান্য উপ-বিভাগগুলিকে প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং কারিগরী সাহায্য দিতে পারে যাতে অপেক্ষাকৃত সহজ, কম খরচে অধিকতর ভাল ফল পাওয়া সম্ভব, এবং সংগ্রহকে বেশী মজবুত করে তোলা সম্ভব।

বিশেষ সারান উপবিভাগ

সাধারণত যেসব সারান সাধারণ সারানর তুলনায় বেশী সূক্ষ্ম, সময় সাপেক্ষ এবং যাতে অপেক্ষাকৃত কারিগরী দক্ষতার ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সেটা এই বিভাগের প্রধান কাজগুলির অন্যতম। অনেক সময় কাজ করতে এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যার কোন সমাধান জানা ছিল না—যেটা পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে খুঁজে বার করতে হয় অর্থাৎ হাতে কলমে কাজকর্মের মাধ্যমে শিখতে হয়। এই বিভাগের প্রধান দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে—ভঙ্গুর, দুর্বল কাগজ বই ইত্যাদির ল্যামিনেশনের মাধ্যমে মজবুতকরণ; পুরানো বই বা কাগজ যা আগে একবার ল্যামিনেশনের মাধ্যমে মজবুত করা হয়েছিল কিন্তু যার অবস্থার আবার যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে সেগুলোর আগের ল্যামি-নেশন খুলে আগের ত্রুটি বিচ্যুতি অপসারণ করে দুর্বলতা দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। প্রয়োজনে আবার ল্যামিনেশন করা। অবস্থা বুঝে উপযুক্ত মজবুতকরণ ব্যবস্থা যেমন মাউণ্টিং (mounting) বা এনক্যাপসুলেশন (encapsulation) এর ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। ক্রমাবনতির ফলে যেসব জিনিষের আকার অথবা বাইরের রূপের রূপান্তর ঘটেছে তাকে তার নিজস্ব রূপ ফিরিয়ে দেবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (যেমন আর্দ্রতা বৃদ্ধি বা আর্দ্রতা হ্রাস ইত্যাদি) গ্রহণ করা হয়। জলে ভেজা বই ইত্যাদির সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা অথবা আগুনে ঝলসানো নথিপত্রের পাঠোদ্ধারের ব্যবস্থা এখানেই করা হয়ে থাকে। কাজের সুবিধার জন্য নানাধরণের যন্ত্রপাতির

(যেমন ল্যামিনেশন যন্ত্র, ভ্যাকুয়াম চেম্বার ইত্যাদি) ব্যবহারও এখানে করা হয়। এই বিভাগের প্রধান একজন বিশেষজ্ঞ এবং তার অধীনে সকল কর্মীকেই দক্ষ কারিগর হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষধরণের সারান যথেষ্ট খরচ এবং সময় সাপেক্ষ। সেকারণে বিভাগীয় প্রধানের উচিত বিশেষ বিচার বিবেচনার পর একমাত্র সেই সংগ্রহগুলিকেই বিশেষ সারানর আওতায় আনা, যেগুলে যথেষ্ট মূল্যবান এবং দুর্লভ, কারণ সীমিত আর্থিক সামর্থের মধ্যে সব দুর্বল বইয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সারান ব্যবস্থা প্রয়োগ কার্যত সম্ভবপর নয়।

প্রতিলিপিকরণ বিভাগ

কখনও কখনও বই কাগজ ইত্যাদি এতবেশী পরিমানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে যে পুনরুদ্ধার করার কোন পথই থাকেনা যেমন আগুনে অতিরিক্ত ঝলসে যাওয়া বই / কাগজ, অথবা যেটি পুনরুদ্ধারকরণ যথেষ্ট অনিশ্চিত সেসব ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ তথ্যকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিলিপি-করণের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। সমীক্ষক দলের পরামর্শ অনুযায়ী এই উপ বিভাগ যেসব সংগ্রহের প্রতিলিপিকরণ দরকার তার একটা সূচী তৈরী করে দেয়। সেই অনুসারে কাজ করা যেতে পারে। গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য কাজও (যেমন খবরের কাগজের মাইক্রোফিল্ম বা মাই-ক্রোফিস্ তৈরী করা) এরা করে থাকে। এছাড়া গবেষকদের প্রয়োজনে কোন নিবন্ধ বা বইয়ের অংশবিশেষের প্রতিলিপি প্রস্তুত করে দেবার দায়িত্ব এদেরই। সাধারণত মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস্ ইত্যাদি সংগ্রহ এই বিভাগের হেপাজতেই থাকে। এই বিভাগের নানা যন্ত্রপাতির মধ্যে থাকে প্লেনপেপার কপিয়ার, মাইক্রোফিল্ম / মাইক্রোফিস্ ক্যামেরা ইত্যাদি এর সাথে আলোকচিত্র পরিস্ফুটনের উপযোগী ডার্করুম, পরীক্ষাগার (যেখানে ছবি পরিস্ফুটন ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে) ইত্যাদি থাকা বাঞ্ছনীয়।

সাধারণত এইখানেই ফিল্ম এবং ঐ সম্বন্ধীয় যাবতীয় সামগ্রী রাখার ব্যবস্থা থাকে। এই বিভাগের প্রধানের ফটোগ্রাফি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

বাঁধাই উপবিভাগ

ক্রমাগত ব্যবহারজনিত দুর্বল প্রকাশকের বাঁধাই ইত্যাদি জনিত ত্রুটি দূর করার জন্য যে মজবুত গ্রন্থাগার বাঁধাইএর দরকার হয় সে কাজ এইখানে

করা হয়ে থাকে। বাঁধাইয়ের আগে ছোটখাট সারানও এই বিভাগেরই দায়িত্ব।

গ্রন্থাগারে যেসব পত্র-পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে বছরের শেষে সেগুলো এক খণ্ডে (কখন ওরা একাধিক খণ্ডে) বাঁধিয়ে রাখা হয় সংরক্ষণের সুবিধার জন্য। এই কাজে ব্যবহৃত সব উপকরণই (বোর্ড কাগজ, কাপড়, চামড়া, আঠা, সুতো ইত্যাদি) উৎকৃষ্টমানের হওয়া উচিত এবং দরকার মত সংরক্ষণ বিভাগের গবেষণাগারে উপকরণের মান পরীক্ষা করে নিয়ে তবে ব্যবহার করা উচিত।

সমীক্ষণ উপবিভাগ থেকে নির্বাচিত ক্ষতিগ্রস্থ বই বাঁধানো ছাড়াও এই বিভাগের দায়িত্বের মধ্যে গ্রন্থাগার সংগ্রহের দিকে নজর রাখা এবং দরকার মত দুর্বল অথবা ক্ষতিগ্রস্থ বই সারিয়ে এনে স্বল্প সারান অথবা বাঁধাইয়ের মাধ্যমে মজবুত করে দেবার কাজটিও অন্তর্ভুক্ত। সব বইয়ের জন্য একই ধরণের সারানর প্রয়োজন হয় না—প্রতিটি বই আলাদা আলাদা পরীক্ষা করে তার মান এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য—অর্থাৎ খুবই দুর্লভ এবং মূল্যবান সংগ্রহের জন্য সারান এবং বাঁধাই করতে হবে সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে। কিন্তু সাধারণ পাঠ্যপুস্তক—যেটার নতুন কপি (হয়ত বা নতুন সংস্করণ) বাজারে সহজেই পাওয়া যেতে প্যরে সেখানে বাঁধাইয়ের উদ্দেশ্য হবে যতদিন সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত বইটি ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় রাখা, কারণ এর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই।

বাঁধাইয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এই বিভাগের হেপাজতেই থাকে এবং দরকার মত প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহের ব্যবস্থা এখান থেকেই করা হয়ে থাকে।

যেসব সংগ্রহের পিছনে নতুন করে বাঁধাই এবং সারানর জন্য খরচ করার দরকার নেই অথবা এ বাবদ যে খরচ হবে তাতে নতুন একটা বই পাওয়া যেতে পারে, সেক্ষেত্রে এই বিভাগ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে ঐ ক্ষতিগ্রস্থ বইকে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ থেকে বাদ দেবার (weeding out) ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকে। সাধারণভাবে এই বিভাগের প্রধানকে বাঁধাইয়ের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হওয়া দরকার এবং বিভাগের দপ্তরী ও অন্যান্য কর্মীদের যথেষ্ট দক্ষ কারিগর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যদিও প্রতিটি উপ-বিভাগের কর্তব্য আলাদাভাবে আলোচনার সময় মনে হতে পারে যে সেগুলো প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু আসলে কর্মক্ষেত্রে এরা,

প্রত্যেকেই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে ভালভাবে কাজ তখনই হওয়া সম্ভব যখন প্রতিটি উপ-বিভাগের মধ্যে নিবিড় সহযোগীতা থাকে।

কোন বিভাগে কতজন কর্মী দরকার হবে সেটা নির্ভর করে কাজের চাপ কতটা আছে, তার উপর কারণ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাজের পরিমান ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে একজন কর্মী কতটা কাজ করতে পারে সেটা মোটামুটিভাবে জানা থাকলে সহজেই কর্মী সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব।

একজন কর্মী একদিনে সাধারণভাবে ৪00 পাতা বিঅম্লীকরণ;
১২0 পাতা সাধারণভাবে সারান;
৬0—৭0 পাতা টিস্যু কাগজ সহযোগে সারান;
৪00 পাতা সাইজিং (sizing);
৪৮0 পাতা গারডিং (gurding);
৬৪0 পাতা সেলাই;
২—৩ টি বই বাঁধাইয়ের জন্য টুলিং;
৮0-১00 পাতা সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফয়েল এবং অ্যাসিটোন টিস্যু সহযোগে সারান;

প্রভৃতি কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে। সাধারণত মাঝারি ক্ষমতা সম্পন্ন অটোমেটিক বা অন্য ধরণের প্রতিলিপিকরণ যন্ত্রের প্রতিটির জন্য একজন দক্ষ কর্মী অথবা দুটি যন্ত্রের জন্য তিনজন কর্মীর দরকার শুধু মাত্র যন্ত্রটি চলানো এবং অন্য আনুষঙ্গিক কাজ কর্ম চালাবার জন্য। যখন যন্ত্র মাত্র একটি থাকে কিন্তু দৈনিক প্রতিলিপির সংখ্যা ৩00/৪00 পর্যন্ত হয় তখন দুজন কর্মীর প্রয়োজন হয়।

এখানে প্রতিলিপিকরণ বিভাগের ব্যাপারে আরেকটা কথা সেরেনেওয়া যাক। প্রতিলিপিকরণের প্রতি কপির দাম কত হওয়া উচিত সেটা নির্ণয় করতে হবে কয়েকটি বিষয়ে কি পরিমাণ খরচ হয় তার ওপরে নির্ভর করে যেমন কাগজ, আনুষঙ্গিক অন্যান্য জিনিষের খরচ, ইত্যাদি। উদাহরণ হিসাবে দেখা যাক—

কাগজ প্রতি পাতা	১0 পয়সা (যদি রিম প্রতি দাম ৫0 টাকা হয়)
টোনার/ডেভালেপার ইত্যাদি	৮ পয়সা
বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য	২ ,,
যন্ত্রের আনুপাতিক মূল্য অবচয় (depriciation) এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	২0 পয়সা
	৪0 পয়সা

একটি অটোমেটিক প্রতিলিপিকরণ যন্ত্র প্রথম তিন বছর ধরে ভাল কাজ করে। তারপর মাঝে মাঝে সারানো দরকার হয় এবং সাধারণত পাঁচ বছর চলার পর প্রায়ই খরচ সাপেক্ষ সারানর দরকার হয়ে পড়ে। এই সব যন্ত্র অত্যন্ত সুক্ষ্ম যন্ত্রাংশের দ্বারা তৈরী হয়ে থাকে, সেজন্য যন্ত্র যত ভালই হোক না কেন এর সক্রেতার বিক্রয়োত্তর সেবা (after sale service) খুবভাল হওয়া অত্যন্ত জরুরী। বিক্রোয়ত্তর সেবা ভাল তবেই বলা চলে যদি পরিসেবার খবর পাঠানোর পর খুবই অল্প সময়ের মধ্যে (২/১ দিনের) প্রযুক্তিবিদ পাঠিয়ে যন্ত্রটিকে আবার চালু করার ব্যবস্থা করা হয়। সত্যিকথা বলতে গেলে বলতে হয় আমাদের দেশে এই ব্যাপারটি উৎপাদনকারীরা যথেষ্ট উপেক্ষা করে থাকেন ফলে ব্যবহারকারীদের যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অবশ্য দুই একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একথা খাটেনা যেমন মোদি জেরক্স লিঃ কারণ তাদের এই সেবা অত্যন্ত উচ্চমানের। অতএব যন্ত্রের নির্বাচনে সব সময় বিক্রয়োত্তর সেবার ব্যাপারটার দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া দরকার। অন্যান্য গ্রন্থাগারের অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জেনে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে। কোন প্রস্তুতকারীই স্বীকার করতে চায় না যে তাদের বিক্রয়োত্তর সেবা যথেষ্ট ভাল নয়। একমাত্র অভিজ্ঞতাই এর সঠিক মান নির্ণয়ে সাহায্য করে।

সংরক্ষণের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য নানাধরণের সাজসরঞ্জামের দরকার হয়ে থাকে। এগুলোর তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

উপসংহার

দেশ ও সমাজের স্থায়ী সম্পদ গ্রন্থ ; সেই সম্পদ যাতে ভাবীকালের জন্য সযত্নে রক্ষিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমাদের দেশে অনেক গ্রন্থাগারের (বিশেষ করে প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির) গ্রন্থ সংগ্রহ উপযুক্ত বিজ্ঞান-সম্মত সংরক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বিত না হওয়ার ফলে বিনষ্ট হতে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (B. L. A.), ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ এ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারস (IASLIC), গ্রন্থাগার প্রেমী জনসাধারণ প্রভৃতি সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সুধীজনের কাছে আমাদের আবেদন ঃ

(১) আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সংরক্ষণ বিষয়ে সকলকে সচেতন করার প্রচেষ্টা নিরন্তর চালাতে হবে।

(২) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানশিক্ষার অন্ততঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ সার্টিফিকেট এবং ডিগ্রী স্তরে 'সংরক্ষণ'কে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে পূর্ণ পত্রের (full paper) মর্যাদা সহ।

(৩) জাতীয় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় গ্রন্থাগার সংরক্ষণ শিক্ষার আয়োজন নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পুনরায় চালু করার জন্য অনুরোধ সংগঠিত করতে হবে।

(৪) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় মাইক্রোফিল্ম এবং সংরক্ষণ বিভাগ খোলার ব্যবস্থা তরান্বিত করতে হবে।

(৫) প্রাচীন এবং পুঁথি/পাণ্ডুলিপি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গুলির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বিভাগ আবশ্যিক করতে হবে।

(৬) রাজ্য মহাফেজখানা (State Archives) এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সরকারী ও সরকার পোষিত গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার কর্মীদের সংরক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষার (ব্যবহারিক) ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৭) প্রতিটি গ্রন্থাগারে প্রয়োজন অনুযায়ী সংরক্ষণ বিভাগের কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

পরিশিষ্ট ক

সংরক্ষণ বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম

(১) প্রতি কর্মীর জন্য (যারা সারানোর কাজে নিযুক্ত) মেরামত-কাজের উপযোগী (উপরে কাচ লাগানো) টেবিল।

(২) মাঝারি আকারে হস্তচালিত পেষণ যন্ত্র (hand press) ৪৫ × ৬১ সেমি (১৮″ × ২৪″)

(৩) ছোট কাগজ কাটার যন্ত্র (cutting machine) ৪০ সেমি অথবা ৬১ সেমি (১৬″ অথবা ২৪″)।

(৪) কাঁচি—বড় ২৩ সেমি (৯″), ছোট ১৫ সেমি (৬″)।

(৫) ১৫ সেমি (৬″) ফলাযুক্ত ধারাল কাগজ কাটার ছুরি।

(৬) কাগজ ভাঁজ করার সুবিধার জন্য ব্যবহারযোগ্য ভোঁতা বাঁশের অথবা হাড়ের ছুরি (rampi or paring knife)।

(৭) চীনামাটি অথবা স্টেইনলেস ষ্টীলের বাটি / পিরিচ / পেয়ালা।

(৮) ৩০ সেমি (১২″) লম্বা ভোঁতা ষ্টীলের পাত।

(৯) বডকিন (bodkin)।

(১০) কাগজ সেলাইয়ের উপযোগী বড় / মাঝারি / ছোট সূঁচ।

(১১) এনামেল অথবা স্টেনলেস ষ্টীলের ট্রে।

(১২) আঠা তৈরী করার উপযুক্ত ডেকচি অথবা অনুরূপ পাত্র।

(১৩) বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি।

(১৪) মাঝারি আকারে গিলোটিনের মত কাগজ কাটার যন্ত্র।

(১৫) অবস্থিত পেষণ যন্ত্র (lying press)।

(১৬) ছেদনকারী পেষণ যন্ত্র (nipping press)।

(১৭) কেরোসিন ষ্টোভ অথবা গ্যাস ষ্টোভ অথবা ইলেকট্রিক হীটার।

(১৮) সাধারণ বায়ুনিরোধক ধূপন প্রকোষ্ঠ।

(১৯) [illegible] ফিল্টার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম।

(২০) ল্যামিনেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম।

(২১) কীটনাশক (তরল) ছিটাবার জন্য বিশেষধরণের শক্তিশালী যন্ত্র (atomiser)।

(২২) ছোট তরল কীটনাশক ছিটাবার উপযোগী হাতযন্ত্র (hand sprayer)।

(২৩) বিবিধ সাজসরঞ্জাম রাখার উপযোগী আলমারী।

(২৪) লম্বা টানা মসৃণ কাঠের টেবিল (উপরের তলাটি ল্যামিনেটেড শীট যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়)।

(২৫) কীপস্ অ্যাপারেটাস্।

(২৬) ব্যালামার (balamer)।

(২৭) ছোট হাত করাত।

(২৮) গোলাকার রেতি অথবা উখা (circular file)।

(২৯) তুরপুন।

(৩০) হাল্কা এবং মাঝারী হাতুড়ি।

(৩১) নরম সাধারণ তুলি এবং চওড়া (৪—৫ সেমি অর্থাৎ ১½"—২") তুলি।

(৩২) ছেনী (chisel)।

(৩৩) বড় আকারের (২৫—৩০ লিটার) পোর্সেলিন/কাচের অথবা এনামেলের পাত্র।

(৩৪) সিঙ্ক (sink)।

(৩৫) জল গরম করার উপযোগী কেটলী।

(৩৬) তাপমাপার যন্ত্র (thermometer)।

(৩৭) আর্দ্রতামাপক যন্ত্র।

(৩৮) পুটে নামলেখার উপযোগী (type holder)।

(৩৯) চামড়া / কাগজ ফুটো করার যন্ত্র (eyelet tool)।

(৪০) চামড়া / বোর্ড / কাপড় ইত্যাদি কাটা এবং তৈরী করার উপযোগী বাঁধাইয়ের কাজে ব্যবহৃত নানা ছোট যন্ত্রপাতি।

(৪১) আঠা এবং অন্যান্য নানা রাসায়নিক পদার্থ উপযুক্তভাবে রাখার জন্য পাত্র।

(৪২) [illegible]রেটার (মাঝারি আকারের)।

(৪৩) ইনকিউবেটার (মাঝারি আকারের)।

(৪৪) ইলেকট্রিক্যাল মেরামতির কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যথাঃ স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লাস, রেঞ্জ ইত্যাদি।

(৪৫) অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (ছোট, বহনযোগ্য) ইত্যাদি।

সংরক্ষণ বিভাগে প্রয়োজনীয় নানাধরণের রাসায়নিক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রী

অক্জ্যালিক অ্যাসিড
আয়োডিন
আরসেনিক অক্সাইড
আরসেনিক ট্রাইঅক্সাইড
অ্যানথ্রোসিন
অ্যাট্রোপিন সালফেট
অ্যামাইল নাইট্রাইট
অ্যামোনিয়া
অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট
অ্যামোনিয়াম সালফাইড
অ্যালকোহল
অ্যালড্রিন
অ্যালুমিনা (অ্যাকটিভেটেড্)
অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল
অ্যাসিটিক অ্যাসিড
অ্যাসিটোন
ইউরিয়া
ইথাইল অ্যালকোহল
ইথিলিন অক্সাইড
ইথিলিন ডাইক্লোরাইড
ইথিলিন ডাইব্রোমাইড
কপার সালফেট (তুঁতে)
কাগজ (ক্রাফট)

কাগজ, জাপানী টিস্যু
কাগজ, মার্বেল
কাগজ, হাতে তৈরী
কাঠ কয়লা (অ্যাকটিভেটেড)
কাপড় (বাধাইয়ের জন্যে)
কাপড়, (ক্যামব্রিক) (ষ্টার্চ মুক্ত)
,, ,, লং ক্লথ (ষ্টার্চ মুক্ত)
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড
কার্বন ডাইসালফাইড
কার্বোক্সি-মিথাইল সেলুলোজ
কিউপ্রিক আরসেনাইট
ক্যালসিয়াম অক্সাইড
,, আরসেনেট
,, কার্বোনেট
,, বাই-কার্বোনেট
,, হাইড্রোক্সাইড
ক্রিয়োজট
ক্লোভ অয়েল (লবঙ্গের তেল)
ক্লোরডেন
ক্লোরোফরম
গ্লিসারিন
চামড়া
জাইলিন

জিঙ্ক অর্থো-আরসেনেট
জিংক ক্লোরো-আয়োডিন
জিংক ক্লোরাইড
জিংক ফসফাইড
ট্রারটারিক অ্যাসিড
টেপ (ভশমা)
ট্যানিক অ্যাসিড
ট্রাইক্লোরোইথেইন
ট্রাইক্লোরোবেনজিন
ডাইএলড্রিন
ডি ডি টি
ডিক্যাপথন
ডিমপাইলেট
ডেক্সট্রিন পাউডার
ডেটল
তারপিন তেল
থাইমল
নাইলন গ্লাস (স্বচ্ছ)
নাইট্রিক অ্যাসিড
নীটস ফ্রুট অয়েল
ন্যাপথালিন
পটাসিয়াম পারবোরেট
„ পারম্যাঙ্গানেট
„ ফেরোসায়ানাইড
„ ব্রোমাইড
পলিথিন শীট
পলিভিনাইল অ্যাসিটেট
পলিমিথাইল মিথাক্রাইলেট
পাইরেথ্রাম তেল , পাইরেথিন)
পাইরেজিন

পারক্লোরাইড অ্যাসিড
পিপ
পেট্রল
পেন্টাক্লোরোফেনল
প্যারাক্লোরোমিথাইল ক্রেসল
প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন
প্যারানাইট্রোফেনল
ফরম্যালিন / ফরম্যালডিহাইড
ফেরাস অক্জালেট
ফেরিক হাইড্রোক্সাইড
ফ্লোরোগ্লুসিনল
বক্সাইট (অ্যাকটিভেটেড)
ব্লটিং কাগজ
বি-এইচ-সি
বিষঘ্ন, সর্বাত্মক
বেগন
বেডাক্রাইল
বেনজিন
বেরিয়াম কার্বোনেট
বোর্ড (স্ট্র বোর্ড / মিলবোর্ড)
বোরিক অ্যাসিড / বোরাক্স
ভিনিগার
ময়দা
মারকিউরাস ক্লোরাইড
মারকিউরিক ক্লোরাইড
মার্বেলের টুকরো
মিথাইল ব্রোমাইড
মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া
মেথিলেটেড স্পিরিট
মোম (মৌচাকের / জাপানী)

ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট
ম্যাগনেসিয়াম বাইকার্বোনেট
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট
ম্যালাথিয়ন
রোজিন
লবণ (খাবার)
লিটমাস কাগজ (নীল)
লিসাপোল এইচ
লিনসিড তেল
লেড কার্বোনেট
,, পারক্লোরাইড
ল্যানোলিন (জলবিহীন)
শেলটক্স
সাইট্রিক অ্যাসিড
সিডার উড অয়েল
সিফন (পাতলা)
সিলিকা জেল
সেলুলোজ অ্যাসিটেট শীট
সোডিয়াম অর্থো ফেনল ফেনেট
,, কার্বোনেট
,, বাইকার্বোনেট
,, বাইক্রোমেট
,, বেনজোয়েট
,, পেন্টাক্লোরোফেনল
,, ষ্টেরেট
,, সালফেট
,, হাইপোক্লোরাইড
,, হাইপোসালফাইট
,, হাইড্রোক্সাইড
স্যাণ্ডোফিক্স
স্যাফরল
হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইড
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড
হেক্সেন ইত্যাদি

এগুলো সবই সব গ্রন্থাগারে সর্বদা নাও লাগতে পারে, এখানে মোটামুটি একটি তালিকা দেওয়া হল। এছাড়াও আরো কিছু রাসায়নিক কখনও কখনও দরকার হওয়া অসম্ভব নয়।

পরিশিষ্ট খ

কপিরাইট আইন এবং গ্রন্থাগারে প্রতিলিপিকরণ

কপিরাইট (Copyright) আইন অর্থাৎ স্বত্ব সংরক্ষণ আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রন্থকার/রচয়িতা এবং প্রকাশকের স্বার্থ (বিশেষতঃ আর্থিক স্বার্থ) রক্ষা সুনিশ্চিত করা।

যখন থেকে গ্রন্থাগারে প্রতিলিপিকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তখন থেকেই গ্রন্থাগারিকদের কপিরাইট আইন সম্বন্ধে আরো সচেতন হতে হয়েছে। এই আইনে বলা আছে, যে কোন স্বত্ব সংরক্ষিত প্রকাশনার সম্পূর্ণ, অংশবিশেষের কোনভাবে প্রতিলিপি/অনুলিপি করা চলবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে লিখিত অনুমতি পাওয়া যায়। এই সর্ত যদি যথাযথ মেনে চলা হয় তবে গ্রন্থাগারে প্রতিলিপিকরণ বিভাগের প্রায় সব কাজই বন্ধ রাখতে হয় কারণ আধুনিককালে প্রকাশিত প্রায় সব বইয়েরই স্বত্ব হয় লেখক নতুবা প্রকাশক সংরক্ষিত করে রাখেন। কিন্তু স্বত্ব সংরক্ষণ আইনের (১৯৫৬) একটি ধারায় বলা আছে যে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছাড়া শুধুমাত্র বৈধ ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত অংশের একটি প্রতিলিপি করা যাবে (S. 7(1), (3), (5), (6), (9))। "ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ভিন্ন বৈধ ব্যবহার" এই কথাটির তাৎপর্য সুদূর-প্রসারী। এই ধারার সংযোজনের মাধ্যমে লেখক / প্রকাশকের স্বার্থরক্ষার সাথে সাথেই জ্ঞানপিপাসু জনগণের জ্ঞানার্জন এর এবং গবেষণার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই ধারার সংযোজন গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীর দায়িত্ব অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে, কারণ যখন কোন ব্যবহারকারী প্রতিলিপির জন্য আবেদন করে তখন প্রকাশক এবং গ্রন্থকার অনুপস্থিত থাকায় তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য বৈধ প্রয়োজন সম্বন্ধে বিবেচনা করা সব দায়িত্বটা গ্রন্থাগারিকের উপরই বর্তায়। সাধারণভাবে গবেষণা অথবা পড়া-শুনার ব্যাপারে প্রয়োজনভিত্তিক অংশবিশেষের প্রতিলিপিকরণের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েই থাকে, জ্ঞানপ্রসারের স্বার্থে।

যান্ত্রিক প্রতিলিপিকরণের আগেও স্বত্বসংরক্ষিত বই থেকে গবেষক এবং ছাত্রছাত্রীরা হাতে প্রয়োজনীয় অংশ লিখে নিত, এখনও নেয় ; কিন্তু এ ব্যাপারে

ভোলা কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। কারণ যেহেতু হাতে টুকে নেওয়া যথেষ্ট শ্রম এবং সময় সাপেক্ষ অতএব সাধারণভাবে এতে ঠিক প্রয়োজনীয় অংশটুকুই টুকে নেওয়া হয়, তার বেশী নয়। অতএব সে ব্যাপারে স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে ততটা আপত্তি দেখা যায় না, যেটা দেখা যায় যান্ত্রিক প্রতিলিপিকরণের ক্ষেত্রে, কারণ এটি অল্প খরচ এবং আয়াসসাধ্য হওয়ায় প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশের প্রতিলিপিকরণ অসম্ভব বা অবাস্তব নয়। কপিরাইট আইন যেহেতু যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার অনুমোদন করে সেহেতু কোন ব্যবহারটি যুক্তিসঙ্গত এবং কোনটি নয় সেটি বুঝতে হবে। আইন এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। সেকারণে আমাদের এব্যাপারে চারটি বিশেষ ব্যাপারের উপর নজর রাখতে হবে যথা—(১) প্রতিলিপিটি কি কাজে ব্যবহৃত হবে, (২) প্রকাশনাটির চরিত্র, (৩) মূল প্রকাশনার তুলনায় প্রতিলিপিকরণের পরিমাণ, (৪) প্রতিলিপিকরণের ফলে স্বত্বাধিকারীর সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ।

আলোচনা, সমালোচনা, সংবাদ প্রতিবেদন, পঠনপাঠন, গবেষণার জন্য সীমিত অংশ প্রতিলিপিকরণ এখন প্রায় সর্বত্রই স্বীকৃত। তবে এমন কয়েকধরণের প্রকাশনা আছে যেগুলো গবেষণা অথবা অনুরূপ কাজে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা কম বা প্রায় থাকেই না যেমন গানের স্বরলিপি বা ছবি ইত্যাদি। পরিমাণের দিক থেকে বলা যায় শতকরা ২/৪ ভাগ প্রতিলিপিকরণ যুক্তিসঙ্গত পরিমাণের মধ্যে পড়ে, কিন্তু প্রায় অর্ধেক অথবা তার চেয়েও বেশীকে কিন্তু কোনভাবেই অনুমোদনযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া যদি প্রকাশনাটি বাজারে সহজলভ্য হয় তবে তো প্রকাশনার বড় একটা অংশ প্রতিলিপিকরণের কোন যুক্তিই থাকে না।

কোন গ্রন্থাগারের তার নিজস্ব ব্যবহারকারীদের গবেষণা বা অনুরূপ কাজের জন্য কোন দুষ্প্রাপ্য বইয়ের বড় অংশ প্রতিলিপিকরণ করে দেওয়া অনুমোদিত সীমার মধ্যেই থাকে। গ্রন্থাগার পরিসেবার আদর্শ বজায় রাখার জন্য যেসব বইগুলি গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না তার অংশ বিশেষের প্রতিলিপিকরণ করে ব্যবহারকারীকে দেওয়ার নিশ্চয়ই যুক্তি আছে, যদি সেটি স্বত্বাধিকারীর কোনভাবে আর্থিক ক্ষতির কারণ না হয়ে পরে।

১৯৩৫ সালে কিছু প্রকাশক সংস্থা এবং কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আলাপ আলোচনার পর এক চুক্তিতে উপনীত হয় যাতে মত প্রকাশ করা হয় যে, কোন গ্রন্থাগার কোন বই বা পত্রপত্রিকার একটি প্রতিলিপিকরণে করতে পারে যদি

ব্যবহারকারী (যার জন্য ঐ প্রতিলিপিটি করা হচ্ছে) লিখিতভাবে ঘোষণা করেন যে উক্ত প্রতিলিপিটি তার গবেষণার এবং একান্ত নিজস্ব ব্যবহারের জন্যই প্রয়োজন। ১৯৫৬ সালে এই ধারাটি স্বত্ব সংরক্ষণ আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৯৪১ সালে আমেরিকান লাইব্রেরী আসোসিয়েশন মোটামুটি এই চুক্তির উপর নির্ভর করে একটি নীতি নির্ধারণ করেন।

পঞ্চাশের শেষভাগে কয়েকটি জাতীয় গ্রন্থাগার সংযুক্তভাবে একটি কমিটি গঠন করে যারা নানা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাগারের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারের দ্বারা কয়েকবছরের প্রতিলিপিকরণের হিসাব থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় (১৯৬১ সালে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়) যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐসব গ্রন্থাগারে ১৯৩৫ এর চুক্তি অনুসরণ করে প্রতিলিপিকরণ করে থাকে। অনুসন্ধানে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পত্র পত্রিকার কোন প্রবন্ধের প্রতিলিপিকরণের অনুরোধ বেশী আসে। এই সব তথ্যের উপর নির্ভর করে এই কমিটি সুপারিশ করেন যে ব্যবহারকারী কাছ থেকে লিখিত ঘোষণা সংগ্রহ ছাড়াও, কোন রচনার সম্পূর্ণ প্রতিলিপিকরণের আগে খোঁজ নিয়ে নেওয়া দরকার যে উক্ত রচনাটি সাধারণভাবে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় কিনা। যদি এটি বাজারে সহজলভ্য হয়ে থাকে তবে সম্পূর্ণ রচনা প্রতিলিপিকরণ করা চলবে না।

আমেরিকায় কয়েকটি গ্রন্থাগার সংস্থা গ্রন্থাগারে যেকোন বইয়ের একটি মাত্র প্রতিলিপিকরণকে কপিরাইট আইনের আওতার বাইরে রাখতে চেয়ে আইন সংশোধনের আবেদন করেন, কিন্তু গ্রন্থকার এবং প্রকাশকদের যুক্ত সংস্থা তাতে রাজী হয় নাই। তবে গ্রন্থাগারে রাখা পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে যদি সেটি বাজারে সাধারণভাবে কিনতে না পাওয়া যায় তবে একটি প্রতিলিপিকরণে (গ্রন্থাগারের ব্যবহারের জন্য) কোন বাধা নেই।

কাগজের কৃত্রিম বয়সজনিত ক্রমাবনতির পরিমাণ নিরূপক পরীক্ষা

বয়সের সাথে সাথে কাগজের ক্রমাবনতি ঘটে এটা আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। কিন্তু এটা কিভাবে কতটা ঘটে সে বিষয়ে দীর্ঘদিন নানা গবেষণাগারে গবেষকেরা অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন। যদিও নানাভাবে ক্রমাবনতির ব্যাপারে অনুসন্ধান করা হয়েছে তবু বর্তমানে কৃত্রিম বয়সবৃদ্ধি

অবস্থার গবেষণার ব্যাপারে তাপ প্রয়োগে মাধ্যমে ক্রমাবনতি ঘটিয়ে কাগজ এবং অন্যান্য উপকরণের দোষ ত্রুটি, মান ইত্যাদির পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এইভাবে পরীক্ষা করার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, এটা পরীক্ষিত সত্য যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার তাপমাত্রার বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রুততর হয়ে যায় (সাধারণত প্রতি ১০° সেঃ বৃদ্ধিতে বিক্রিয়ার গতি দ্বিগুণ হয়)। সেকারণে স্বল্প সময়ের জন্য উচ্চতাপ মাত্রার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যাতে সাধারণ তাপমাত্রায় (সাধারণত যেটি পরীক্ষাকালে ব্যবহৃত তাপমাত্রার তুলনায় অনেক কম হয়ে থাকে) দীর্ঘদিন থাকার ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি ঘটা সম্ভব সেটাকে কাগজে আবিষ্ট (**induced**) করা যায়। এই পরীক্ষাকালে কাগজের রাসায়নিক ধর্ম যেমন pH, ভৌতিক অবস্থা যথা ভাঁজ সহ্য করার ক্ষমতা, ছিড়বার জন্য প্রয়োজনীয় চাপের পরিমাণ ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্য এটিকে মধ্যে মাঝে তাপ প্রয়োগকারী যন্ত্র অথবা চুল্লি থেকে বার করতে হয়। যেহেতু কাগজ সহজেই আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে, ঠিকভাবে এইধরণের পরীক্ষা করার জন্য গবেষণা কক্ষের আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা সঠিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরী।

যদিও আধুনিককালে কাজজের স্থায়ীত্ব, তার ভৌত্র ও রাসায়নিক চরিত্র নিরূপণের এর যথেষ্ট ব্যবহার হচ্ছে তবু বৈজ্ঞানিক মহলের একাংশ এর সিদ্ধতা (**validity**) অর্থাৎ নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন যার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে ক্রমাবনতির ক্ষেত্রে তাপ একটি প্রধান নিয়ন্ত্রক হলেও আরো অনেক অবস্থা যেমন পরিবেশদূষণ, আর্দ্রতা ইত্যাদিরও যথেষ্ট প্রভাব আছে যেগুলোকে বাদ দিয়ে সঠিক ফল নিরূপণ সম্ভব নয়। এছাড়া এব্যাপারে মতভেদের আরেকটি কারণ হচ্ছে স্থায়ী অথবা প্রায় স্থায়ী কাগজে কাকে বলা হবে সেটা নিয়ে মতৈক্যের অভাব। এই কৃত্রিক বয়সজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরীক্ষার ব্যাপক ব্যবহার করেন ডবল্যু জে ব্যারো তার নানা গবেষণার ক্ষেত্রে এবং এর উপর নির্ভর করেই তিনি কাগজের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে তার বিখ্যাত পরীক্ষাগুলি চালান। তার গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশের পর আবার নতুন করে এর নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এব্যাপারে এখনও ক্রমাগত আরো অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে যাতে সর্বদিক থেকে ত্রুটিমুক্ত কোন পরীক্ষা উদ্ভাবন করা সম্ভব হয় বয়সজনিত ক্রমাবনতির সঠিক মান নিরূপণের জন্য। ইদানিং আর্দ্রতার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে তাপের প্রয়োগে

নতুন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে যার উপর এখনও কাজকর্ম চলেছে। এর মধ্যে বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে নানাধরণের অতি সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের ফলে এই গবেষণার সামনে নতুন দিগন্ত খুলে গেছে যেমন কাগজে উপস্থিত নানা পদার্থের বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ার সময় বিকীর্ণমাণ আলো বিশেষযন্ত্রের সাহায্যে মাপার মাধ্যমে ক্রমাবনতির অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে।

কাগজের স্থায়ীত্বের উপর তাপমাত্রার প্রভাব

কাগজের ভাঁজ সহ্য করার ক্ষমতা ২১৯ থেকে ৬৫ তে নামিয়ে আনতে বিভিন্ন তাপমাত্রার কতটা সময় লাগতে পারে, তার যে সম্ভাব্য সূচক উইলিয়াম জে ব্যারো কর্তৃক নিরূপিত হয়েছে, সেটা নীচে দেখানো হয়েছে।

তাপমাত্রা (সেঃ)	সময় (দিনে)	তাপমাত্রা (সেঃ)	সময় (বছরে)
১২০°	০ ৪	৪০°	৩'৫
১০০°	৩'০	২০°	২৬'০
৮০°	২২'৫	০°	১৯৫'০
৬০°	১৬৯'০	—২০°	১৪৬০ ০
		—৪০°	১০৯৭০'০

একটি কাগজ যার ভাঁজ সহ্য করার ক্ষমতা যদি ১০০ হয়, সেটাকে তাপ-প্রয়োগের মাধ্যমে ক্রমাবনতি ঘটিয়ে ৫০টিভাঁজ সহ্য করার ক্ষমতায় পেঁছে দিতে ৬০° সেঃ তাপমাত্রার ১ বছর সময় লাগে, এই এককের ভিত্তিতে কাগজের ক্রমা-বনতিতে সূচক সারণী। এই সারণী বি. এল. ব্রাউনিং এবং ডবলু. এ. উইংক এর গবেষণাপত্রের উপর নির্ভর করে রিচার্ড ডি. স্মিথ প্রণয়ন করেন।

পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রায় কাগজের স্থায়িত্ব

তাপমাত্রা (সেঃ)	কাগজের স্থায়ীত্বের অর্ধেক হ্রাস (বছর)
৬০°	১
৪০°	১৮
৩৫°	৪০
৩০°	৮৮
২৫°	২০৪
২২.৫°	৩২০
২০	৪৯০
১৭.৫	৭৬০
১৫°	১,২০০
১০	৩,১০০
৫	৭,৯৯০
০	২১,০০০

কীটপতঙ্গ / প্রাণী নাশক কয়েকটি বিষের প্রস্তুত প্রণালী

মাটিতে গর্তকারী প্রাণী ধ্বংসকারক মিশ্রণ প্রস্তুত প্রণালী

ফেনল বা কার্বোলিক অ্যাসিড	১ লিটার
নরম সাবান	১ লিটার
গরম জল	২ লিটার

জলে সাবান গলে আস্তে আস্তে মিশিয়ে তারপর অন্যান্য উপকরণ মেশাতে হবে। মিশ্রণ তৈরী হবার পর কিছু মাটির সাথে মিশিয়ে কাদায় রূপান্তরিত করে সেটি গর্তের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। প্রয়োজনে এর সাথে কিছুটা বোরাক্সও মেশানো যেতে পারে।

ছবি / বই ইত্যাদিতে প্রয়োগের জন্যে ছত্রাক / কীটপতঙ্গনাশক প্রস্তুত প্রণালী

কার্বলিক অ্যাসিড	½ লিটার
মারকিউরিক ক্লোরাইড	½ লিটার
মেথিলেটেড স্পিরিট	১ লিটার
চাঁচগালা (তরল)	½ লিটার

সব উপাদান মিশিয়ে নিতে হবে। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে মিশ্রণ কিছুতেই আগুনের সংস্পর্শে না আসে। মিশ্রণটি ছোট নরম ব্রাশে করে বইয়ের পুটে / বাঁধাইয়ে / উপরে / নীচে অথবা ছবির পিছনের দিকে অল্প পরিমানে লাগিয়ে দিতে হবে। এর প্রয়োগে সিলভারফিস, বুকওয়ার্ম, এবং ছত্রাকাদির আক্রমণের হাত থেকে সংগ্রহকে বাঁচানো যায়।

কীটপতঙ্গ বিতাড়ক / নাশক ধূপ প্রস্তুত প্রণালী

কীটনাশক	৫০%
কাঠের অথবা শস্যের গুড়ো	৩০%
সোডিয়াম নাইট্রেট	২০%

সব উপকরণ ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ধুনুচিতে এটি জ্বালানোর ফলে যে ধুঁয়ো উৎপাদিত হয়, সেটি কীটনাশক / কীটবিতাড়ক হিসাবে ব্যবহার করা চলে। প্রয়োজনে সরু সরু কাঠির গায়ে মিশ্রণ লাগিয়ে ধূপকাঠির মত করে তৈরী করে নিতে পারা যায়। ব্যবহৃত কীটনাশকের উপর নির্ভর করে এর কার্যকারীতা।

আরশোলা নাশক মিশ্রণ প্রস্তুত প্রণালী

সোডিয়াম ফ্লুরাইড	½ কেজি
ময়দা	¼ কেজি

ভালভাবে মিশিয়ে আরশোলা সাধারণ যে সব অঞ্চলে দেখা যায় সেখানে ছড়িয়ে দিয়ে ব্যবহার করতে হবে। অত্যন্ত বিষাক্ত হওয়ায় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

সিলভারফিস নাশক মিশ্রণ প্রস্তুত প্রণালী

ডিডিটি	৫%
ক্লোরডেন	২%
মিথেইল	২%
লিনডেন অথবা ডাইঅ্যালড্রিন	০·৫%

উপাদানগুলো তেলের সাথে মিশিয়ে হাতে ব্যবহারোপযোগী স্প্রেয়ারের মাধ্যমে ব্যবহার করা চলে। যে সব অঞ্চলে সিলভারফিস বেশী দেখা যায়, সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একইভাবে উপরোক্ত উপাদানগুলোর শুকনো গুড়ো মিশিয়ে ডাস্টারের মাধ্যমে ব্যবহার করাও চলে।

কাঠ রক্ষার জন্য বিশেষ মিশ্রণ প্রস্তুত প্রণালী

সোডিয়াম ফ্লুরাইড ও সমপরিমান ডাইনাইট্রোফেনলের মিশ্রণ ভালভাবে কাঠের উপর প্রয়োগ করে কাঠ রক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। অথবা

জিঙ্ক ক্লোরাইড	৮১.৫%
সোডিয়াম ডাইক্রোমেট	১৮.৫%

একসাথে মিশিয়ে কাঠের উপর ভালভাবে প্রয়োগ করলে কাঠের ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের হাত থেকে কাঠকে রক্ষা করা সম্ভব।

পরিশিষ্ট গ

গ্রন্থাগার সংরক্ষণের কাজে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারীদের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি

উন্নতমানের কাগজ

ত্রিবেনী টিস্যুজ, ১ লী রোড, কলিকাতা ২০

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ইত্যাদি

আমেরিকান রিফ্রিজেরেটর কোঃ লিঃ, ১৩/সি রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

ব্লুস্টার লিঃ, কস্তুরী বিল্ডিং, জে টাটা রোড, বম্বে-২০

ফ্রিক ইণ্ডিয়া লিঃ, জীবনবিহার বিল্ডিং, পার্লামেণ্ট স্ট্রীট, নয়াদিল্লী-১

বাজাজ ইলেকট্রিক্যালস লিঃ, ভি নরিম্যান রোড, বম্বে-২০

ফেরোডো লয়েড করপোরেশন লিঃ, ১০-১ কালকাজী এক্সটেনশন, নয়াদিল্লী-১৯

প্যারী এণ্ড কোঃ, ডেয়ার হাউস, মাদ্রাজ-১

স্পেনসার এণ্ড কোঃ, মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ-২

ভোলটাস লিঃ, ১৯ গ্রাহাম রোড, বম্বে-১

ইলেকট্রনিকস্ লিঃ, কনট প্লেস, নয়াদিল্লী-১

আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রক যন্ত্র ইত্যাদি

আর্কটিক ইণ্ডিয়া সেলস, ৩৮ ব্লক বি, চতুর্থ তলা, নিউ আলিপুর, কলিকাতা ৫৩। ফোন ৪৯-১১০৪

ক্লোজসার্কিট টি. ভি. এবং আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম

ই. সি. কর্পোরেশন লিমিটেড, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট এরিয়া, চেরলাপল্লী, হায়দ্রাবাদ ৬২

ওয়েষ্টন ইলেকট্রনিক্স প্রাঃ লিঃ, ২৪৪ ওখলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, নয়াদিল্লী ২০

ক্রাউন ইলেকট্রনিক্স প্রাঃ লিঃ, প্লট ৮৮, ডি এল এফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ১৩/৭ মথুরা রোড, ফরিদাবাদ ৩

ভারত টেলিভিশন প্রাঃ লিঃ, রকল্যাণ্ডস, ১-১০১৬৩/৬৪ বেগমপেট, হায়দ্রাবাদ ১৬

বেলটেক ইলেকট্রনিক্স প্রাঃ লিঃ, এ ৫ রিং রোড, নারাইনা, নয়াদিল্লী ২৮

টেলিরাড লিঃ, সাকি বিহার রোড, চাণ্ডভলি, বম্বে ৭২

টেলিভিস্টা ইলেকট্রনিক্স প্রাঃ লিঃ, ২০৯ ওখলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, নয়াদিল্লী ২০

আলট্রাভিশিয়ন প্রাঃ লিঃ, ১১১/৯৮এ(৭) অশোকনগর, কানপুর

আপট্রন ইলেকট্রনিক্স, কানপুর

কেলট্রন লিঃ, ভেল্লায়ানবালম, ত্রিবান্দ্রম ১

মহারাষ্ট্র ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন লিঃ, প্লট ২১৪, ব্যাকবে রিক্লেমেশন, নরিম্যান পয়েন্ট, বম্বে ২১

বি পি এল ইণ্ডিয়া, বি পি এল সেণ্টার, ৩২ চার্চ স্ট্রীট, ব্যাঙ্গালোর ১

প্রতিলিপিকারক যন্ত্র ইত্যাদি

মোদি জেরক্স লিঃ, মোদিপুর, সাহাজাদনগর, রামপুর ২৪৪৯০১, উত্তরপ্রদেশ

বি পি এল ইণ্ডিয়া, বি পি এল সেণ্টার, ৩২ চার্চ স্ট্রীট, ব্যাঙ্গালোর ১

ম্যাকলিন এণ্ড ম্যাগরু লিঃ, ২ ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা ১

হিন্দুস্থান রিপ্রোগ্রাফিক্স লিঃ, স্কাইলাইন হাউস, ৮৫ নেহেরু প্লেস, নয়াদিল্লী ১৯

কোরেস ইন্ডিয়া, ইল্যাকো হাউস, ব্রাবোর্ন রোড, কলিকাতা ১

রিকো মারফি লিঃ, টোবাকো হাউস, ১/২ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা ১

রেমিংটন ইণ্ডিয়া লিঃ, কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা ১

চোগ্‌লে ইণ্ডিয়া লিঃ, ৭৫ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

অগ্নিনির্বাপক সাজসরঞ্জাম

মিনিম্যাক্স ফায়ার সিকুইরিটি ইঞ্জিনিয়ারস, ষ্টীলএজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ম্যাজাগাঁও পোষ্ট অফিসের বিপরীতে, বম্বে ১০

অ্যামরেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্টারপ্রাইজ, ৪ গ্রেস বিল্ডিং, জামিলনগর, ভানডুপ, বম্বে ৩৮

অ্যাপেলো ফায়ার ফাইটারস, ১৬ কলা ইণ্ড্রাষ্ট্রিয়াল এস্টেট, এল বি এস মার্গ, ভানডুপ, বম্বে ৭৮

ভারত ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারস, ৩/৬ অনুপম ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট, মুলুন্দ, বম্বে ৮০

ফায়ার কণ্ট্রোল সার্ভিস, ১/১৮/৫ খাদক স্ট্রীট, বম্বে ৯

ফায়ার ইকুইপমেণ্ট কোঃ, ১/১৮ কারিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট, জ্যাকব সার্কল, বম্বে ১১

ফায়ার প্রোটেকসন সিস্টেমস, ৭/৩ ফায়ার স্টার, পুনা ১

ফায়ারেক্স ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, ১৪৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, বম্বে ২৩

ইণ্ডিয়ান ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কো, এস ভি রোড, বম্বে ৫০

জিনেক্স ফায়ার সার্ভিসেস, ১৭ অরুণ চেম্বারস, টারডেও রোড, বম্বে-৩৪

স্টীলের আলমারী, মঞ্চ, ক্যাবিনেট ইত্যাদি

ভিনার সিস্টেম প্রাঃ লিঃ, ৫/এ লর্ড সিন্‌হা রোড, কলিকাতা ৭১

ষ্টিলএজ ইণ্ডাষ্ট্রিস লিঃ, ম্যাজাগাঁও পোষ্ট অফিসের বিপরিতে, বম্বে-১০

রেমিংটন ইণ্ডিয়া লিঃ, কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা ১

গদ্‌রেজ এণ্ড বয়েস ম্যানুঃ কোঃ প্রাঃ লিঃ, গদরেজ ভবন, হোম স্ট্রীট, বম্বে ১

রাসায়নিক এবং বিবিধ উপকরণাদি

জি পি এণ্টারপ্রাইজ, ২/বি চণ্ডী বোস লেন, কলিকাতা ১
ওয়াসন ব্রাদার্স, ৪৬ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ৮৭
ওয়েল দ্য ওয়েল এণ্টার প্রাইজ, ব্লক ২০, ফ্ল্যাট ১২১, বেহালা কেন্দ্রীয় সরকারী কোয়াটার, কলিকাতা ৬০
দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিঃ, ৬ লিটল রাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭১
কেমপার (প্রাঃ) লিঃ, ২৪ এ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা ৭৩
ইণ্টারন্যাশনাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিস, ৫০ ও ৫১ সেন্ট্রাল রোড, কলিকাতা ৩২
ল্যাবোরেটরী ইকুইপমেণ্ট এণ্ড কেমিক্যালস, ১১ পোলক ষ্ট্রীট, ৬ তলা, কলিকাতা ১
পি মিত্র এণ্ড সন্স, ৪/১ পাটওয়ার বাগান লেন, কলিকাতা ৯
ইণ্টারন্যাশনাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিস, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭
কমার্সিয়াল ইণ্ডিয়া, ৫৬/১ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, কলিকাতা ১
কেমিক্যাল এণ্ড ইনস্ট্রুমেণ্টস লিঃ, ৫৫ এজরা ষ্ট্রীট, ৩ তলা, কলিকাতা ১
মেটকন ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ, ৬৭ বি নেতাজী সুভাষ রোড, রুম ১৪, ১ তলা কলিকাতা ১
এস কে মুখার্জী এণ্ড কোঃ, ১২৪ এ রাসবিহারী এভিনু, কলিকাতা ২৯
বনমালী এণ্টারপ্রাইজ, ১৯ এ যদু ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা ২৬
সায়েণ্টিফিক সাপ্লাই এজেন্সী, ২৯ এ কলেজ ষ্ট্রীট, ১ তলা, কলিকাতা ৭৩
পমেই এণ্ড কোঃ, ২৯৪ রাসবিহারী এভিনু, কলিকাতা ১৯
কেমিকো ইণ্ডাষ্টিস, ৩২ এজরা ষ্ট্রীট, ৯ তলা, রুম ৯৫৯, কলিকাতা ১
অ্যাভেরী ইণ্ডিয়া লিঃ, ১২ বি রাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭১
ব্যানার্জী এণ্টারপ্রাইজ, ৭/১ সীতারাম বোস লেন, সালকিয়া, হাওড়া ৬
ডি জয়ন্তিলাল এণ্ড কোঃ, ৩৩ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, কলিকাতা ১
মাকরোম মারেকেটিং, ৫ লেনিন সরণী, কলিকাতা ১৩
সায়েণ্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট এণ্ড কেমিক্যালস কোঃ, ২৪ ক্যামাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

আর ডি এণ্টারপ্রাইজ, ৫১/৪ নেপাল ভট্টাচার্য ফাষ্ট লেন, কলিকাতা ২৬
অপয়োনিক্স লেবোরেটরী, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা ১
কনটিনেণ্টাল ট্রেডিং এজেন্সি, ৭৬ ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা ২৩
অভয় আশ্রম, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২
খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবন, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা ১৩
ইণ্ডিয়া অ্যালক্যালিস লিঃ, ৫ গ্যাস্টিন প্লেস, কলিকাতা ১
গুড উইল কেমিক্যালস ইণ্ডাষ্ট্রিস, ৪৯৫/৯৭ কালীবাড়ী রোড, বম্বে ২
ডেলক্টার প্রাঃ লিঃ, ওগালেভেদী, সাঁতরা ডিষ্ট্রিক, মহারাষ্ট্র
টেষ্টস, ইন্সপেকসন এণ্ড সারভিস, ২০ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ১
গারলিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ৪৬/সি চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ৭১
বায়াসকো (প্রাঃ) লিঃ, ১৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
প্লাষ্টিক ইঞ্জিনিয়রিং, ২২৭/১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২০
উমা টেক্সটাইলস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিস, ৩৩ ব্রেবোর্ন রোড, কলিকাতা-১
অভিয়ন্ত (প্লাষ্টিক) প্রাঃ লিঃ, ৪/১ ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মকেসওয়ার্থ এণ্টারপ্রাইজ, ২০ চাদনী চক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭২
মুখার্জী এণ্ড কোং, ৪২ লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩
রাধারাণী প্লাষ্টিক ওয়ার্কস, ১১৩/১বি চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা-১
বেঙ্গল পলিথিন ব্যাগ কোঃ, ৫৫ ক্যানিং ষ্ট্রীট, ব্লক ১, কলিকাতা ১

টিস্যু কাগজ

ভারতে জাপানী টিস্যু কাগজ খোলা বাজারে পাওয়া যায় না। এটি বিদেশ থেকে আনতে হলে আমদানী লাইসেন্সের দরকার হয়। সব আমদানীর অনুমতিপত্র জাতীয় মহাফেজখানা, নয়াদিল্লীর অনুমোদন সাপেক্ষ। অল্প পরিমাণ কাগজের প্রয়োজনে অনেক সময় জাতীয় মহাফেজখানা তাঁদের নিজস্ব ভাণ্ডার থেকে সরবরাহ করতে পারে, কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে। তবু বিদেশে টিস্যু কাগজের কিছু সরবরাহকের ঠিকানা নীচে দিয়ে দেওয়া হ'ল।

জেমস আর ক্রম্পটন এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ, ইলটন পেপার মিলস্, ল্যান্‌কাসায়ার, ইংল্যাণ্ড
বি ভবলু ইলসন পেপার কোঃ ইনকর্পোরেটেড, ২৫০১ রিটন হিল রোড, পো.ব. ১১২৪৬, রিচমণ্ড, ভারজিনিয়া ২৩২৩০, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

অ্যাণ্ড্রু, নেলসন, হোয়াইট হেড, ৩১-১০৪৮ তম এভিন্যু, লঙ্গ আইল্যাণ্ড
সিটি, নিউ ইয়র্ক ১১১০১, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

ফকনার ফাইন পেপার লিঃ, ১১৭নং আকরে, কনাট গর্ডেন, লণ্ডন ডবল্যু সি
২ ই ৯ পি এ, ইংল্যাণ্ড

বারকান গ্রীন এণ্ড কোঃ লিঃ, হায়েল মিল, মেইডস্টোন, কেণ্ট, এম ই
১৫৬ এক্স কিউ, ইংল্যাণ্ড

তাইরিকু নো তাইওয়া শা লিঃ, কিওশিগে বিল্ডিং ২-১৮-২৩ তাকাডা,
তোসিমা কু, টোকিও ১৭১, জাপান

কীটনাশক প্রয়োগের যন্ত্রাদি

আকবরালী অ্যাসোসিয়েট, ৫-১-৪২ বাসিরবাগ, হায়দ্রাবাদ ২৯

অ্যাগ্রো সাপ্লাইয়ারস সিনডিকেট, ১৬ গণেশ চন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা ১৩

ইষ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাগ্রে ডিষ্ট্রিবিউটারস, ১০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১

ল্যামিনেশন যন্ত্রাদি

ডবল্যু জে ব্যারো রেসটোরেশন শপ ইঙ্কঃ, রিচমণ্ড, ভারজিনিয়া
২৩২১৯, আমেরিকা

আরবি কোঃ ইঙ্কঃ, ৬ ক্ল্যারমাউণ্ট রোড, বার্নাডিসভিল, নিউ জার্সী
০৭৯২৪, আমেরিকা

অ্যাস্ট্রা মাসিনোইম্পেক্স, জাগ্রেব, যুকোস্লোভাকিয়া

ইউগো-ইস্ট্রা কোঃ, ২৪বি থিয়েটার রোড, কলিকাতা ৭১

কীটনাশক প্রয়োগ প্রতিষ্ঠান

রাজন পেস্ট কণ্ট্রোল, ৭৩এ থিয়েটার রোড, কলিকাতা ১৭

পেস্ট কণ্ট্রোল ইনষ্টিটিউট, ১৫৫ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৭

পেস্ট কণ্ট্রোল জুপিটার, ৫৪ই নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

পেস্ট কণ্ট্রোল পারফেক্ট, ৮৬ ডঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা ১৪

পেস্ট কণ্ট্রোল এম ওয়ালশি, ১৩/১এ গভর্মেণ্ট প্লেস, কলিকাতা ৬৯

পেস্ট কণ্ট্রোল সার্ভিস, ৪৬ রামতনু বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

পেস্ট কিল, পি-১৪ নিউ সি আই টি রোড, একচেঞ্জ প্লেস (এক্সটেনশন) কলিকাতা ১

পেস্টইরাড (প্রাঃ) লিঃ কলিকাতা, ৪০ একবালপুর রোড, কলিকাতা ২৩

পেস্টিসাইড ইণ্ডিয়া, ৮২/৭ পি বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা ১৯

পেস্টিসাইড রিসার্চ লেবোরেটরী, ১৪/৮বি লেক গার্ডেন, কলিকাতা ৪৫

রিজ পেস্ট কণ্ট্রোল, ষ্টিভেন হাউস, বি বা দি বাগ, কলিকাতা ১

ডঃ স্বরূপস প্রাঃ লিঃ, ২১৬/২এ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ১৭

পেস্ট কণ্ট্রোল কেমিক্যালস, ১০৮এ ইলিয়ট রোড, কলিকাতা ১৬

পেস্ট কণ্ট্রোল (ই) প্রাঃ লিঃ, ২৩ মির্জা গালিব ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

পেস্ট কণ্ট্রোল এণ্ড কোং, ৯এ রামমোহন দত্ত রোড, কলিকাতা ২০

নির্ঘণ্ট